স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার
সম্পাদিত

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার
সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার সম্পাদিত

ইফা প্রকাশনা : ২৩৬১/২
ইফা গ্রন্থাগার : ৬১০.২৯৭
ISBN : 984-06-1034-0
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৫
তৃতীয় সংস্করণ
এপ্রিল ২০০৯
বৈশাখ ১৪১৬
রবিউস সানি ১৪৩০

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রুফ সংশোধন
নুরুল ইসলাম মানিক

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য : ৭০.০০ টাকা

SHASTHO SHIKKHA O ISLAM (Health Education and Islam) : Edited by Mohammad Lutfor Rahman Sarker and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 Phone : 8128068
April 2009
Website : www.islamicfoundation.org.bd
E-Mail : Islamicfoundationbd@yahoo.com

Price : Tk 70. 00 ; US Dollar : 2.00

সূচিপত্র

১.	তামাক ও তার প্রতিক্রিয়া	ডা. গোলাম মুয়াযযাম	৯
২.	দ্রুত ভ্রমণ ও সুস্বাস্থ্য	এ. জেড. এম. শামসুল আলম	১৫
৩.	হৃদরোগের ছোবল থেকে বাঁচুন	ডা. (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত	১৯
৪.	রোগীর সেবায় মহানবী (সা)	মুফতী মুতীউর রহমান	২৩
৫.	ধূমপান আত্মহত্যার শামিল	এম. আবদুর রব	৩১
৬.	প্রতিকারমূলক চিকিৎসায় ইসলামী অনুশাসন	ডা. কে. এম. আবদুল আজিজ	৩৬
৭.	চক্ষুরোগ ও প্রতিকার	ডা. এম. এ. মান্নান কবীর	৪৫
৮.	বহুমূত্র বা ডায়েবেটিস	ডা. আলহাজ্জ মু. মনিরুল ইসলাম	৬১
৯.	গর্ভিনীর শুশ্রূষা	ডা. খোদেজা বেগম	৬৫
১০.	রোযায় পেপটিক আলসারভীতি ঃ বিজ্ঞান ও ইসলামী দৃষ্টিতে সমাধান	ডা. এইচ. এম. এ. আর. মামুনূর রশীদ	৭০
১১.	ক্যান্সার হতে বাঁচার উপায়	ডা. আবদুল মালেক	৭৪
১২.	শিশুদের হুপিং কাশি	ডা. মোঃ আবদুল গণি	৭৯
১৩.	পুষ্টির চাহিদা	মোরশেদা বেগম	৮৩
১৪.	শিশুদের সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার	মুহাম্মদ এবাদুল্লাহ	৮৮
১৫.	কৃমির রাজা ফিতা কৃমি	ড. এম আলম	৯১
১৬.	আবেগ ও হৃদরোগ	নুরুল ইসলাম মানিক	৯৩
১৭.	রোগ জরা ব্যাধি	শাহেরা খাতুন বেলা	৯৯
১৮.	দুধ ঃ কুরআন ও বিজ্ঞানে	ডা. মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান	১০২
১৯.	ঘাতক ব্যাধি এইডস ঃ মৃত্যুই যার পরিণাম	কবির উদ্দিন আহমদ	১০৭
২০.	স্ট্রোক থেকে বাঁচুন	নূর উন-নবী	১১৫
২১.	মায়ের দুধের উপকারিতা	মোহাম্মদ রফিকউল্লাহ এমরান	১১৮
২২.	চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইউনানী মৌল ধারণা	হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ আহছান উল্লাহ	১২৪
২৩.	নিরামিষ সুসংবাদ	আমিল বতুল	১৩৫

২৪. জন্ডিস ঃ কারণ ও প্রতিকার	ডা. (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত	১৩৮
২৫. পেঁপে খান ঃ পুষ্টি বাড়ান	কাজী কেয়া	১৪৩
২৬. ভেষজ ঔষধ করলা	মুহাম্মদ ইসমাইল	১৪৫
২৭. চুলের পরিচর্যা	ইশরাত জাহান চৌধুরী	১৪৭
২৮. ডেঙ্গু ঃ প্রয়োজন সামাজিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ	রশীদ আহাম্মদ	১৫০
২৯. শীতে ত্বকের পরিচর্যা	নাসরিন চৌধুরী	১৫২
৩০. জলজ বিভীষিকা আর্সেনিক	নিক্সন তালুকদার	১৫৪
৩১. আয়োডিন ঘাটতি ঃ সমস্যা ও প্রতিকার	দলিল উদ্দিন আহমদ	১৬১
৩২. স্যানিটেশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	আ.ন.ম. আবদুর রাজ্জাক	১৬৪
৩৩. স্বাস্থ্য সংরক্ষণে প্রিয়নবী (সা)-এর নির্দেশনা	মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী	১৬৯
৩৪. মানসিক রোগ চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি	ডা. আ ন ম বদরউদ্দিন	১৭৯
৩৫. স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ও ইসলামের শিক্ষা	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	১৮৬
৩৬. স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান তথ্য-কণিকা	আমিনুল ইসলাম জুয়েল	১৯২
৩৭. মাদকাসক্তি নিরোধে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা	আ.ফ.ম খালিদ হোসেন	১৯৬
৩৮. ইসলামে আর্তমানবতার সেবা	মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	২০৪
৩৯. এইড্‌স প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন	ডা. খিজির হায়াত খান	২১০

প্রকাশকের কথা

মানব জীবনের সকল দিক বা বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। আল-কুরআন মহান সৃষ্টিকর্তা পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র বাণী। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সেইসব বাণীরই বাস্তব রূপায়ণকারী। মানব জাতির মুক্তিকামী, মানবতাবাদী মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সা) মানবকুলের উত্তম আদর্শ। তাঁর দেখানো পথ বা আদর্শ অনুসরণ করে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শবান ও সফল হতে পারি। তাঁকে অনুসরণ করেই আমরা সামগ্রিক পূর্ণতা অর্জন করতে পারি। আর তাই মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম, জীবন-যাপন, আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমানের স্বচ্ছ সুস্পষ্ট সার্বিক জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক।

ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিষয় সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও অনুধাবন করতে এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটিয়ে সুফল বয়ে আনতে হলে 'স্বাস্থ্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এক কথায় বলতে গেলে একজন সুস্থ মানুষই কেবল সুন্দরভাবে ইসলামের নিয়ম-কানুন প্রতিপালনসহ পার্থিব জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে। তাই মহানবী (সা) স্বাস্থ্য রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং স্বাস্থ্য-সচেতনতার ব্যাপারে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন।

স্বাস্থ্য-সচেতনতা, পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাসহ স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্বন্ধে ইসলামের রয়েছে অনেক নির্দেশনা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত অগ্রপথিক পত্রিকায় সেই আলোকে বিস্তর প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইতিমধ্যে ছাপা হয়েছে। সেসব থেকে বাছাই করে 'স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম' শীর্ষক এই সংকলন গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার। নবীন-প্রবীণ বিশিষ্ট লেখকদের সমৃদ্ধ লেখা এই সংকলন-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আগ্রহী পাঠকদের কাছে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি-চিকিৎসা-পরিচর্যা ও প্রতিরোধ বিষয়ে যেমন শিক্ষণীয় অনেক কিছু এতে উপস্থাপন করা হয়েছে, তেমনি স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা এবং রাসূলে করীম (সা)-এর জীবন থেকেও অনেক উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশাকরি বইটি পূর্বের মতোই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রসঙ্গকথা

ইসলাম মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত জীবন বিধান। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক চাহিদা থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ের সকল স্তরে সব বিষয়ে সার্বিক সমস্যার সমাধান এতে নিহিত। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো হলো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এসব চাহিদা পূরণের জন্য সকল মানুষই সদা সচেষ্ট।

সুস্থ থাকার নাম স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য বলতে শরীর ও মন সুস্থ থাকাকে বোঝায়। স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সকল মানুষেরই কাম্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কাল নির্বিশেষে এ চাহিদা সকলের মধ্যে বিদ্যমান। অসুস্থতা মানুষের স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে। রোগাক্রমণের ফলে মানবদেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির (Organ) মধ্যে বিশৃঙ্খলা নেমে আসে। চিকিৎসার দ্বারা এসব বিশৃঙ্খল অঙ্গগুলিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন গঠন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভব হয় না। আর সম্ভব হলেও এর পেছনে বহু অর্থ, সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হয়।

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্যহীন লোক পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী। অসুস্থ বা স্বাস্থ্যহীন লোক দ্বারা পৃথিবীতে কোনও কল্যাণ আশা করা যায় না। সে নিজের জন্য যেমন বোঝা, তেমনি পরিবার ও সমাজের জন্যও বোঝা। তার দ্বারা ইহলৌকিক বা পারলৌকিক, ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনও কল্যাণই সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য বলতে নিরোগ শরীর ও সুস্থ মনকে বোঝায়। পার্থিব উন্নতি করতে হলে সুস্থ শরীর ও মন প্রয়োজন। তদ্রূপ আখেরাতের কল্যাণ ও উন্নতির জন্যও ভাল স্বাস্থ্য ও মন দরকার।

অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা করার চেয়ে সুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি পালন করা উত্তম। শরীর ভাল রাখার জন্য শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিয়মিত পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ, ঘুম ও বিশ্রামের প্রয়োজন। বিজ্ঞানসম্মত দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা ও সুষম খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে মানবদেহ রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। স্বাস্থ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও স্বাস্থ্যশিক্ষার ফলে অসুখের হাত থেকে অনেকাংশে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। সুস্থ স্বাভাবিক শরীর ও মন কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) সুস্থ শরীর ও

অসুস্থতার হাত থেকে রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছেন এবং সাথে সাথে স্বাস্থ্য-সচেতনতার ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি কখনও উদর পূর্ণ করে খাবার খাননি। তাঁর জীবনে পচা, বাসী ও সন্দেহযুক্ত খাবার খাওয়ার কোনও নজির পাওয়া যায় না। তাঁর সামনে খাবার রাখা হলে পছন্দমত ও প্রয়োজন পরিমাণেই খাবার গ্রহণ করতেন। জ্ঞানীজনেরা বলেন, অতিরিক্ত খাওয়ার চেয়ে কুকুরকে খাওয়ানো উত্তম। কাজেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন অনুসরণ করে আমাদেরও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিকার ও প্রতিষেধমূলক জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত অগ্রপথিক পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুন্দর স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ চাপা হয়েছে। দেশবরেণ্য, স্বনামধন্য চিকিৎসক, প্রবন্ধকার, লেখক, গবেষকের লেখা অগ্রপথিকে প্রকাশিত হয়েছে। এসব লেখা থেকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ক বাছাইকৃত প্রবন্ধ এ বইতে সংকলন করা হয়েছে। এ থেকে বর্তমান সময়ের পাঠকবৃন্দ সহজেই স্বাস্থ্যশিক্ষা বিষয়ে ইসলামের নীতিমালা অবহিত হতে পারেন। সেইসাথে ইসলামী জীবনবিধানে প্রতিকারমূলক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়াবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

আশা করি, 'স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থটি বর্তমান সময়ের প্রয়োজনে সুধী সমাজ ও স্বাস্থ্য-সচেতন পাঠকদের আকৃষ্ট করবে এবং কল্যাণময়, সুখী-সুন্দর জীবন ও সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। সংকলনভুক্ত লেখকদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ আমাদের নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান সরকার

তামাক ও তার প্রতিক্রিয়া

ডা. গোলাম মুয়ায্যম

তামাক বলতে নিকোটিয়ানা টোবেকাম (Nicotiana tebacum) নামক গাছের পাতা বোঝায়। তামাক পাতা শুকনা অবস্থায় সাদা অথবা জরদা হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিংবা ধূমপানের জন্য ব্যবহৃত হয় আর এর গুঁড়ো ব্যবহৃত হয় নস্যি হিসেবে।

ধূমপানের অভ্যাস সম্ভবত ১০০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধে প্রথম শুরু হয়। যে সমস্ত ক্ষতিকর জিনিস নতুন পৃথিবী (New World) থেকে পুরাতন পৃথিবীতে (Old World) আমদানী করা হয়েছে তার মধ্যে যৌন রোগ, সিফিলিস এবং সর্বশেষটি হলো AIDS (Acquired Immune Deficieny Syndrome) নামক এক মারাত্মক যৌনরোগ, যা সমকামীদের মধ্যে বেশি ব্যাপক।

১৪৯২ সালের দিকে ইউরোপীয়রা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর কিউবাবাসীদের নিকট (Carib Indians) ধূমপান করার অভ্যাস শিক্ষা করে সেখানকার আদিবাসীরা ধর্মীয় আচারের অংশ হিসেবে ধূমপান করতো। ওরা এ জন্য যে ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে ধূমপান করতো তার নাম ছিল টোবাগ্যো বা টোবাকা যাকে স্পেনীয়রা টবাকো (Tobacco) বলতো। সেই থেকে তামাক গাছ ও তার পাতা উভয়ই টোবাকো বা তামাক বলে পরিচিত হয়ে আসছে।

১৫৩৫ সালে স্পেনীয়রা প্রথমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এবং পরে মূল স্পেনে তামাক চাষ শুরু করে। ইউরোপে প্রথম দিকে এই তামাক পুলটিস (Poultice বা খলম) ও নস্যিরূপে রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

শীঘ্রই ফ্রান্সের রাণী ক্যাথেরীন (Catherine de Medicis)-এর দরবারে নস্যির ব্যবহার ফ্যাশনে পরিণত হয়। রাণী নিজেও ১৪৬১ সালে পর্তুগালে নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত জিন নিকোট (Jean Nicot)-এর পরামর্শ মতে ওষুধ হিসেবে নস্যি ব্যবহার করতে শুরু করেন। সর্দিতে নাক বন্ধ হলে নস্যি নাক দিয়ে শ্বাস নেয়া সহজ করে দেয় বলে আজও বহুলোক নস্যি ব্যবহার করে থাকেন। এই রাষ্ট্রদূতের সম্মানে পরবর্তীকালে তামাক গাছের বোটানিক্যাল (Scientific) নাম দেয়া হয় নিকোটিয়ানা (Nicotiana)। অল্পদিনের মধ্যেই ডাচ, পর্তুগীজ ও ইংরেজগণ আমেরিকার ভার্জিনিয়া এলাকায় তামাক চাষ শুরু করে।

আজও এখনকার তামাক বিশ্বের সেরা বলে বিবেচিত। এসব দেশের মাধ্যমেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে এই ক্ষতিকর গাছের চাষ শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ একটি তামাক রপ্তানিকারক দেশ।

সারা বিশ্বে ধূমপানের অভ্যাস ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে স্যার জন হকিনস্ ও স্যার ওয়ালটার রেলের (Raleigh) মাধ্যমে বৃটিশ দ্বীপ পুঞ্জের ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে তামাক চাষ শুরু হয় এবং যুক্তরাজ্যে ধূমপানের অভ্যাস জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ধূমপান জনপ্রিয়তা অর্জন সত্ত্বেও বহু শাসক ও সমাজপতি ধূমপানকে না-পছন্দ ও ঘৃণা করতেন।

পোপ তামাককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, তুরস্ক ও রাশিয়ায় ধূমপান শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেম্‌স্ তামাকের বিরুদ্ধে ফরমান জারি করতে বাধ্য হন (Counterblast to Tobacco)। যাতে তিনি ধূমপানকে চক্ষুর জন্য একটি বিরক্তিকর বদঅভ্যাস, নাকের জন্য ঘৃণ্য, মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর এবং ফুসফুসের জন্য বিপদজনক বলে ঘোষণা করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ধূমপানের বিরুদ্ধে সর্বশেষ রাজকীয় ফরমান জারি হয় আবিসিনিয়াতে। নেশাকর ও অপব্যয় বলে ইসলামী ফকীহ্‌গণ ধূমপানকে বর্জনীয় মনে করেন এবং কারো কারো মতে ধূমপান হারাম না হলেও হারামের কাছাকাছি (মাকরূহ তাহ্‌রিমা)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নবীন মুসলিম দল জামা'আতুল ইসলাম ধূমপানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমান বিশ্বজোড়া ধূমপানবিরোধী আন্দোলন সকল উম্মা ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে জোরদার হয়ে উঠেছে।

তামাকের রাসায়নিক উপাদান

তামাক পাতায় ১২-২০% পরিমাণ Ash রয়েছে, তামাক গাছ উৎপন্নের জমিতে কতটুকু খনিজ পদার্থ রয়েছে তার উপর নির্ভরশীল। তামাক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নিকোটিনের (Nicotine) পরিমাণও বিভিন্ন। হাভানা তামাকের শুষ্ক পাতায় নিকোটিনের পরিমাণ ১৫-৩.০%, ভার্জিনিয়া তামাকে ৬-৮% এবং কোন কোন আলজেরীয় তামাকে এর পরিমাণ আরও বেশি।

তামাকের ব্যবহার

১. ধূমপানের জন্যই তামাক পাতা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। ধূমপানের জন্য বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, পাইপ ও বিভিন্ন প্রকারে হুক্কা ব্যবহৃত হয়। প্রতি সিগারেট থেকে ০.৯২ মিলিগ্রাম নিকোটিন ধূমপানকারীর মুখে প্রবেশ করে থাকে।

এই নিকোটিনের পরিমাণ প্রতিটি চুরুট (Cigar) থেকে ৩.৬ মি.গ্রা. এবং প্রতি গ্রাম পাইপ তামাক (Pipe tobacco) থেকে ২.৭ মি.গ্রা. ধূমপানকারীর মুখগহ্বরে প্রবেশ করে। আমাদের দেশের বিড়ি ও হুক্কার মাধ্যমে কত নিকোটিন মুখে প্রবেশ করে সে হিসেব বের করা প্রয়োজন। হুক্কাজাতীয় ধূমপানযন্ত্রে পানি থাকে এবং ধূম

সেই পানিতে ধুয়ে মুখে যায় বলে নিকোটিনের পরিমাণ কম হতে পারে, এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন। আমাদের দেশের নবাব-জমিদারদের দামী ফুরসী যা গ্রামের নারিকেল খোলের তৈরি হুক্কার উন্নত সংস্করণ। এতে তামাকের সঙ্গে নানারূপ খুশবুদার দ্রব্য ব্যবহৃত হতো। এসব লম্বা লাইপের ফুরসী হুক্কা আজও আরব দেশ ও উপহমাদেশের কোন কোন অঞ্চলে চালু আছে।

ধূমপানের সময় কতটুকু নিকোটিন ফুসফুসে প্রবেশ করে তা নির্ভর করে কতটুকু ধূম শ্বাসের সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করছে। ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করা ধূম থেকে নিকোটিন alveoli কর্তৃক শুষে নেয়।

২. ধূমপান ব্যতীত শুকনো তামাক পাতা পানের সঙ্গে মিশিয়ে (জর্দা) খাওয়ার রেওয়াজ উপমহাদেশের সর্বত্রই চালু রয়েছে। জর্দার সঙ্গে নানারূপ সুগন্ধী মিশিয়ে একে লোভনীয় করা হয়। এই উপমহাদেশের উলামাদের মধ্যে এই জর্দাপ্রীতি বেশ উল্লেখযোগ্য।

দাঁতের মাড়ির ব্যথা দূর করার জন্য খৈনির ব্যবহার ভারতের উত্তরাঞ্চলে খুব ব্যাপক। চুন ও তামাকের গুঁড়ো হাতের তালুতে পিষে তা মাড়ির কাছে রেখে দেয়া হয়। বাংলাদেশে এর প্রচলন খুব কম।

৩. ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স রাজদরবারে প্রথম প্রচলিত নস্যির ব্যবহার আজও বিশ্বের সর্বত্র কম-বেশি চালু রয়েছে। তামাক পাতার গুঁড়ো হাতের চিমটার সাহায্যে নাকে ঢুকানোকেই নস্যি নেয়া বলা হয়। বাংলাদেশে এর ব্যবহার খুব ব্যাপক নয়।

তামাকের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া

একটিমাত্র সিগারেটের সামান্য নিকোটিন মানসিক ও শারীরিক শক্তির উপর উত্তেজক হিসেবে কাজ করে। কিন্তু অধিক পরিমাণে নিকোটিন হতোদ্যম (depression) সৃষ্টি ও মাদকদ্রব্য হিসেবে কাজ করে। ধূমপানে আসক্তদের মধ্যে নিকোটিন তাদের স্নায়ুর উত্তেজনা হ্রাস ও শান্ত করতে সাহায্য করে। এতে তাদের হৃৎপিণ্ড বা অন্যান্য অঙ্গের কর্মক্ষমতার কোন হ্রাস হয় না। স্নায়ুর উত্তেজনা হ্রাস করার জন্য ধূমপানের শ্রেষ্ঠ সময় হলো আহারের পর এবং সারাদিনের কাজ থেকে অবসর নেয়ার পর। ধূমপান যে কোন মাদকদ্রব্যের মত নেশাকর বা অভ্যাস সৃষ্টিকারী, তাই সামান্য ধূমপানে সীমিত রাখা অনেকের জন্যই সম্ভব হয় না এবং অনেকেই এই বদ-অভ্যাসের শিকার হয়ে পড়ে। সুতরাং পরিমিত ধূমপানের সামান্য উপকারের জন্য শেষ পর্যন্ত এতে আসক্ত হয়ে পড়ার ঝুঁকি নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

ধূমপানে আসক্তদের নিয়ত নিকোটিন সেবনের ফলে তাদের মধ্যে অবসাদ সৃষ্টি করতে পারে এবং এতে স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড ও পরিপাক যন্ত্রকে উত্তেজিত (Irritable) করতে পারে। যারা বদ্ধ ঘরে ধূমপান করে তাদের তুলনায় খোলা জায়গায় ধূমপানকারীদের মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ কম। তাই ঘরের ভিতর, রেল-স্টিমার, গাড়ী, উড়োজাহাজ প্রভৃতি যে সব স্থানে বহু লোক একসঙ্গে থাকে সে সব স্থানে ধূমপান বেশি ক্ষতিকর।

তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব

১. নতুন ধূমপায়ীদের মধ্যে সাময়িক বমি বমি ভাব, হতোদ্যম, মাথাঘোরা এবং বমিও হতে পারে। নিত্য ধূমপায়ীদের মধ্যে এইসব প্রভাব দেখা যায় না।

২. অতিরিক্ত ধূমপান (So-called chain smoking) নাড়ীর গতি বৃদ্ধি বা (Palitation) সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া এতে হৃদপিণ্ডের সংকোচন অনিয়মিত হয়, এমনকি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়াও সম্ভব।'এ সমস্ত লক্ষণগুলোকে একত্রে Tobacco heart Syndrome বলা হয়।

৩. অতিরিক্ত ধূমপানের ফলে সামান্য পরিশ্রমে কাহিল হয়ে যাওয়া, বদহজম, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস এবং রঙ প্রত্যক্ষ করার শক্তি (Colour perception) নষ্ট হতে পারে। বিশেষ করে লাল ও সবুজ রং পার্থক্য করা কঠিন হয়। এর ফলে গাড়ী চালান কঠিন হবে। কারণ রাস্তার মোড়ের লাল সবুজ বাতির পার্থক্য বোঝা গাড়ী চালকের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৪. অতিরিক্ত ধূমপানের সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সার রোগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। গবেষকদের মতে প্রতিদিন ২৫টি বা ততোধিক সিগারেট পান করলে ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।

৫. দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস ফুসফুসের মধ্যস্থ শ্বাস নালীর প্রদাহ, ক্ষুদ্র অন্ত্রের ঘা এবং করোনারী হৃদরোগের সঙ্গে অতিরিক্ত ধূমপানের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে বলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬. ধূমপানের ফলে খুসখুসে কাশ এবং গলায় প্রদাহ হয়ে থাকে যা ধূমপান বন্ধ করলে নিরাময় হয়।

৭. নিকোটিন পেটের সন্তানের শারীরিক গঠনের বিকৃতি ঘটাতে পারে। তাই গর্ভাবস্থায় ধূমপান করা নিষিদ্ধ।

৮. তামাক ও সিগারেট কারখানায় হঠাৎ করে প্রচুর তামাকের গুঁড়ো ফুসফুসে প্রবেশ করলে বা ভুলে নিকোটিনজাত পোকা মারার ওষুধ খেয়ে ফেললে তীব্র নিকোটিন বিষক্রিয়া হতে পারে। শিশুরা তামাক গিলে খেলেও এরূপ হতে পারে। নিকোটিন একটি মারাত্মক বিষ এবং এর মৃত্যু-পরিমাণ হলো ৪০ মিলিগ্রাম আর তামাকের মারাত্মক পরিমাণ হলো ২ গ্রাম। এ ধরনের বিষক্রিয়ায় সাধারণত নতুন ধূমপায়ীদের লক্ষণগুলোই দেখা যায়। তবে নিকোটিনের পরিমাণ খুব বেশি হলে রোগী অজ্ঞান ও মৃত্যুবরণ করতে পারে। এ অবস্থার সফল চিকিৎসা হলো রোগীকে char-coal খাওয়ানো এবং রাবার টিউবের সাহায্যে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট (lm5000) দিয়ে পাকস্থলির ভিতর পরিষ্কার করা। এ ছাড়া শ্বাসকষ্ট হলে কৃত্রিম শ্বাস প্রক্রিয়ারও প্রয়োজন হতে পারে।

ব্রঙ্কিয়াল কারসিনোমা ও ধূমপানের সম্পর্ক

সম্প্রতি সারা বিশ্বে ফুসফুসের ক্যান্সারের সংখ্যা ভীতিজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও এখন পর্যন্ত এই রোগ পুরুষদের মধ্যেই বেশি তবুও মেয়েদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ রোগের সংখ্যা মেয়েদের মধ্যেও বেশ বেড়ে যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারের ফলে ১৯৫১-৭৫ সাল এ পঁচিশ বছরের মৃত্যুহার নিম্নে দেয়া হলো। এ থেকে এই রোগের ক্রমবৃদ্ধির উচ্চ হার স্পষ্ট বোঝা যাবে।

১৯৭৯ সালে কেবল ইংল্যাণ্ডে ফুসফুসের ক্যান্সারে সবচেয়ে বেশি পুরুষ মৃত্যুবরণ করে যার পরিমাণ ছিল সমস্ত ক্যান্সারে মৃতের ৩৯% এবং একই সময়ে এটা ছিল মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানীয় (১৩%)। মেয়েদের মধ্যে ক্যান্সারে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করেছিল স্তনের ক্যান্সার রোগে (২০%)। সুতরাং ফুসফুসের ক্যান্সার একটি ব্যাপক মারাত্মক ব্যাধি।

গবেষণাকাল	মৃতের সংখ্যা		
	পুরুষ	নারী	মোট
১৯৫১-৫৫	১৬,৬৭৮	২,৬৫৬	১৯,৩৩৪
১৯৫৬-৬০	২২,৬৭০	৩,১০১	২৫,৭৭১
১৯৬১-৬৫	২৯,৯৭৪	৩,১৯৩	৩৩,১৬৭
১৯৬৬-৭০	৩৩,৪৩০	৪,৯১৬	৩৮,৩৪৬
১৯৭১-৭৫	৩৭,২৫৮	৫,৮৯৫	৪৩,১৫৩

বাংলাদেশের এই রোগের সঠিক পরিসংখ্যান জানা না থাকলেও বর্তমানকালে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কোনও সন্দেহ নেই যে, ফুসফুসের ক্যান্সারের সঙ্গে ধূমপানের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি, বিশেষ করে অত্যধিক সিগারেট সেবন। বিভিন্ন পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, ধূমপানের অভ্যাস বৃদ্ধির সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা সরাসরি বৃদ্ধি পায় আর সিগারেটের ফেলে দেওয়া অংশ যত অধিক, ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা তত কম। যদিও চুরুট এবং পাইপ ব্যবহারে জিহ্বার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ধূমপান ত্যাগ করলে ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকে এবং দশ বছর পর এ সম্ভাবনা অধূমপায়ীদের সমতুল্য। অবশ্য বেশী ধূমপানে ব্রঙ্কাইটিস হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। পানের সঙ্গে জর্দা ব্যবহারের পরিমাণ খুব কম বলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। খৈনির বেলায়ও তাই, তবে অতিরিক্ত খৈনির ব্যবহারে মুখে ক্যান্সার হতে পারে।

প্রতি ১০০টি সিগারেটের ধূমে প্রায় এক মাইক্রোগ্রাম (lmg) 3.4 benzpyrene থাকে যা এককভাবে খুব মারাত্মক নয় যদিও তা ক্যান্সার করে থাকে। দেখা গেছে

সিগারেটের ধূমে আলকাতরা রয়েছে যা শক্তিশালী ক্যান্সার সহায়ক। এ ছাড়া কলকারখানা ও পাকঘরের ধূম এবং Internal combustion engine (সাধারণত সকল মোটরযানের ইঞ্জিন)-এর ধূমে সব বড় শহরের আবহাওয়া কলুষিত হয়ে থাকে। কারণ এ সবেই ক্যান্সার উৎপন্নকারী বেনজপাইরিন থাকে। কোন কোন আধুনিক শহরে এর পরিমাণ প্রতি ১০০ কিউবিক মিটার বাতাসে প্রায় ৫ মইক্রোগ্রাম (5mg) বা পাঁচশত (৫০০) সিগারেটের সমান ক্ষতিকর। এই কারণে বড় বড় শহরে ফুসফুসের ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। আবহাওয়ার কলুষ অনিচ্ছায় ফুসফুসে প্রবেশ করে আর ধূমপায়ী এই ক্ষতিকর ধূম স্বইচ্ছায় ফুসফুসে টেনে নেয়। এখন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই যে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় ক্যান্সারকারী ও ক্যান্সার সহায়ক এর সচেতনতার অভাবেই ফুসফুসের ক্যান্সার হয়। অতিরিক্ত ধূমপান এতে প্রবাদ বাক্যের উটের পিঠে শেষ কাঠি (Last straw on the camel's back) বা বন্দুকের ট্রিগার হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের বড় বড় শহরে অধিকাংশ বাস, ট্রাক ও টেম্পোর ইঞ্জিন এত খারাপ যে, এগুলো শহরময় দূষিত কালো গ্যাস ছড়াচ্ছে যাতে রয়েছে প্রচুর ক্যান্সার সৃষ্টিকারী বিষ 3.4 benzpyrene।

সুতরাং ধূমপান নিরোধ অভিযানের সঙ্গে এ সব খারাপ গাড়ী রাস্তা থেকে না হটালে কোন লাভ হবে না।

নস্যির ব্যবহার বলতে গেলে একটি নোংরা অভ্যাস। এতে আঙুল, নাকের ছিদ্রদ্বয় ও কাপড় নস্যির রঙে রঞ্জিত হয়। এটাও শেষ পর্যন্ত মাদকদ্রব্যের মত নেশা হয়ে যায়, তাই আজকাল উন্নত চিকিৎসার যুগে নস্যি নেহায়েত অচল। তবে নস্যি গ্রহণে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় কি না তা দেখার জন্য গবেষণার প্রয়োজন।

দুঃখের বিষয় তামাক ও সিগারেট কোম্পানী সারা বিশ্বে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচারপত্র ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন জনপ্রিয় খেলার আয়োজন করে জনসাধারণকে এই ক্ষতিকর বস্তুর দিকে আকর্ষণ করে যাচ্ছে। এসব কোম্পানী অনেক সময় বিভিন্ন লোকহিতকর কাজে দান করেও মানুষের মন আকৃষ্ট করে থাকে। সবশেষে বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও ইসলাম উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই ধূমপান-বর্জিত হওয়া উচিত। এ জন্য শুধু আইন নয়, মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে এবং শহরের পরিবেশকে ধূয়া ও দূষণমুক্ত করতে হবে।

অগ্রপথিক। সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

দ্রুত ভ্রমণ এবং সুস্বাস্থ্য

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

হাঁটা এবং দৌড়ানো এ দু'টি শব্দের ৪টি ইংরেজি প্রতিশব্দ রয়েছে। এগুলো হলো– (১) Walking (২) Roving (৩) Jogging, (৪) Running। এ ৪টি শব্দের অর্থের পার্থক্য চলার গতিতে। সাধারণত সম উচ্চতায় সম্মুখের দিকে দেহ সঞ্চালনের গতি এ শব্দগুলো দ্বারা প্রতিফলিত হয়। কোনো মুহূর্তে চলার সময় ২টি পায়ের দূরত্ব বা পদক্ষেপ্-এর দৈর্ঘ্য দ্বারা চলার গতি নিরূপিত হয়। এ ছাড়া এ শব্দগুলোর অর্থের মধ্যে আরো পার্থক্য আছে।

দাঁড়িয়ে থাকার সময় দু'টি পদই ভূমি স্পর্শ করে থাকে। হাঁটার সময় সাধারণত একটি পা ভূমিতে এবং অপর পা'টি পদক্ষেপের জন্যে ভূমি হতে আলাদা থাকে। Roving অর্থও হাঁটা তবে অতি দ্রুত হাঁটা। দ্রুত হাঁটার (Roving) সময় পা মাটি স্পর্শ করে থাকে অপেক্ষাকৃত কম সময়। ভূমির উপরে থাকে আরো বেশি সময়। দৌড়ানো কি তা আমরা সকলে বুঝি। জগিং হলো একটু কম গতিতে দৌড়ানো।

হাঁটার সময় কোনো এক সময়ে বা অবস্থায় দু'টি পা-ই ভূমি স্পর্শ করে থাকে। দৌড়াবার সময় ঘটে তার উল্টো। লম্ফ দেওয়ার সময় যেমন দু'টি পা-ই একসঙ্গে ভূমির উর্ধ্বে থাকে, দৌড়াবার সময় সেরূপ ঘটে। অবশ্য কিছুটা কম সময়ে। দৌড়াবার কালে কোনো এক অবস্থায় বা মুহূর্তে দু'টি পা ভূমি থেকে আলাদা হয়। তবে তা ক্ষণিকের তরে। যদি বহুক্ষণ পর্যন্ত দু'টি পা-ই ভূমি থেকে আলাদা বা উপরে থাকে সে অবস্থাকে বলা হয় উড়া বা উড্ডয়ন। যেমন পাখিরা করে থাকে।

পাশ্চাত্যবাসী দ্রুত (Roving) হাঁটা এবং দৌড়াবার মাঝামাঝি আরেকটি গতিতে অগ্রসর হন। এটা নিয়মিত এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য। এ শব্দটি হলো জগিং। জগিং-এর সময় চলার গতি দ্রুত হাঁটার চেয়ে বেশি কিন্তু দৌড়ানো থেকে কম। দৌড়ানো থেকে গতি কম হওয়ার কারণে জগিং দীর্ঘক্ষণ করা যায় এবং বহুদূর পর্যন্ত জগিং করা যায়। জগিং-এর সময় একটি পা থাকবে ভূমিতে এবং আরেকটি পা সর্বদা ভূমির উর্ধ্বে। রোভিং-এর গতি হাঁটার থেকে বেশি কিন্তু জগিং থেকে কম।

হৃৎপিণ্ড

হৃৎপিণ্ড দেহের একটি বিশেষ ধরনের অঙ্গ। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ইচ্ছাকৃত অঙ্গ (Voluntary) এবং অনিচ্ছাকৃত অঙ্গ (Involuntary) হাত-পা ইত্যাদি নড়াচড়া করে। এগুলোর এই নড়াচড়াটা ইচ্ছাকৃত। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই আমি হাত নাড়তে পারি, পা নাড়ি, ঘাড় নাড়ি, চোখ নাড়তে পারি। আবার ইচ্ছা না করলে স্থিরও রাখতে পারি।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে মন। মন যদি ইচ্ছা করে কোনো কিছু দেখবে না, তাহলে চোখ দু'টি বন্ধ করে রাখতে পারে। মন হাঁটতে না চাইলে পা দুটোকে থামিয়ে রাখতে পারে। আর মন ইচ্ছা করলে পা দু'টো যে কোনো মুহূর্তে নড়াচড়া করতে পারে।

যখন মানুষ ঘুমায়, ইচ্ছাকৃত (Voluntary) অঙ্গগুলো বিশ্রাম হয়। হৃৎপিণ্ড একটি ভিন্ন ধরনের অঙ্গ। এটা কখনও রেস্ট (Rest) নেয় না। মনের হুকুমে চলে না। শিশু বা পিঁপড়া থেকেও হৃৎপিণ্ড অনেক বেশি চঞ্চল। মন ইচ্ছা করলে হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ করতে পারে না। তাই হৃৎপিণ্ডকে অনিচ্ছাকৃত অঙ্গ বলা হয়।

হৃৎপিণ্ডও অবশ্য বিশ্রাম নিতে পারে। তবে তা হলো পূর্ণ বিশ্রাম। প্রাণ চলে গেলে হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম নেয়। অন্য দিকে বলা চলে হৃৎপিণ্ড বিশ্রাম নিলেই মৃত্যু হয়।

দেহের মধ্যে সবচেয়ে কর্মঠ অঙ্গ হলো হৃৎপিণ্ড। মস্তিষ্কও বিশ্রাম বা Rest নেয়। কিন্তু হৃৎপিণ্ড Rest নেয় না বা বিশ্রাম নেয় না। এটা একটা Pumping Station -এর মতো। প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড হতে ৫ লিটার রক্ত শিরার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

তরল পদার্থ সাধারণত উপর থেকে নিচের দিকে যায়। এর কারণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত মাথার দিক অপেক্ষা নিচের দিকে অর্থাৎ পায়ের দিকে বেশি প্রবাহিত হয়। দৌড়ানো, অল্প দৌড়ানো (Jogging), দ্রুত হাঁটা (Roving) -এর ফলে পায়ের দিকে রক্ত বেশি প্রবাহিত হয় এবং পায়ের মাংস Cellগুলো বেশি কর্মঠ হয়।

শিরা-উপশিরায় চর্বি জমে, যেমন– নালার বা খালের পাশে বালি জমে। দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি, মৃদু দৌড়াদৌড়ির সময়ে শিরায় এবং ধমনীতে জমা চর্বিগুলো রক্তকণিকা ঠেলে নিয়ে যায়। এটা সম্ভব রক্তপ্রবাহের গতি যদি বৃদ্ধি পায়।

দৈহিক কাজ এবং উপবেশিত (Sedentary) কাজ

Dr. R.S. Papen Barger যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিখ্যাত হৃদয় বিশেষজ্ঞ (Heart Specialist) ও চিকিৎসক। তিনি হৃৎপিণ্ডের উপর বিভিন্ন ধরনের গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ২০,০০০ রেলওয়ে শ্রমিকের উপর একটি গবেষণার জরিপ তিনি পরিচালনা করেন। এই গবেষণার বিষয় ছিলো উচ্চ রক্তচাপ এবং হার্ট এ্যাটাকের উপর ধূমপান ও অলসতার প্রভাব প্রতিক্রিয়া।

তিনি একই ধরনের গবেষণা ২০,০০০ অফিস কর্মকর্তার উপর চালিয়েছিলেন যারা বসে বসে কাজ করেন। যে ধরনের রেলওয়ে কর্মচারীদের উপর তিনি গবেষণা চালিয়েছিলেন, তাদের কাজ ছিলো হেঁটে হেঁটে কাজ করা। অর্থাৎ কাজের প্রকৃতি ছিলো শারীরিক।

ড. আর. এস. পাপেনবার্জার (Dr. R.S. Papen Barger)-এর গবেষণার জরিপে প্রাপ্ত একটি তথ্য হলো– যাঁরা চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করেন, তাদের হার্ট এ্যাটাকের সম্ভাবনা যাঁরা দাঁড়িয়ে এবং হেঁটে কাজ করেন তাদের থেকে প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ রেলওয়ে শ্রমিকদের মধ্যে যারা শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের হার্ট এ্যাটাক হয় যারা বসে বসে কাজ করে তাদের অর্ধেক।

যারা বসে বসে কাজ করে তাদেব হার্ট এ্যাটাক কমাবার একটি পদ্ধতি হলো দৈনিক অন্তত ১ ঘন্টা Roving বা দ্রুত হাঁটা Jogging করা। তা করতে হবে দিনে দু'বার। ৩০ মিনিট সকাল বেলা এবং ৩০ মিনিট বিকেল বেলা। অর্থাৎ দৈনিক ২৪ ঘণ্টা সময়ের অন্তত দু'ঘণ্টা এমন মানের কায়িক পরিশ্রম করতে হবে যাতে দেহ ঘর্মাক্ত হয়।

হাঁটার গতি অবশ্যই স্বাস্থ্যের পক্ষে যতটুকু দ্রুত হাঁটা সম্ভব তার বেশি করা উচিত নয়। কেউ দ্রুত হাঁটছেন কি শ্লথ গতিতে হাঁটছেন তা নির্ণয়ের একটি ফর্মুলা আছে।

কিছুক্ষণ দ্রুত হাঁটা বা দৌড়ানোর পর এক মিনিট বিশ্রাম করতে হবে। তারপর হার্টবীট গণনা করতে হবে। যদি হার্টবীট প্রতি মিনিটে ১০০ হয় তাহলে বুঝতে হবে হার্টবীট স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গত। যদি হার্টবীট প্রতিমিনিটে ১৩০ অতিক্রম করে তখন বুঝতে হবে ভ্রমণের গতি ব্যক্তির স্বাস্থ্যসম্মত গতি থেকে বেশি হয়ে গেছে।

দ্রুত ভ্রমণ এবং জগিং-এর গতি

একটি মানুষের দ্রুত ভ্রমণ বা দৌড়ের গতি কত হওয়া উচিত— এটা নির্ভর করবে ভ্রমণের উদ্দেশ্য, ব্যক্তির বয়স, তার স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের উপর। যুক্তরাষ্ট্রের Harvard School of Public Health-এর প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ড. আই. মিনলী (Dr. I. Minllee) ২০ বছরব্যাপী ১,৭৩০০০ জন মধ্যবয়সী ব্যক্তির (পুরুষ) উপর তাদের হাঁটার গতিবেগ, প্রতিক্রিয়া, স্বাস্থ্যের অবস্থা, খাদ্যরুচি, জীবনকাল ইত্যাদির উপর ব্যাপক গবেষণা চালিয়েছিলেন। এই গবেষণার ফলে তার প্রাপ্ত একটি তথ্য হলো, যাঁরা প্রায় প্রত্যেক দিন দ্রুতবেগে হাঁটেন তাঁরা দীর্ঘজীবী হন। তাঁদের থেকে বেশি দীর্ঘজীবী যারা সাপ্তাহে একদিন-দু'দিন ভ্রমণ বা দৈহিক ব্যায়ামে ঘর্মাক্ত হন।

ড. মিনলীর আরেকটি সিদ্ধান্ত হলো আধমনা (Half-hearted) ভ্রমণ বা উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণ (Hopping) জীবনকাল বা স্বাস্থ্যের উপর তেমন কোনো শুভ

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ড. আই. মিনলী-এর গবেষণার তথ্য বিবরণী 'জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশন' এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বহুল প্রচারিত মার্কিন সাপ্তাহিক 'টাইম ইন্টারন্যাশনাল'-এর মে ১, ১৯৯৫ সংখ্যায়ও ড. মিনলী'র ২০ বছরব্যাপী গবেষণার ফলাফলের উপর ফিচার মুদ্রিত হয়।

দ্রুত ভ্রমণ এবং দৌড়ের একটি উদ্দেশ্য হলো শারীরিকভাবে সুস্থ এবং প্রফুল্ল থাকা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো সুস্বাস্থ্য নিয়ে জীবন যাপন করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো জীবনকাল বা মেয়াদ বৃদ্ধি করা। অনেকেই বলে থাকেন, মৃত্যু যখন নির্ধারিত তখন মৃত্যু হবেই। কথাটি পূর্ণ সত্য নয়।

আল্লাহ্ সর্ব-শক্তিমান। তাঁকে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। মানুষকে আল্লাহ্ ফিৎরাতে সৃষ্টি করেছেন। তদুপরি তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন যা অন্যান্য প্রাণীর নেই। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির কারণে একমাত্র মানুষের হাশরে বিচার হবে, কোনো প্রাণীর নয়।

মানুষ নিজের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা স্বভাববিরুদ্ধ পাপ কাজ করতে পারে। মানুষের আচরণের ফলে তাদের হায়াৎ আল্লাহ্ বৃদ্ধি করতে পারেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় জনগণ ও বাঙালিদের গড়পরতা আয়ু ছিলো ইউরোপীয়ান এবং রাশিয়ানদের থেকে বেশি। রাশিয়ানদের আয়ু এখন ৭০-৮০ এর উর্ধ্বে। জাপানীদের তো ১০০ ছোঁয়াছুঁয়ি করছে। আমাদের ৩০ থেকে ৫০ এর উর্ধ্বে উঠে গেছে।

হার্ভার্ড চিকিৎসক ড. লী-এর গবেষণায় দেখা যায় যে, যারা ১২ মিনিটে ১ মাইল (1.6 k.m) দৌড়ান তারা ভ্রমণ থেকে দৌড় ও আধা দৌড়ে পূর্ণ সফলতা লাভ করেন, তাদের আয়ু দীর্ঘতর হয়।

ড. লী-এর গবেষণায় হাঁটার গতির সঙ্গে জীবনকালের মেয়াদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দ্রুত না হাঁটলে অতিরিক্ত ক্যালরী খাওয়ার ফলে মেটাবলিক রেইট বা ক্যালরিতে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় রূপান্তর (মেটাবলিজম) প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয় না। এর ফলে কোলেস্টেরল চর্বি শিরা এবং ধমনীতে জমা হয়। যদি হাঁটার ফলে দেহ ঘর্মাক্ত না হয়, তবে এ হাঁটা ডায়াবেটিক রোগীদের বড় একটা উপকারে আসে না। অবশ্য কিছুটা উপকার যে একেবারেই হয় না তা নয়। যুবকদের অন্তত ঘন্টায় ৫ মাইল গতিতে অর্থাৎ ১২ মিনিটে ১ মাইল হাঁটা উচিত। যদি কেউ স্বাস্থ্যবান, প্রফুল্ল এবং দীর্ঘজীবী হতে চান এই মেয়াদের হাঁটা অত্যাবশ্যক।

অগ্রপথিক। মার্চ ২০০৩

হৃদরোগের ছোবল থেকে বাঁচুন

ডা. (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত

হৃদরোগ বিষধর সর্পের ছোবলের মতই একটি ভয়ানক রোগ। সবারই এর হাত থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। হৃদরোগের মধ্যে যে তিনটি রোগে অধিকাংশ লোকের, বিশেষ করে ধনিক শ্রেণীর লোকের মৃত্যু ঘটে, তা হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure), অ্যানজাইনা পেক্টোরিস (Angina Pectoris) এবং করোনারী থ্রম্বোসিস (Coronary Thrombosis)। এগুলি আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সবগুলিরই অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এ্যাথেরোসক্লেরোসিস (Atherosclerosis) ঃ অর্থাৎ শিরা-উপশিরায় কোলেস্টেরল (Cholesterol) জমা হওয়া। কোলেস্টেরল মানে চর্বি। চর্বি রক্তের ভিতর দিয়ে যখন সূক্ষ্ম আকারে প্রবাহিত হয়, তখন তাকে কলেস্টেরল বলে।

নদী-নালায় যেমন বালু বা পলিমাটি জমা হয়ে নদীর গভীরতা এবং প্রশস্ততা কমিয়ে দেয়, যার ফলে প্রচুর পানি ঐ নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না, আমাদের শরীরে শিরা উপশিরায় কোলেস্টেরল জমা হলে, পরিমিত রক্ত ঐ রক্তনালী দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে না। ফলে পরিমিত রক্তের অভাবে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং চর্বি খেতে মজাদার হলেও লোভাতুর লোকদের, বিশেষ করে বয়স্ক লোকদের এ ব্যাপারে লোভ সংবরণ করা একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু উচ্চ রক্তচাপ থেকেই পরবর্তী মারাত্মক রোগগুলির সৃষ্টি হয়, সুতরাং উচ্চ রক্তচাপ সম্বন্ধেই প্রথমে কিছু বলা দরকার।

উচ্চ রক্তচাপ (High Blood Pressure)

শরীরে রক্ত চলাচল করার সময় শিরা ও উপশিরায় যে চাপের সৃষ্টি হয়, তাকেই রক্তচাপ বা Blood Pressure বলে। একজন সুস্থ লোকের রক্তচাপ কত থাকা উচিত ? সাধারণত ১২০/৮০ মিলিমিটার অব্ মার্কারীকেই স্বাভাবিক রক্তচাপ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু এটা সব মানুষের জন্য একই রকম নাও হতে পারে। বয়স ও শরীরের আকার অনুসারে রক্তচাপ কম-বেশী হয়ে থাকে। বিশেষ করে বয়সের সঙ্গে রক্তচাপের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাই এ সম্বন্ধে একটি মোক্ষম ফরমূলা হচ্ছে, বয়স+৯০,

অর্থাৎ আপনার বয়স যদি ৩০ বৎসর হয়, তবে আপনার রক্তচাপ হবে ৩০+৯০ = ১২০ এবং এটা হবে Systolic Pressure। রোগী পরীক্ষার সময়, আপনারা লক্ষ করলে দেখতে পাবেন যে, ডাক্তারগণ রক্তচাপ লিখতে দুটি অংক লিখে থাকেন। দাগের উপরে যেটা লেখেন, ওটা হচ্ছে Systolic Pressure, আর দাগের নিচে যেটা লেখেন, ওটা হচ্ছে Diastolic Pressure. Systolic Pressure মানে হৃৎপিণ্ড যখন সঙ্কুচিত হয় (Contraction), তখন যে চাপ হয়, সেটা হচ্ছে সিস্টোলিক প্রেসার, আর হৃৎপিণ্ডের যখন সম্প্রসারণ (Expansion) হয়, তাঁকে বলে ডায়াস্টোলিক প্রেসার।

এখন একটা প্রশ্ন জাগে, কত রক্তচাপ হলে সেটাকে আমরা উচ্চ রক্তচাপ বলে গণ্য করব। বয়সের উপরেই এটা বেশির ভাগ নির্ভর করে। তবে সাধারণত আমরা ১৫০/৯০ চাপকেই উচ্চ সীমার মধ্যে গণ্য করে থাকি। এর বেশি হলেই যেমন ১৬০/৯৫ মিলিমিটার অব্ মারকারী, তাকে উচ্চ রক্তচাপ হিসেবে (High Blood Pressure) গণ্য করা যায়। উচ্চ রক্তচাপ হিসাব করতে ডায়াসটোলিক প্রেসারের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তবে মানুষে মানুষে এ ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে। অনেকে ১৮০/১০০ প্রেসার নিয়েও দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে, আবার অনেকে ১৬০/৯৫ প্রেসার হলেই ধরাশায়ী হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিচ্ছে। সুতরাং এ ব্যাপারে ধরাবাঁধা কোন নিয়ম নেই। তবে মোটামুটিভাবে ১৬০/৯৫ বা তদূর্ধ্ব চাপকেই হাই প্রেসার ধরা হয়।

রক্তচাপের কারণ

আগেই বলেছি, শিরা-উপশিরায় কোলেস্টেরল জমা হওয়াটাই রক্তচাপের প্রধান কারণ। এটা এই জন্য হয় যে, শিরা-উপশিরার ভেতরের দেয়ালে এই কোলেস্টেরল জমা হওয়ায় রক্তনালীর গভীরতা ও প্রশস্ততা কমে যায়, ফলে খরস্রোতা নদীর মতো রক্তনালীর গায়ে রক্তের চাপ বেশি পড়ে, যার জন্য রক্তচাপ বেড়ে যায়। ধনিক শ্রেণী এবং স্থূলকায় লোকদেরই এটা বেশি হয়ে তাকে, কেননা তারা চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দ্বারা সর্বদা পেটপূর্তি করে রাখে। এ ছাড়া বংশগতভাবেও রক্তচাপ হতে পারে। এ ধরনের রক্তচাপকে বলে Essential Hypertension বা প্রাথমিক উচ্চ রক্তচাপ। আবার বিভিন্ন রোগের কারণেও উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে, তাকে বলে Secondary Hypertension বা কোন কারণজনিত উচ্চ রক্তচাপ। এই রোগগুলি হচ্ছে ঃ মূত্রাশয়ের রোগ (Kidney Diseases), অগ্নাশয়ের টিউমার (Tumour of the pancreas) এবং মেয়েদের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ রোগ আছে, যেগুলিতে উচ্চ রক্তচাপ হয়ে থাকে, যেমন গর্ভবতী অবস্থায় এ্যাকলামশিয়া বা খিঁচুনি (Eclamsia) এবং মাসিক বন্ধ হলে (Menopausal Syndrom। এ ছাড়া জন্ম-নিরোধ ট্যাবলেট ব্যবহারে কোন কোন মহিলার উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ ঃ উচ্চ রক্তচাপ হলে সাধারণত মাথা ঘোরায় বা মাথায় চক্কর দেয়, ঘাড়ে এবং মাথায় ব্যথা হয়, রৌদ্রে পথ-চলতে বা কাজকর্ম করতে অসুবিধা হয়, তারা ঠাণ্ডা বেশি পছন্দ করে, বুক ধড়ফড় হতে পারে, রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ডাক্তারী পরীক্ষায় উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ে এবং নাড়ির গতি বেশি পাওয়া যায়। বুকের এক্সরে এবং ই.সি.জি (E.C.G.) করে হার্টের অবস্থা দেখে নেওয়া উচিত। অন্যান্য পরীক্ষার মধ্যে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ এবং প্রস্রাবে সুগার আছে কি না, তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রতিকার ঃ চর্বিজাতীয় খাদ্য যেমন ঘি, মাখন, ছানা, খাসির গোশ্ত, গরুর গোশত্, ইলিশ মাছ, পাঙ্গাস মাছ, সরপুঁটি এবং অন্যান্য তৈলাক্ত মাছ-মাংস না খাওয়াই এ রোগের হাত থেকে বাঁচার প্রধান উপায়। এ ছাড়া Secondary Hypertension-এর বেলায়, যার যে রোগ আছে, তার চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন। যেসব মহিলার উচ্চ রক্তচাপ আছে, ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত তাদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বড়ি না খাওয়াই ভাল। এ ছাড়া নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটি করা, সিগারেটের অভ্যাস থাকলে তা বর্জন করা, দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা, পারিবারিক কলহ দূর করা এবং রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাবার অভ্যাস করা (Early to bed and early to rise) একান্ত প্রয়োজন। লবণ কম খাওয়া ভাল।

চিকিৎসা ঃ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিম্নের ঔষধগুলির যে কোন একটা খাওয়া যেতে পারে, যেমন Serpasil, Ismelin, Aldomet, Inderal, Esidrex. Alpha Methyl Dopa – এসব বড়ি রক্তের চাপ অনুসারে একবার, দুইবার বা তিনবার দেওয়া হয়। এর সঙ্গে প্রস্রাব বাড়াবার জন্য Diuretics যেমন Lasix. Neonaclex. Furalax ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। সেইসঙ্গে ঘুমের জন্য Relaxen, Seduxen দেওয়া যেতে পারে।

নিম্ন রক্তচাপ (Low Blood Pressure)

সবাই উচ্চ রক্তচাপ নিয়েই মাথা ঘামায় কিন্তু নিম্ন রক্তচাপ বলেও একটি রোগ আছে, যা অনেককে ভোগায়। এতে রক্তের চাপ কম থাকে পুষ্টিহীনতা, নানাবিধ রোগ আর শরীরে রক্ত কম থাকাই (Anaemia) এর প্রধান কারণ। শরীরের দুর্বলতা, কানে তালা লাগা এবং কাজকর্মে অনীহা ও অক্ষমতাই এর প্রধান লক্ষণ।

প্রতিকার ঃ প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া, বিশ্রাম নেওয়া এবং রক্তশূন্যতা থাকলে রক্তবর্ধক ঔষধ খাওয়া প্রয়োজন।

Angina pectoris ঃ যে শিরা স্বয়ং হৃৎপিণ্ডকে রক্ত সরবরাহ করে, তাকে বলে করোনারী আর্টারী (Coronary Artery)। এই করোনারী আর্টারীর ভেতর চর্বি জমাট হলে বা অন্য কোন কারণে এর সংকোচন বা Contraction হয়, যার ফলে

হৃৎপিণ্ডে ঠিকমত রক্ত সাপ্লাই হয় না, তখন বুকে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, এই রোগকে অ্যানজাইনা পেক্টোরিস বলে। মনে ক্রোধ-চিন্তা ভাবনা থাকলে, অধিক পরিশ্রম করলে বা ঠাণ্ডায় ভ্রমণ করলে বা তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ ঃ বুকের মাঝখানে (Sternun -এর নিচে) প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। রক্তের চাপ ও নাড়ির গতি বৃদ্ধি পায়, রোগী ঘামতে থাকে।

চিকিৎসা ঃ Angised Tab. ১ বা ২ বা বড়ি, তাড়াতাড়ি জিহ্বার নিচে দিতে হয়। সেইসঙ্গে Segontin বা Persantin বা Coroxin বা Cardinal ১ বড়ি করে তিনবার খাওয়ার পূর্বে খেতে হয়। এর সঙ্গে Relaxen বা Seduxen দেওয়া যেতে পারে। ডাক্তারের পরামর্শ অবশ্য নিতে হবে।

করোনারী থ্রম্বোসিস্ ঃ হৃদরোগের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি মারাত্মক এবং মানুষের হঠাৎ মৃত্যুর কারণই হচ্ছে এই করোনারী থ্রম্বোসিস্। সিফিলিস, চর্বি জমাট বা Thrombus থেকে করোনারী আর্টারী বন্ধ বা ব্লক হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে Heart muscle-এর Necrosis শুরু হয়ে যায়, আর তখনি বুকের মাঝখানে (একটু বামে) এমন প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয় যে (Stabbing pain) রোগী আর চলতে পারে না, হঠাৎ করে বসে পড়ে বা ধপাস করে পড়ে যায়, আর উঠতেই পারে না। অনেকে বাথ্‌রুমে গিয়ে সেখান থেকে আর বের হয়ে আসতে পারে না, কেউ কেউ আবার চেয়ারে বসে বসে কর্মরত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে।

লক্ষণ ঃ রক্তের অভাবে মুখ ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে, শরীরে ঘাম দেখা দেয়, অসহ্য ব্যথায় রোগী ছট্‌ফট করতে থাকে, এমনকি গড়াগড়িও দিতে পারে। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয়। রক্তের চাপ কমে যায়, নাড়ির গতি বেড়ে যায়। রক্তের E.S.R. বৃদ্ধি পায়, E.C.G. তে Q-ধরা পড়ে।

চিকিৎসা ঃ এ রোগের চিকিৎসা খুবই জটিল। কাজেই হাসপাতাল বা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে জরুরী ভিত্তিতে Angised ট্যাবলেট জিহ্বার নিচে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া, অক্সিজেন দিতে পারলে ভালো হয়। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।

রোগীর সেবায় মহানবী (সা)

মুফতী মুতীউর রহমান

হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন গোটা পৃথিবীর সকল সৃষ্টি জীবের জন্য রহমত। তাঁর পূত-পবিত্র অস্তিত্ব প্রকৃতি-স্বভাব, আচার-আচরণ সব কিছুই ছিল সেই অফুরান রহমতের অনন্য ধারায় সিঞ্চিত। তিনি মানুষের জন্য যে পূর্ণাঙ্গ দীন নিয়ে এসেছিলেন তার প্রতিটি পরতে পরতে সর্বক্ষেত্রে সুপ্রবাহিত হয়েছে অনন্ত রহমেরত ফল্গুধারা। পৃথিবীর সকল মানুষের ব্যক্তি জীবনের সীমিত গণ্ডি থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের পরিব্যাপ্তিতেও উপচে পড়েছে তাঁর আনীত দীনের রহমত ও বরকতের ধারা।

সামাজিক জীবনের অন্যসব বিষয়ের পাশাপাশি রোগী সেবার ক্ষেত্রেও তাঁর রেখে যাওয়া আদর্শ সত্যিই অনুপম। এত মহান মানুষ হয়েও তিনি যেভাবে সর্বশ্রেণীর রোগীর সেবায় এগিয়ে এসেছেন তার দ্বিতীয় নজীর কোথাও পাওয়া যাবে না। তিনি নিজেও রোগীর সেবায় নিঃস্বার্থভাবে, অনাবিল দরদ নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এবং কিয়ামত অবধি তাঁর অনুসারীদেরকেও রোগীর সেবার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। আর্ত, পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষার ফযীলত বর্ণনার মাধ্যমে সকল মুসলমানকে আর্ত সেবার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

রোগীর সেবার ক্ষেত্রে রাসূল (সা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আদর্শকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

এক. রোগী-সেবার প্রতি গুরুত্বারোপ।

দুই. রোগী-সেবার ফযীলত বর্ণনা।

তিন. রোগী-সেবা না করার নিন্দা।

চার. নিজে রোগীর সেবা করা।

রোগী-সেবার প্রতি গুরুত্বারোপ

আর্ত সেবার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন–

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের পাঁচটি হক্ব। সালামের জবাব দেয়া, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা, জানাযার অনুসরণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব দেয়া।[১]

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন, তোমরা ক্ষুধার্তকে আহার করাও, রোগীর সেবা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর।[২] (সহীহ বুখারী ২য় খণ্ড, ৮৪৩)

হযরত বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) আমাদের সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের সোনার আংটি, মোটা, পাতলা ও কারুকার্যখচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং কাসসী ও মিয়সারা কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি আমাদের আদেশ করেছেন ঃ আমরা যেন জানাযার অনুসরণ করি, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করি এবং সালামের প্রসার করি।[৩]

রোগী সেবার ফযীলত বর্ণনা

রাসূল (সা) বহু হাদীসে রোগী সেবার বর্ণনা করেছেন।

হযরত সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, কোনও মুসলিম তার কোনও মুসলিম ভাইকে সেবা-শুশ্রূষা করতে গেলে সে ততক্ষণ যেন জান্নাতের খুরমা বাগানে অবস্থান করে।[৪]

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-কে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম যদি কোন মুসলিম রোগীকে ভোরে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করেন। আর যদি সন্ধ্যার সময় কোন মুসলিম রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে যায় তবে তার জন্য ভোর পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা দোয়া করেন। আর তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান হবে।[৫]

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খুব ভালভাবে ওযূ করল অতঃপর সওয়াবের নিয়তে কোনও মুসলমান রোগী ভাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা করল তার ও জাহান্নামের মধ্যে সত্তর বছরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দেয়া হবে।[৬]

রোগীর সেবা না করার অশুভ পরিণতি বর্ণনা

রাসূল (সা) বিভিন্ন হাদীসে রোগীর সেবা না করার পারলৌকিক অশুভ পরিণতি উল্লেখ করেছেন। যা একজন প্রকৃত মুমীনকে রোগীর সেবায় উদ্বুদ্ধ করবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা (কোন কোন বান্দাকে) বলবেন ঃ হে আদম সন্তান!

আমি অসুস্থ ছিলাম কিন্তু তুমি আমার সেবা করনি। বান্দা বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তো সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক। আমি কি করে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারি ? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি জাননি যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিল কিন্তু তুমি তার সেবা করনি! যদি তুমি তার সেবা করতে তাহলে তুমি সেখানে আমাকে পেতে।[৭]

হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ প্লেগ আযাবের আলামত—মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ পাক তা দিয়ে তাঁর বান্দাদের কিছু লোককে বিপদগ্রস্ত করেছেন। সুতরাং কোনও এলাকায় এর প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পেলে তোমরা সেখানে যেও না আর তোমরা কোনও এলাকায় অবস্থানকালে সেখানে প্লেগ দেখা দিলে সেখান থেকে পলায়ন করবে না।[৮]

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো তা হলো—রাসূল (সা) কর্তৃক রোগী সেবার প্রতি গুরুত্বারোপ, রোগী-সেবার ফযীলত বর্ণনা, রোগীর সেবা না করার পারলৌকিক অশুভ পরিণতির ভীতি প্রদর্শন। এই ত্রিবিধ কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা) রোগী-সেবার আদর্শ স্থাপন করেছেন। তবে এবার রাসূল (সা)-এর জীবনের ঘটনা-পরিক্রমা পর্যালোচনা করে দেখা যাক, তিনি নিজে কীভাবে সেবা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর 'উস্ওয়াতুন হাসানা' মধুরতম চরিত্র কী ছিল– যা কিয়ামতাবধি সর্বকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য অনুকরণীয়।

রাসূল (সা)-এর রোগী-সেবা

রাসূল (সা) যেভাবে অন্যদের রোগী সেবার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন তেমনি তিনি নিজেও রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। মুসলিম-অমুসলিম, ধনী-দরিদ্র, বন্ধু-শত্রু, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্ব শ্রেণীর আর্তের সেবায় দরদী চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। আর্ত সেবায় তাঁর অনুসৃত নীতিতে তাঁর 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' গুণেরই ব্যঞ্জনা ঘটেছে। পরম শত্রুরও অসুস্থাবস্থায় তিনি তার শুশ্রূষা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

হযরত আনাস (রা) নবী করীম (সা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি অসুস্থের সেবা শুশ্রূষা করতেন।.....[৯]

হযরত জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তখন নবী করীম (সা) ও আবূ বক্র (রা) পায়ে হেঁটে আমার সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য আমার নিকট এলেন। তাঁরা আমাকে সংজ্ঞা বিলুপ্ত অবস্থায় পেলেন। তখন নবী (সা) ওযূ করলেন। তারপর তিনি তার অবশিষ্ট পানি আমার গায়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখলাম নবী (সা) উপস্থিত। আমি নবী (সা)-কে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা), আমার

সম্পদের ব্যাপারে আমি কি করবো ? তিনি তখন আমাকে কোনও উত্তর দেননি। অবশেষে মীরাসের আয়াত নাযিল হলো।[১০]

হযরত আয়েশা বিনতে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর পিতা সা'দ (রা) বলেছেন ঃ আমি মক্কায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ি। নবী করীম (সা) আমার সেবা-শুশ্রূষার জন্য আমার কাছে এলেন।

হযরত যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চোখের পীড়ার জন্য রাসূল (সা) আমাকে দেখতে এলেন।[১২]

হযরত উসামা ইব্ন যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী-তনয়া হযরত যায়নাব (রা) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে সংবাদ পাঠালেন— আমার শিশু কন্যার মৃত্যু আসন্ন। এ জন্য আপনি আমাদের এখানে একবার আসুন।' উসামা সা'দ ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা) তখন রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলেন। হুযুর (সা) তাঁর নিকট সালাম পাঠালেন এবং বলে দিলেন, আল্লাহ তা'আলার মর্জি তিনি যা চান নিয়ে নেন এবং যা চান দিয়ে যান। তাঁর কাছে সব কিছুরই একটা সুনির্দিষ্ট সময়সূচি আছে। সুতরাং সওয়াবের প্রত্যাশা এবং সবর করা উচিত।' এরপর আবারও তিনি কসম দিয়ে নবী করীম (সা)-এর নিকট একজন লোক পাঠালেন। তখন নবী কারীম (সা) উঠলেন, আমরাও উঠলাম এবং যায়নাব (রা)-এর বাড়ি গেলাম। (সেই মরণাপন্ন) শিশুটিকে রাসূল (সা)-এর কোলে তুলে দেয়া হল। তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হচ্ছিল। নবী করীম (সা)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো। হযরত সা'দ আরয করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সা), এটা কি ? রাসূল (সা) উত্তর দিলেন, এটা রহমত। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন তার অন্তরে এই দয়া, রহমত স্থাপন করেন।[১৩]

রোগীর সাথে বা তার সামনে তার রোগের জটিলতা বা মারাত্মকতার ব্যাপারে আলোচনা করলে তাতে সে চিন্তান্বিত হয়। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। মানসিক বিপর্যস্ততার কারণে সে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। এজন্য রোগীর সাথে বা তার সামনে তার রোগের জটিলতা, মারাত্মকতা নিয়ে আলোচনা অনুচিত বরং তাকে অভয় দেয়া ও তার মনে সাহস যোগানো বাঞ্ছনীয়। রাসূল (সা) রোগীকে অভয় দিতেন। তার সামনে তার রোগকে হালকা করে আলোচনা করতেন। উম্মতকেও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন— রোগীর সামনে ভাল কথা বলতে। তাকে দীর্ঘায়ুর আশ্বাস দিতে। তার মনে সাহস যোগাতে। এতে রোগী মানসিকভাবে সুস্থ থাকে।

হযরত আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেন, তোমরা যখন কোনও রোগীর সেবা করতে যাবে তখন তাকে তার জীবনের ব্যাপারে শংকামুক্ত করো। কারণ এটা তার (তকদীরের) কোনও কিছুকে দূর করতে পারবে না। তবে এতে তার মন খুশী হবে।[১৪]

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) তাঁর অনবদ্য হাদীস ভাষ্যগ্রন্থ লুমআ'তে লিখেছেন, 'তোমরা তাকে তার জীবনের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত কর' বাক্যের মর্মকথা হল—তোমরা তার দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করো। তাকে অভয় দাও। আনন্দিত করো। তাকে বলো, চিন্তা করবেন না, আপনার রোগ কোনও জটিল নয়। ইনশাআল্লাহ আপনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন।' এতে সে আনন্দিত হবে। তার চিন্তা দূর হবে। তার অসুস্থতাও তার কাছে হালকা মনে হবে। ফলে সে মানসিকভাবে সুস্থ থাকবে।[১৫]

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) জনৈক বেদুঈনের সেবা করতে যান। নবী করীম (সা)-এর নিয়ম ছিল তিন যখন কোনও রাগীকে দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন, কোন অসুবিধা নেই। ইনশাআল্লাহ গুনাহসমূহ থেকে পবিত্রতা লাভ হবে।' তখন বেদুঈন বলল, আপনি কি বলছেন যে এটা গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে! কখনো নয় বরং এটা এমন এক জ্বর যা এক অতি বৃদ্ধকে উত্তপ্ত করছে। যা তাকে কবরস্থান দেখিয়ে ছাড়বে। রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ তাহলে তাই।[১৬]

রাসূল (সা) কোনও রোগীকে দেখতে গেলে বা তার কাছে কোনও রোগীকে নিয়ে আসা হলে তিনি তার মাথায় বা আক্রান্ত স্থানে হাত বুলাতেন। দোয়া করতেন। কোন সময় চিকিৎসাস্বরূপ ওযু করে ওযুর পানি বা অবশিষ্ট পানি অসুস্থের শরীরে ছিটিয়ে দিতেন। উম্মতকেও তিনি অসুস্থের সেবা করতে গেলে বিশেষ দোয়া করতে শিখিয়েছেন।

হযরত সা'দ (রা) বলেন, ---- অতঃপর রাসূল (সা) আমার কপালে তাঁর হাত রাখলেন। তারপর আমার মুখে ও পেটে হাত বুলালেন এবং দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! সা'দকে আরোগ্য দান কর এবং তার হিজরতকে পূর্ণতা দান কর।[১৭]

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) যখন কোনও রোগীর নিকট যেতেন অথবা কোনও রোগীকে তাঁর নিকট আনা হতো তখন তিনি বলতেন– (দোয়া করতেন) "হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর কর। আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তুমি ছাড়া আর কোনও আরোগ্যদানকারী নেই। এমন আরোগ্য দাও যা কোনও রোগ বাদ না দেয়।"

রোগীর কাছে শোরগোল করলে তার কষ্ট হয়। কোন কোন সময় বেশি সময় রোগীর কাছে বসলে তাতেও সে বিরক্তি বোধ করে। এসব কারণে রাসূল (সা) রোগীর কাছে শোরগোল করাকে অপছন্দ করেছেন এবং নিষ্প্রয়োজনে তার কাছে বেশি সময় বসতেও নিষেধ করেছেন।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রোগীর নিকট কম সময় বসা এবং শোরগোল কম করা সুন্নত।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ (উত্তম) রোগী সেবা হলো দু'বার উটনী দোহনের মাধ্যবর্তী বিরতি পরিমাণ সময় (তার কাছে বসা)। সায়িদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম রোগী সেবা হলো খুব তাড়াতাড়ি তার কাছ থেকে উঠে যাওয়া।

উটনীকে একবার দুধ দোহনের পর কিছু সময় বিরতি দেয়া হয়। যেন তার বাচ্চা দুধ পান করে এবং তার স্তনে আবার দুধ নামে অতঃপর আবার দোহানো হয়। এই দু'বার দোহানোর মধ্যবর্তী বিরতি অতি সামান্য। সুতরাং হাদীসের মর্মকথা হচ্ছে— উত্তম রোগী সেবা হলো রোগীর নিকট অল্প সময় বসা।

রাসূল (সা) নিজেও কোন কোন সময় রোগীকে ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং তিনি অন্যদেরকেও রোগীকে ঝাড়ফুঁক করতে উৎসাহিত করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) এই দোয়া দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন—মানুষের প্রতিপালক, বিপদ সংকট দূর করুন। আপনার হাতেই রয়েছে উপশম। আপনি ব্যতীত আর কোনও (বিপদ) বিদূরণকারী নেই।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা)-এর নিয়ম ছিল---কেউ তার দেহের কোনও অঙ্গে অসুস্থতা বোধ করলে কিংবা তাতে কোন ফোঁড়া বা জখম হলে রাসূল (সা) তাঁর আঙুল দিয়ে এভাবে করতেন– (একথা বলে 'এভাবে করার' রূপ বোঝানোর নিমিত্ত হাদীস বর্ণনাকারী) সুফিয়ান (র) তার বৃদ্ধাঙ্গুলি মাটিতে রাখলেন, এরপর তা তুলে নিতেন এবং তখন এ দোয়া পড়তেন ঃ "আল্লাহর নামে আমাদের যমীনের ধূলাবালি আমাদের কারো লালার সাথে (মিলিয়ে) আমাদের প্রতিপালকের হুকুমে তা দিয়ে আমাদের রোগীর আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে (মালিশ করছি)।"

অসুস্থ ব্যক্তি যদি বিশেষ কোনও কিছু খেতে চায় তাহলে শুশ্রূষাকারীদের জন্য উচিত সে খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাকে তা আহার করানো। রাসূল (সা) কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তুমি কি কোনও কিছু খেতে চাও ? যদি রোগী কোনও কিছু খাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করত তাহলে তার জন্য সে খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন। নিম্নবর্ণিত হাদীসটি দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা) জনৈক রোগীকে দেখতে গেলেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি কিছু খেতে চাও ? রোগী উত্তর দিল, যবের রুটি। রাসূল (সা) বললেন– যার কাছে যবের রুটি আছে সে যেন তার এই (মুসলমান) ভাইয়ের কাছে তা পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর বললেন, যখন তোমাদের

কোনও রোগী কোনও কিছু খেতে চায় তাহলে (তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন) তাকে তা আহার করায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে- রাসূল (সা) অমুসলিমদেরও সেবা-শুশ্রূষা করতেন। যেহেতু তিনি ছিলেন 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' 'সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ' তাই তার রোগী সেবা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মানুষের দুঃখ-দুর্দশায়, অসুস্থতায় অন্য মানুষের মানবতাবোধ জাগ্রত হবে। অন্যের সেবায় নিবেদিত হবে। ধর্মের পরিচয়ে নয়, মানুষের পরিচয়ে। এই শিক্ষাই পাই রাসূল (সা)-এর অমুসলিম রোগী-সেবা থেকে। এখানে রাসূল (সা)-এর অমুসলিম পীড়িত সেবার দু'টি ঘটনা আলোচনা করা হল।

হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত। আবূ তালিব মৃত্যুর সময় রাসূল (সা) তার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি আবূ জাহল, আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়্যাহ ইব্ন মুগীরাকে দেখতে পেলেন। রাসূল (সা) বললেন ঃ হে চাচা! আপনি কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। আল্লাহর নিকট আপনার জন্য এ সাক্ষ্য দেব।.....

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইয়াহুদী ছেলে নবী করীম (সা)-এর খিদমত করত। ছেলেটি অসুস্থ হলো। নবী করীম (সা) তাকে দেখতে এলেন। এরপর বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করো। সে ইসলাম গ্রহণ করল।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে।

হযরত ইবনুল মুসায়্যা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবূ তালিব মৃত্যুমুখে পতিত হলে নবী করীম তার কাছে যান।

উপসংহার

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীবনে একে অপরের মুখাপেক্ষী। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষের সমাজবদ্ধ জীবন সুখ-সুন্দর হয়ে ওঠে। রাসূল (সা) এই সামাজিক জীবনের অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন। যখন কোন মানুষ রুগ্ন হয় তখন স্বভাবতই অন্যরা তাকে সেবা-শুশ্রূষা করার প্রয়োজন হয়। কোনও সমাজের অসুস্থদের যদি অন্যরা সেবা-শুশ্রূষা না করে তাহলে তার জীবন বিষিয়ে উঠবে। রাসূল (সা) এ ক্ষেত্রে যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তা বিরল। তিনি অসুস্থের সেবাকে একজন মু'মিনের ঈমানী দায়িত্ব স্থির করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি কোনও বিতর্কের অবকাশ রাখেননি বরং সমাজের প্রত্যেক সদস্যই অপরের কাছ থেকে এ হক্ব পাবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সেবায় এগিয়ে আসবে। আক্ষেপের বিষয় হলো রাসূল (সা)-এর এ মহান আদর্শ থেকে আজ আমরা দূরে, বহু দূরে। আমরা যদি রাসূল (সা)-এর আদর্শকে

আবারও নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হই তাহলে আমাদের জীবন হবে সুন্দর, সুখের ও শান্তিময়।

১. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, দেওবন্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬।
মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, দেওবন্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬।
২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৩।
৩. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল, সহীহ বুখারী, দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৩-৪৪।
৪. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১।
মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, জামি তিরমিযি, দেওবন্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১।
৫. মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা, জামি তিরমিযি, দেওবন্দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১।
সুলাইমান ইব্ন আশআ'স, সুনানে আবূ দাউদ, দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১।
৬. সুলাইমান ইব্ন আশআ'স, সুনানে আবূ দাউদ, দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১-৪২।
৭. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮।
৮. মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, সহীহ মুসলিম, দেওবন্দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮।
৯. ওলী উদ্দীন খাতীব তাবরিযী, মিশকতা, দেওবন্দ, ১ম পৃ.।

অগ্রপথিক। মে ২০০৩

ধূমপান আত্মহত্যার শামিল

এম. আবদুর রব

সারা বিশ্বে ধনী-দরিদ্র, নর-নারী, যুবক-বৃদ্ধ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছাত্র-শিক্ষক, মালিক-চাকর, সাহেব-পিওন, কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী সর্বস্তরের কোটি কোটি মানুষ তামাকের গুঁড়োর মাধ্যমে নেশা করে থাকে। আর এই তামাকের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী হয় বিড়ি সিগারেট, চুরুট, হুক্কার মশল্লা, পানবিলাসীদের জন্য জর্দা-সাদা, দাঁতের ব্যবহারের গুল আর নাকে নেয়ার নস্যি। ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করার নিমিত্ত এতে সুগন্ধী মেশানো হয়।

তামাকের মধ্যে লুকিয়ে আছে জীবন-নাশক মারাত্মক ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যালস — যা এর ব্যবহারকারীকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। একজন ধূমপায়ীকে ধুকে ধুকে এর চরম মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

তামাকে রয়েছে নিকোটিন, কার্বন মনোঅক্সাইড, কারসিনোজেনসহ অন্যান্য বিষাক্ত কেমিক্যালস। নিকোটিন নামক মারাত্মক বিষের একটি অংশের নাম নাইট্রোসাসিন। আর এই নাইট্রোসাসিন ক্যান্সার তৈরীর মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ধূমপানের ফলে নিম্নোক্ত মারাত্মক ও যন্ত্রণাদায়ক রোগসমূহ হয়ে থাকে ঃ

১. ক্যান্সার ২. যক্ষ্মা ৩. গ্যাস্ট্রিক ৪. আলসার ৫. ফুসফুসের প্রদাহ ৬. হাই ব্লাড প্রেসার ৭. হৃদ্‌রোগ ৮. কাশি-হাঁপানি ৯. কোষ্ঠ-কাঠিন্য ইত্যাদি।

এছাড়া তামাকের নিকোটিন এবং কার্বন মনোঅক্সাইড মানুষের যৌনক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়। ধূমপায়ী যে শুধু নিজেরেই ক্ষতি করছে তাই নয়, সে তার সন্তান এবং যারা তার সাথে চলা ফেরা করে তাদেরও ক্ষতি করছে।

যে জিনিস মানুষের জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য নয় বা মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে নয় বরং বেঁচে থাকার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তবুও সে জিনিসের দিকে মানুষ কিভাবে আকৃষ্ট হয়। প্রথমে দেখাদেখি, বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে সখের বশে অথবা ফ্যাশন হিসেবে তা গ্রহণ করা হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই এটা নিয়মিত নেশায় পরিণত হয়। ধূমপানের এই নেশা সাধারণত কিশোর বয়সেই হয়ে যায়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধূমপান

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের মধ্যে অন্যতম। জনগণের বাৎসরিক গড় মাথাপিছু আয় ১৪০ ডলার বা সাড়ে চার হাজার টাকা। গড় আয় সাড়ে চার হাজার টাকা হলেও শতকরা ৮০ ভাগ লোকের আয় এর অনেক নিচে অর্থাৎ ৮০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবন ধারণ করে থাকেন এবং এরা প্রায় সবাই অপুষ্টির শিকার। এক জরীপে দেখা গেছে শহরাঞ্চল অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে এবং ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের মধ্যে ধূমপানের হার বেশি। দেখা গেছে তিন বেলা পেট ভরে খেতে না পারলেও হুক্কা অথবা বিড়ি ঠিকই খেয়ে যাচ্ছে। গ্রামের ধনী-দরিদ্র উভয় শ্রেণীর প্রায় সব মহিলাই তামাক পাতা দিয়ে পান খেয়ে থাকে। কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় সবাই হুক্কা অথবা বিড়ি পান করে থাকে। হুক্কার মাধ্যমে ধূমপানের পরিমাণ কমে এখন বিড়ির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষি শ্রমিকরা পিতা-পুত্র একখানে বসেই ধূমপান করে থাকে। কৃষক পরিবারের পুত্র অতি অল্প বয়সেই ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কারণ, কৃষক পিতা যখন হাল চাষ করে বা জমিতে অন্য কোনো কাজ করে তখন ছেলে তার বয়স যতো কমই হোক পিতাকে হুক্কা ধরিয়ে দেয় এবং এই কাজটা পুত্র পিতার নির্দেশেই করে থাকে। এভাবে অতি অল্প বয়সে কৃষক পরিবারের লোকজনও ধূমপানে আসক্ত হয়ে যায়। এছাড়া কৃষকদের রোদে পুড়ে এবং বৃষ্টিতে ভিজে জমিতে কাজ করতে হয়। তখন সে হুক্কার মাধ্যমে ধূমপান করে একটু জিরিয়ে নেয় এবং নেশা শেষে পুনরায় কাজে উদ্যমী হয়। কৃষক পরিবারে ধূমপান করা অপরিহার্য বলে ধরে নেয়। কৃষি শ্রমিকরা ভাতের চেয়ে ধূমপান করাটাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে ধূমপানের পরিমাণ কৃষি শ্রমিকদের মতো এতো সর্বজনীন না হলেও অধিকাংশ শ্রমিক ধূমপান করে থাকে। এরা আবার হুক্কা-বিড়ির মাধ্যমে ধূমপান করতে চায় না, সিগারেটের প্রতি তাদের ঝোঁক বেশি। রিক্সাওয়ালা, ঠেলাগাড়ীওয়ালা, ইঁটভাঙা-শ্রমিক এরা প্রায় সবাই বিড়ির মাধ্যমে ধূমপান করে থাকে। ড্রাইভার, কন্ডাক্টর সকল পরিবহণ শ্রমিক ধূমপান করে সিগারেটের মাধ্যমে। এদের সিগারেটের ব্রান্ড আবার উন্নত মানের। অনেক সময় সিগারেট ধরাতে গিয়ে বা টানতে গিয়ে ড্রাইভাররা এক্সিডেন্টও করে বসে। শিক্ষকদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ শিক্ষক ধূমপান করেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সিগারেটের মাধ্যমে আর মাদ্রাসা শিক্ষকরা পানের সাথে জর্দা অথবা তামাক পাতা খেয়ে থাকেন। লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদদের অবস্থাও অনুরূপ। ছাত্রদের মধ্যে নিচের ক্লাসের চেয়ে উপরের ক্লাসের ছাত্রদের ধূমপানের হার বেশি অর্থাৎ উপরের দিক যত ওঠে ততই এতে অভ্যস্ত হতে থাকে। চাকরিজীবীদের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর মাঝে এই হারটা তুলনামূলকভাবে বেশি। এরা প্রায় শতকরা ৮০/৮৫

ভাগ ধূমপান করে থাকে। আর উচ্চ শ্রেণী চাকরিজীবীদের মধ্যে এ হার ৭০ ভাগ। ব্যবসায়ী শ্রেণীদের প্রায় নব্বই ভাগ ধূমপানে অভ্যস্ত।

সর্বশ্রেণীর ধূমপায়ীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, তারা গড়ে তাদের আয়ের $\frac{১}{৪}$ ভাগ ব্যয় করে তামাক সেবনের পেছনে। আর এই অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর দ্রব্যটি সেবন করতে গিয়ে বঞ্চিত রাখতে হয় নিজেকে এবং নিজের ছেলে-মেয়েদেরকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার মতো জীবন ধারণের জন্য মৌলিক চাহিদা থেকে। উপরের এই আলোচনায় অনুমান করা যেতে পারে যে, ধূমপানের ব্যাপকতা এই দরিদ্র দেশে কতো বেশি এবং এর জন্য জাতীয় আয়ের কতো অংশ ব্যয় হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই ব্যাপক ব্যবহৃত দ্রব্যটি কত মানুষের জীবন কেড়ে নিচ্ছে অকালে বিভিন্ন যন্ত্রণাদায়ক রোগ সৃষ্টির মাধ্যমে।

গোটা বিশ্ব ধূমপানের এই ব্যাপকতায় এখন আতঙ্কগ্রস্ত। সরকারী বেসরকারী উভয় পর্যায়ে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজকল্যাণমূলক সংস্থাসমূহ ধূমপানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তিতে নেতৃত্বদানকারী ধনী দেশ আমেরিকায় কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮ বছরের নিচে কারো কাছে সিগারেট বা তামাক বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধূমপানকে সরকারীভাবে নিরুৎসাহিত করার পর ধূমপানের হার কমে গেছে।

		১৯৬০	১৯৮৫
ক.	পুরুষ–	৫৩%	৩৩%
খ.	মহিলা–	৩৪%	২৮%

সম্প্রতি সে দেশের সরকার ৭৫০০ সরকারী ভবনে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কর্মচারী সমিতিগুলো সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সেনা ছাউনিগুলোতে ধূমপান নিষিদ্ধ করা যায় কি না সে ব্যাপারেও আমেরিকা সরকার চিন্তা-ভাবনা করছে বলে খবর বেরিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান সরকারও অনুরূপভাবে সরকারী ভবনে ধূমপান নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এভাবে বিভিন্ন দেশ ধূমপান নিরোধের জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে ধূমপানের হার বিশেষ করে গ্রামঞ্চলে ব্যাপক হলেও তা প্রতিরোধ করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে পূর্বে তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সম্প্রতি সরকার অবশ্য রেডিও টেলিভিশনে বিড়ি, সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করে দিয়েছে। বিড়ি, সিগারেটের বিজ্ঞাপন বন্ধ করলে কি হবে, টেলিভিশনের প্রায় প্রতিটি নাটকের নায়ককে দিয়ে অথবা নাটকের মূল চরিত্রের ব্যক্তিকে দিয়ে সিগারেট পান করিয়ে ছাড়ছে। সিনেমাতেও একই অবস্থা, নায়ককে দিয়ে ধূমপান অথবা মদ পান করানো হয় না এমন নায়ক কোনও চলচ্চিত্রেই

পাওয়া যাবে না। এছাড়া সিনেমা হলগুলোতেও সিনেমা শুরু করার আগে বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের বিড়ি সিগারেটের বিজ্ঞাপনও প্রচার করা হয়ে থাকে। স্টার বাংলাদেশের একটি বহুল প্রচারিত ব্রাণ্ড এবং প্রচারের দিক থেকেও এই ব্রাণ্ডটি বাজিমাত করেছে। ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন শহরের রাস্তার মোড়গুলোতে বিশাল সাইনবোর্ড টানিয়ে এক যুবকের চোখে মুখে অসীম তৃপ্তির দৃশ্য দেখিয়ে তাকে দিয়ে বলানো হচ্ছে, 'স্টার কেন খাই, পয়লা নম্বর তৃপ্তি পাই'। এমনিভাবে শ্রমিক, রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে বিড়ি সিগারেট পান করিয়ে তাদেরকে দিয়ে তৃপ্তি পাওয়ার দৃশ্যযুক্ত বিজ্ঞাপন প্রচার করা হতো পত্র-পত্রিকাসহ সাইনবোর্ড ও সিনেমা হলে। অথচ উন্নত বিশ্বে সিগারেটের প্যাকেটে মাতৃভাষায় লিখে দিতে হয় সিগারেট পানের কুফল সম্পর্কে। এমনকি ভারত, পাকিস্তানেও সিগারেটের প্যাকেটে লিখে দিতে হয় "স্মোকিং ইজ ডেঞ্জারাস টু হেলথ"। আর বাংলাদেশে প্রচার করা হয় ধূমপানের তৃপ্তি সম্পর্কে। সরকারী বা বেসরকারী পর্যায়ে ধূমপানের কুফল সম্পর্কে কোনো প্রচার করা হচ্ছে না বা বিড়ি, সিগারেটের প্যাকেটে কেন এই সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে না তা আমাদের বোধগম্য নয়। বাংলাদেশ টোব্যাকো কোম্পানি (বিটিসি) দেশে এককভাবে এই ব্যবসা করে যাচ্ছে। এই ব্যবসায় এরা অন্য কাউকে ঢুকতে দেয় না। অনেকে অভিযোগ তুলেছেন এই কোম্পানির স্বার্থরক্ষার্থেই সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে ধূমপানের সতর্কবাণী লেখা হচ্ছে না। এছাড়া অনেকে এ ধরনের অভিযোগও করছেন যে, দেশের অধিকাংশ কর্তা-ব্যক্তিরাই তো ধূমপান করে থাকেন। সুতরাং তারা কিভাবে ধূমপানের বিরুদ্ধে আইন করবেন! তবে আমার কথা এই যে, কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই ব্যাপারে কিছুটা এগিয়ে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক ছাত্র "ফুলের সৌরভ নিন, ধূমপান ছেড়ে দিন" নামক একটি সংস্থা গঠন করেছে। কিছু দিন আগে খুলনা শহরে ধূমপানের বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং হয়েছে। আমাদের দেশে জনগণ আলেম-ওলামা ও ডাক্তারদের কথা শোনে। তারা যা বলেন জনগণ তা বিশ্বাস করেন ও তা মেনে চলতে চেষ্টা করেন। ওষুধ নেয়ার পর ডাক্তারদের জিজ্ঞেসও করে থাকেন কোনো পথ্য বাদ আছে কি না ? তাই ডাক্তারগণ যদি প্রেসক্রিপশনটা রোগীর হাতে তুলে দিয়ে বলে দেন যে, "ধূমপান করবেন না", তা হলে এই কথাটি ধূমপান প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারে। এছাড়া আলেম ওলামারা ওয়াজ মাহফিলে ধূমপানের বিরুদ্ধে ওয়াজ-নসিহত করতে পারেন। আমার জানামতে বরিশালের চরমোনাইর মরহুম পীর মাওলানা ইসহাক সাহেব ওয়াজ করে আমাদের গ্রামের অনেক কৃষককে ধূমপান বন্ধ করিয়েছেন। ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা শাহ্ সূফী আবূ বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ধূমপানের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়ে যান। এ সম্পর্কে ফতোয়াও প্রকাশিত হয়।

তাঁর নির্দেশে শর্ষিনা থেকে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং বলা হয় ধূমপান মকরুহ্ তাহরিমী। ফুরফুরা সিলসিলাভুক্ত সকলেই ধূমপানের বিরুদ্ধে এখনও সোচ্চার। এই জন্য চিকিৎসা পেশায় যারা জড়িত তাদের এগিয়ে আসতে হবে এবং এই মাতৃভাষায় পুঁথিপুস্তক লিখে তা প্রচার করতে হবে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকেও এই ধরনের বই বের করা যেতে পারে। পত্র-পত্রিকাগুলো ধূমপানের বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করে দিয়েও এই জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। সিগারেট ও তামাক আমদানি বন্ধ করে দিয়ে এবং স্থানীয়ভাবে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করে বা তামাক চাষের উপর আরো উচ্চহারে কর বসিয়ে দিয়ে এবং তামাক চাষের জন্য ঋণ বন্ধ করে দিয়ে সরকার ধূমপানের হার কমাতে পারেন। তাহলে তামাক চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ কমে যাবে এবং এতে দু'টি লাভ হবে—প্রথমত, ধূমপানের হার কমে এলে রোগ-ব্যাধির পরিমাণও কমে আসবে। দ্বিতীয়ত, তামাক চাষের আওতাভুক্ত জমিগুলোতে গম অথবা আলুর চাষ হবে। তাছাড়া খাদ্য-ঘাটতির পরিমাণ কমে আসবে। পুষ্টিহীনতা লাঘব হবে। এছাড়া নতুনভাবে বিড়ি তৈরির লাইসেন্স প্রদান না করে, সিগারেট ফ্যাক্টরী স্থাপনের অনুমোদন না দিয়ে সরকার ধূমপান প্রতিহত করতে পারেন। যেহেতু বর্তমানে আইন করে ধূমপান বন্ধ করা সম্ভব নয় সেহেতু উপরোক্ত উপায়ে সরকার এর ব্যাপকতা কমাতে পারেন এবং সাথে সাথে স্বেচ্ছাসেবী, সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা, যুব সংগঠন, এমনকি রাজনৈতিক দলসমূহও এই ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করতে পারেন যাতে অচিরেই আইন প্রয়োগ করে তা বন্ধ করা যায়।

অগ্রপথিক। মার্চ ১৯৮৭

[সম্প্রতি সরকার ধূমপান-বিরোধী আইন কার্যকর করতে সচেষ্ট হয়েছে। জনগুরুত্ব স্থানে যেমন ধূমপান নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি রেডিও টেলিভিশনসহ সর্বক্ষেত্রে ধূমপানের বিজ্ঞাপন দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকারের এই কল্যাণমুখী পদক্ষেপ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।]

প্রতিকারমূলক চিকিৎসায় ইসলামী অনুশাসন

ডা. কে. এম. আবদুল আজিজ

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থা বাতলে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি দুনিয়ার মানুষের জন্য প্রতিকারমূলক চিকিৎসারও গোড়াপত্তন করে গেছেন দেড় হাজার বছর পূর্বে। যেগুলি নবীর অনুসারীরা সুন্নত হিসেবে পালন করছে এবং তাদের দেখাদেখি অন্য মানুষেরাও সেগুলি অনুশীলন করে উপকার পাচ্ছেন। নিম্নে এর সামান্য কয়টি উদাহরণ পেশ করা হল।

১. **চিকিৎসায় নবী করীম (সা)-এর সুন্নত**

(ক) হাফেয ইবনে কাইয়্যিম (র) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যাদুল মাআদে হযরত বিলাল ইবনে সাইয়্যাফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, "একদা নবী করীম (সা) এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্য রোগীর বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলে তিনি রোগীর নিকট উপস্থিত ব্যক্তিদের বললেন—ডাক্তার ডেকে আনো। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের একজন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনিও এরূপ বলছেন ? হুযুর (সা) বললেন, হ্যাঁ, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন কোনও রোগ সৃষ্টি করেন নাই যার ঔষধ পাঠান নাই।" রোগ হলে ডাক্তারের কাছ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া, ঔষধ ব্যবহার করা আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় বরং সুন্নত। রোগমুক্তি ঔষধের নিজস্ব গুণ বা বৈশিষ্ট্য নয় বরং আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য যা তার মর্জিয়তের উপর কাজ ক'রে রোগমুক্তি ঘটায়। অন্যথায় ঔষধের কাজ তো দূরের কথা, ডাক্তারের ঔষধ নির্বাচনেরই ক্ষমতা থাকে না। এ প্রসঙ্গে একজন বুজুর্গ লোকের উক্তি স্মরণ করা যায়, "যখন মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন অভিজ্ঞ ডাক্তার পর্যন্ত বোকা হয়ে যায়।"

(খ) রোগীর মনকে আশ্বস্ত করা (Assurance) ঃ আধুনিক চিকিৎসার একটি অঙ্গ হল রোগীকে মানসিকভাবে স্থিতিশীল করা। সেটা করতে হবে কিভাবে, তাও নবীর জীবন থেকে আমরা জানতে পারি। এ কাজে রোগীর প্রতি আচরণ, রোগী দেখার বিশেষ পদ্ধতি, রোগীর কাছে অবস্থান, রোগীকে সান্ত্বনা দান ইত্যাদি।

রোগীর প্রতি আচরণ ঃ রাসূল (সা) হযরত আবূ সায়্যিদ খুদরী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তুমি যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির কাছে যাবে তখন তাঁর দীর্ঘ জীবন (হায়াত) সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করবে। এটা অবশ্য তকদীরকে রদ করতে পারবে না। তবে এতে রোগীর মন অবশ্যই খুশি হবে" (ইবনে মাজাহ)। হুযূর (সা)-এর অভ্যাস ছিল তিনি যখন কোন রোগী দেখতে যেতেন তখন তাকে বলতেন ঃ "চিন্তার কোন কারণ নেই, ইনশাআল্লাহ্ সুস্থ হয়ে যাবে।" (বুখারী শরীফ) অন্যত্র হুযুর (সা) বলেন, "তোমরা যখন কোন রুগ্ন ব্যক্তির নিকট যাবে তখন তাঁর সাথে ভাল ভাল কথা বলবে।"

রোগী দেখার পদ্ধতি ঃ হযরত আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন যে, "রোগী দেখার উত্তম নিয়ম হল এই যে তুমি রোগীর কপাল বা তাঁর হাতে হাত রাখবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবে, আপনি কেমন আছেন ?" (তিরমিযী শরীফ) অনুরূপ হযরত ইবনুছ (র) বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতে বলেন, "রোগী দেখার নিয়ম হল যে, তুমি রোগীর শরীরে তোমার হাত রাখবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, আপনার সকালটা কেমন কাটল ? আপনার সন্ধ্যা কেমন কাটল ? (অর্থাৎ আপনি সকালে কেমন ছিলেন এবং সন্ধ্যায় কেমন ছিলেন)" উপরোক্ত দু'টি হাদীস থেকে বোঝা যায় রাসূল (সা) চাইতেন চিকিৎসকরা পরিচিতি পর্বেই রোগীর প্রতি তাঁর দরদী ও সমব্যথী হয়ে রোগীকে উৎফুল্ল এবং রোগ-ব্যাধি হালকা করার ব্যাপারে মনোযোগী হবেন। এ ছাড়াও সহমর্মিতার জন্য হাত বাড়ানো। মাথায় হাতে হাত রাখার মাধ্যমে রোগীর শরীরের তাপমাত্রার খবর নিয়ে তা ডাক্তার সাহেবকে প্রদান করবে।

স্বল্প সময়ে রোগী দেখা ঃ হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (র) বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন, "সওয়াব ও প্রতিদানের দিক থেকে সর্বোত্তম রোগী দেখা হলো রোগীর নিকট স্বল্প সময় অবস্থান করা।" (ফতহুল কবীর) হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন, "কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে তাঁর কাছে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করবে না। রোগীর নিকট দর্শনার্থীর দীর্ঘ সময় অবস্থান করা অপছন্দনীয় কাজ। বাস্তবে দেখা দর্শনার্থীরা অধিক সময় অবস্থান করলে রোগীর পরিজন ও চিকিৎসা কর্মে সহায়ক ব্যক্তিবর্গের অসুবিধা হয়। এ ছাড়াও দর্শনার্থীদের দ্বারা সংক্রামক ব্যাধি ইতিমধ্যেই অসুস্থ মানুষটিকে আরও একটি রোগে (Super infection) জড়িয়ে ফেলতে পারে। তাছাড়া দর্শনার্থীর অসাবধান কথাবার্তায় রোগী যে কোনওভাবে আঘাত পেতে পারে বা সামাজিক হীনমন্যতায় ভুগতে পারে এবং এ মনোপীড়া তার রোগ বৃদ্ধি করতে পারে এবং কষ্ট দীর্ঘায়িত করতে পারে।

রোগীকে সান্ত্বনা ঃ হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) প্রাণপ্রিয় পুত্রের ইনতিকালের পর রাসূল (সা) সমবেদনা জানিয়ে তাকে সান্ত্বনাপত্র দেন। পত্রটি হুবহু উদ্ধৃত করা হল ঃ "আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি অত্যন্ত দয়াশীল এবং বড়ই মেহেরবান। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর পক্ষ হতে মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর প্রতি। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

"আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত কোনও মাবুদ নাই। আল্লাহ্ তোমাকে বড় প্রতিদান (পুরস্কার) দান করুন এবং ধৈর্য ধরার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে এবং তোমাকে শুকরিয়া আদায় করনেওয়ালা করুন। নিশ্চয়ই আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি মহান আল্লাহ্‌র উত্তম দান এবং ধার গ্রহণ করা আমানতস্বরূপ। যার থেকে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফায়দা লুটছি এবং তিনি নির্ধারিত সময়ে আবার তা কাজা করে নিচ্ছেন। তাই আমাদের উপর তাঁর দানের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব এবং তিনি যখন আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন তখনও ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। তোমার পুত্র মহান আল্লাহ্‌র দান এবং তোমার নিকট ধার দেওয়া আমানত ছিল। আল্লাহ্ তাকে তোমার জন্য লোভনীয় এবং সুখ ও উল্লাসের কারণ বানিয়েছিলেন। তিনিই তাকে তোমার থেকে এক বড় প্রতিদানের বদলে নিয়ে নিয়েছেন। এখন তুমি যদি ধৈর্য ধর তবে রহমত, বরকত ও হেদায়েত লাভ করবে। তোমার অধৈর্য যেন তোমার প্রতিদানকে নষ্ট করে তোমাকে লজ্জিত না করে।

"আর খুব স্মরণ রেখ, অধৈর্যের মাধ্যমে কিছুই অর্জিত হয় না এবং আগত পেরেশানীও তাতে দূর হয় না। ধৈর্য ধারণ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই নেককার লোকদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" (বুখারী শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফ)

২. **সংক্রামক ব্যাধি থেকে নিজেকে দূরে রাখা ঃ** "নিজে কোনও সংক্রামক ব্যাধিতে সংক্রমিত হয়ে গেলে অন্যকে সংক্রমিত করে তোলে। তাতে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় কিন্তু তাতে তোমার কোন উপকার হবে না বরং অন্যকে ক্ষতি করার অনধিকার চর্চা করার অন্যায় হবে। প্লেগ এক প্রকার নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক রোগ, যা আবার বনি ইসরাঈল অথবা তোমাদের পূর্ববর্তী কোন সম্প্রদায়ের উপর পাঠানো হয়েছিল। যখন জানতে পারবে যে অমুক জায়গায় প্লেগ রোগ ছড়িয়ে যাচ্ছে তবে সেখানে যাবে না। আর তোমরা যেখানে আছ সেখানে যদি প্লেগ রোগ আসে তবে ঐ স্থান থেকে পলায়ন করা যাবে না।"

(বুখারী ও মুসলিম)

৩. **চিকিৎসাকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তির যোগ্যতা সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ ঃ** নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "যদি এমন কোনও ব্যক্তি চিকিৎসা করে যার চিকিৎসা বিষয়ে কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই, এমতাবস্থায় (যদি রোগীর কোনও ক্ষতি হয়) রোগীর সমস্ত দায়-দায়িত্ব উক্ত চিকিৎসকের উপর বর্তাবে।" (আবূ দাউদ, নাসায়ী ইবনে মাজাহ, দারে কুতনী, মুসতাদরাক) এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, নবী (সা) পরোক্ষভাবে চিকিৎসাকে পেশা হিসাবে এবং পেশাদার ঊর্ধ্বতন পেশাদার দ্বারা প্রশিক্ষিত হবেন এবং পেশার মান নির্ধারিত রাখা হবে।

৪. **ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কিত গুরুত্বারোপ ঃ** হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা রোগ ও দাওয়া (ঔষধ) দুটিই পাঠিয়েছেন। প্রতিটি রোগেরই ঔষধ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর। তবে হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করো না।" (মিশকাত, সুনানে আবূ দাউদ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ঐ জিনিসের মধ্যেও তোমাদের আরোগ্য রাখেন নাই যা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে।" (যাদুল মাআদ, মুসতাদরাক)

৫. **ঔষধ হিসাবে মদ ও অন্যান্য নাপাক দ্রব্য নিষিদ্ধ ঃ** হযরত উম্মে সায়মা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) নেশাযুক্ত এবং মস্তিষ্ক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কোনও কিছু ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ, মিশকাত) অন্য এক হাদীস যা তারেক ইবনে সুরাইদ (রা) বর্ণনা করেন যে, "নবী করীম (সা)-এর কাছে শরাব (মদ) সম্পর্কে প্রশ্ন করলে হুযুর তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বললেন, আমি তো এটা ঔষধ হিসাবে তৈরি করেছি। নবী করীম (সা) বললেন, "শরাব ঔষধ নয় বরং এটা নিজেই রোগের কারণ।" (মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ)

নবী করীম (সা) ঔষধ হিসাবে মদ ব্যবহার করতে শুধু নিষেধই করেন নাই বরং এ কথাও বলেছেন, "যে ব্যক্তি শরাবের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করে আল্লাহতা'আলা তাকে আরোগ্য না করুন।" (ইবনে মাজাহ, যাদুল মা'আদ) হযরত যাবের (রা) বর্ণিত আরও এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন, "যার অধিক পরিমাণে নেশা আনে তার অল্প পরিমাণও হারাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "নবী করীম (সা) খবীশ বা নাপাক ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।" ঐ সকল জিনিস যা বাজে, ক্ষতিকর এবং নষ্ট হওয়ার কারণে খারাপ করেছেন।" ঐ সকল জিনিস যা বাজে, ক্ষতিকর এবং নষ্ট

হওয়ার কারণে খারাপ মনে হয় এবং ঐ সকল জিনিস বা অকেজো, যেমন মদ মিথ্যা এবং অপছন্দনীয় কার্যকলাপও খবীশের অন্তর্ভুক্ত।

উপরোক্ত আলোচনায় এটা প্রতীয়মান হয়েছে মদ নিজেই রোগের কারণ। দেড় হাজার বছর পূর্বে রসূল (সা)-এর সেই তত্ত্ব ভেষজবিদরা গ্রহণ করেছেন এবং যেসব ঔষধ আসক্তি হয় সেগুলি বাতিল হয়েছে, হচ্ছে এবং বাকিটা অদূর ভবিষ্যতে বাতিল হবে বলে ঈমানদার ডাক্তাররা বিশ্বাস করেন।

৬. **শিংগা লাগান ও তার স্থানসমূহ ঃ** (ক) হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের চিকিৎসাসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম চিকিৎসা হ'ল শিংগা লাগান"। (মুসতাদরাক)

(খ) নবী করীম (সা) জিব্রাঈল (আ)-কে এ সংবাদ দিয়েছেন, "মানুষ যে সমস্ত জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করে তন্মধ্যে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে শিংগা লাগান"। (মুসতাদরাক) শিংগা লাগানোর স্থানসমূহ ঃ (১) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) উভয় কাঁধ এবং কাঁধের মাঝে (গ্রীবা বা ঘাড়ের উপর) শিংগা লাগিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) (২) হুযূর (সা) ইহরাম অবস্থায় ব্যথার জন্য মাথা মুবারকে শিংগা লাগিয়েছেন (বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)। (৩) হুযুর (সা) ইহরাম বাঁধা অবস্থায় পায়ের পিঠের (পাছার) উপর শিংগা লাগিয়েছেন (ইবনে খুজাইমা, ইবনে হাব্বান)। (৪) হুযূর (সা) ক্লান্তি বা অবসন্নতার জন্য স্বীয় রান মোবারকে শিংগা লাগিয়েছেন (আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

আমাদের দেশে বংশ পরম্পরায় শিংগা লাগানোর ইতিহাস আছে। এখনও কিছু মানুষের মধ্যে শিংগা লাগানোর প্রচলন রয়েছে। তারা উপকারও পাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন। তবে চীন দেশের আকুপাংচার এবং শিংগা লাগানোতে কতটা পার্থক্য তার আধুনিককালের একটি জিজ্ঞাসা। শিংগা লাগান ও আকুপাংচারের স্থান এবং পদ্ধতি কিন্তু প্রায় একই। যা কিছু পার্থক্য তা হাজার বছরের ব্যবধানের জন্যও হতে পারে। আকুপাংচার পদ্ধতিতে চিকিৎসার স্থান তার প্রসিদ্ধি এবং পদ্ধতিগত উন্নতির জন্য যে দেশ যে জাতি যেভাবে ভেবেছেন ঠিক তেমনিভাবেই গুছিয়ে নিয়েছেন।

৭. **রাসূল (সা)-এর জীবনে সার্জারীর (শৈল্যবিদ্যার) কিছু চিকিৎসা ঃ** প্রিয়নবীর সংগ্রামী জীবনে বহু যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজে আহত হয়েছেন। সংগী সাথীদের এবং নিজের চিকিৎসা নিয়েছেন। তাঁর তাঁবুতে যুদ্ধকালীন সময়ে প্রাথমিক চিকিৎসার একটি ব্যবস্থা থাকত। সেখানে প্রায়ই মহিলা সাহাবীরা দায়িত্ব পালন করে পুরুষ মুজাহিদ (সাহাবী)-দের যুদ্ধক্ষেত্রে

বিজয়ের ঝাণ্ডা ছিনিয়ে আনার কাজে সাহায্য করতেন। এ সম্পর্কে কিছু বিবরণ তুলে ধরছি ঃ (১) হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন যে, ওহুদের যুদ্ধে নবী করীম (সা)-এর কাছ থেকে যখন সাহাবীরা সরে গিয়েছিল তখন আমি দেখলাম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ও উম্মে সুলাইমা (রা) উভয়েই পাজামার পা উঠিয়ে মশক পিঠে বহন করে তৃষ্ণার্তদের পানি পান করাচ্ছেন। পানি শেষ হয়ে গেলে ফিরে যেতেন। আবার পাত্র ভর্তি করে নিয়ে এসে পিপাসার্ত গাজীদের মুখে ঢেলে দিতেন। এতে বোঝা যাচ্ছে, মুজাহিদদের রক্তে পানির সমতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিতকরণে মুসলিম শিবিরে প্রতিষ্ঠিত একটি বিধান ছিল, যা চিকিৎসা শাস্ত্রে এক অনবদ্য পাঠ। সার্জারীর আগে, পরে ও চলাকালীন সময়ে পানির সমতা সংরক্ষণ শৈল্য চিকিৎসকের একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ ছাড়া শৈল্য চিকিৎসার ভার বহন করার মতো কোনও রোগীরই ক্ষমতা নেই।

পেটে পানি আসা (Assites) ঃ রোগে নবীজী অপারেশনের আদেশ করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত ঃ নবী মুহাম্মদ (সা) ইসতেসকা বা সৌর্যরোগগ্রস্ত এক রোগীর চিকিৎসককে হুকুম করলেন, "তার পেটে শেগাফ (অর্থাৎ অপারেশন) কর।" আধুনিক চিকিৎসায় আজও পেটের পানি বের করার জন্য অপারেশন করা হয়– যার নাম প্যারাসেনটাসিস (Peracentasis)।

ফোঁড়ার অপারেশন করার জন্য নবীজীর নির্দেশ ছিল ঃ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, এক রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার জন্য আমি নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। সে ব্যক্তির কোমরে ফোঁড়ার কারণে ফোলা ছিল। লোকেরা বলতে লাগল, এতে পুঁজ হয়েছে। নবী করীম (সা) উক্ত ফোঁড়া শেগাফ (Operation) করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রা) বললেন, আমি তৎসামান্য শেগাফ (Operation) করে ফেললাম। তখনও নবী করীম (সা) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। (যাদুল মাআদ, ২য় খণ্ড)

এতে বোঝা যায়, রাসূল (সা)-এর সার্জারীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং এগুলো করানোর জন্য তার লোকও নির্ধারিত ছিল। যেমন হযরত আলী (রা) তন্মধ্যে একজন। আজকের এই সার্জারীর উন্নতির পেছনে নবী করীম (সা) এবং তাঁর অনুপম চরিত্রের অধিকারী সাহাবীরাও ভূমিকা রেখেছিলেন। নিরপেক্ষ বিচারে অবশ্যই নবীর সাহাবীদের ত্যাগ ও অভিজ্ঞতার সন্ধান পাওয়া যাবে।

৮. **মলম ও ব্যান্ডেজ (পট্টি) ব্যবহারের প্রচলন ঃ** হযরত রবী বিনতে মু'আয (রা) বর্ণনা করেন, "আমরা নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করে

আহতদের পানি পান করাতাম এবং তাদের ক্ষতস্থানে মলম ও পট্টি লাগাতাম এবং শহীদদের মদীনায় নিয়ে যেতাম।" (বুখারী শরীফ, কিতাবুল জিহাদ) এতেও দেখা যায় (১) পানি সমতা সংরক্ষণ। (২) রক্তক্ষরণ বন্ধের এবং ক্ষত-স্থান রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমণ বন্ধের জন্য মলম ও পট্টি (ব্যান্ডেজ) ব্যবহার করতেন এবং লাশবিহীন যুদ্ধক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে যোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা রাখতেন (৩) ওহুদের যুদ্ধে নবী করীম (সা) জখম হলে হযরত ফাতেমা (রা) রাসূল (সা)-কে পট্টি (ব্যান্ডেজ) বেঁধে দিয়েছিলেন। ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ হলো, "আবূ হাখেম (রা)-এর ভাষায় আল্লাহ্‌র রাসূল (সা)-এর মেয়ে হযরত ফাতেমা (রা) হযরত (সা)-এর ক্ষত ধুয়েছিলেন আর হযরত আলী (রা) ক্ষতস্থানে পানি ঢালছিলেন কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। তখন হযরত ফাতেমা (রা) খেজুর পাতার তৈরি মাদুরের এক টুকরা পুড়িয়ে ছাই ক্ষতস্থানে চেপে ধরেন এবং রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।" (বুখারী শরীফ, কিতাবুল মাগাযী) এখানে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে সংক্রমণের প্রতিরোধ করা, পানি ঢেলে সেটাকে গভীর থেকে ময়লা বের করার একটি প্রয়াস এবং ছাই পোড়ানোর উপাদান হিসাবে জীবাণুমুক্ত এবং এর সংস্পর্শে এসে রক্তে থ্রম্বোপাস্টীন তৈরি শুরু হওয়াতে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়।

৯. **লবণ পানিতে এন্টিসেপটিক হিসাবে ব্যবহার ঃ** হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, এক রাত্রে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর হাত মুবারকে মাটি লাগলে এক বিচ্ছু তার পবিত্র হাত দংশন করে। তখন রাসূল (সা) একটু লবণ চেয়ে পানিতে মেশালেন। অতঃপর ঐ লবণমিশ্রিত পানি বিচ্ছুর দংশিত স্থানে ঢালতে লাগলেন। নবীজী এক হাতে পানি ঢালছিলেন। অন্য হাতে ক্ষতস্থান মালিশ করছিলেন এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ছিলেন। (তিরমিযী, বায়হাকী, মিশকাত)

বর্তমান বিশ্বেও ক্ষতস্থানে সেলাইন ওয়াশ (লবণ পানিতে ধোয়া) হয়। এটা অত্যন্ত কার্যকর বিধায় দেড় হাজার বছর ধরে চলছে প্রিয়নবীর এ সুন্নতে পাবন্দ শুধু রোগী হিসাবেই নয়, এমনকি মুসলমান ডাক্তারদেরও চিকিৎসা জীবনে ব্যবহার করতে পারেন। যে কোনও চিকিৎসকের জীবনেই কোন-না-কোন রোগের জন্য সেলাইন ওয়াশ না করে শেষ হওয়ার কথা নয়। আমাদের নবীর সুন্নত কতই না স্বাস্থ্যকর!

১০. **মধু ও পেটের ব্যাধি ঃ** হযরত সায়ীদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হুযুর (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমার ভাইয়ের পেটে ব্যথা অথবা একথা বললেন যে, সে আমাশয়ে ভুগছে। হুযুর (সা) বললেন, "তাকে

মধু পান করিয়ে দাও। সে ব্যক্তি চলে গেল এবং এভাবে অকৃতকার্য হয়ে চতুর্থ-বার এসে বললো যে তার আমাশয় থামছে না। হুযুর (সা) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্যিই বলেছেন, হয়তো তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। 'মধুর সর্বশেষ উপাদান হচ্ছে গ্লুকোজ যা রক্তে শোষণ হওয়ার সময় পানিকেও শোষণ (absorption) করে রক্তে নিয়ে যায়। পেটের পীড়ায় পানির স্বল্পতা রোধই প্রকৃত চিকিৎসা। আজকাল বাংলাদেশের ঘরে-বাইরে সর্বত্রই অনুশীলন হচ্ছে পেটের পীড়ায় খাওয়ার স্যালাইন। এ ছাড়াও মধুর নিজস্ব কোন উপাদান এই রোগে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে! যা আমাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসবে। যেমন রাসূল (সা) মধুর অনেক প্রশংসা করেছেন, "যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন সকাল বেলা মধু চেটে সেবন করবে তার কোন কঠিন রোগ-ব্যাধি হবে না।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, সুনানে ইবনে মাজাহ) আজ আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রমাণিত, মধুর মধ্যে ভিটামিন এ. বি. সি. প্রচুর পরিমাণে আছে। এটা কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) দূরকারী, বাত ব্যাধির ব্যথা উপশমকারী ও দুর্গন্ধ দূরকারী। শরীর ও ফুসফুসকে শক্তিশালী করে, রুচি বৃদ্ধি করে এবং শক্তি-সামর্থ্য স্থায়ী করে। কাশি হাঁপানী ও ঠাণ্ডা রোগের জন্য মধু বিশেষভাবে উপকারী। মুখের পক্ষাঘাত (Facial paralysis) রোগের প্রতিরোধক। মধু রক্ত পরিশোধনকারী এবং মানসিক রোগের জন্যও উপকারী। এটা চক্ষু রোগের ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির মহৌষধ। (মুফরাদাত, খাওয়াসুল আদবিয়্যা)

১. **জ্বরের চিকিৎসায় ঠাণ্ডা পানি ঃ** জ্বর কোনও রোগ নয় তবে বহু রোগেরই তা একটা উপসর্গ। এই উপসর্গকে দূর করতে গিয়ে কোনও ঔষধ প্রয়োগ করা বিষয়ে চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনে আসে না। একটি কৌশলী পরিচর্যায় (Intelligent nursing) যথেষ্ট। অর্থাৎ উচ্চ তাপের শরীরকে নিম্ন তাপের পানি দিয়ে শরীরের অতিরিক্ত তাপ শরীর থেকে বের করে নেওয়া যায়। তাই আধুনিক চিকিৎসকরা জ্বর নিবারণের জন্য শরীরে পানি ঢালা, ভেজানো কাপড় দ্বারা শরীর বার বার মুছে নেওয়া অথবা বরফব্যাগ (Ice bag), জলপট্টি, জলধারা ব্যবহার করে জ্বর নামিয়ে নেন। হয়ত ইতিমধ্যেই জ্বরের কারণ বের হয়ে যায় এবং সে মোতাবেক চিকিৎসা চলতে পারে। রাসূলে পাক (সা) দেড় হাজার বছর পূর্বেই এই পানি দিয়ে জ্বর সারানোর তাগিদ দিয়েছেন। পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য এ সংক্রান্ত হাদীসগুলি পেশ করা হল। (ক) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, জ্বর জাহান্নামের একটি উত্তপ্ত নমুনা বিশেষ। তোমরা ঠাণ্ডা পানির দ্বারা এটাকে দূর কর। (সুনানে ইবনে

মাজাহ) (ক) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যমযমের পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করবে। (খ) হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের অংশবিশেষ। তোমরা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা এটা ঠাণ্ডা কর। (মুসতাদাকে হাকেম, তাবরানী) (গ) হযরত ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত, জ্বর জাহান্নামের তাপ। পানি দ্বারা এটাকে ঠাণ্ডা কর।" (ইবনে মাজাহ, মালেক, আহমাদ, নাসায়ী, হাকেম) প্রায় অনুরূপ আরেকটি হাদীস হযরত আনাস (রা) থেকেও বর্ণিত আছে।

রাসূল (সা)-এর জীবনী পর্যালোচনা করলে শত শত ঘটনা পাওয়া যাবে, যা প্রতিকারমূলক চিকিৎসা হিসাবে তিনি বাতলে দিয়েছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ ব্যবহার করে উপকার পাবে। এটা যুক্তিতর্কে বা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় উপকারী হিসেবে একদিন প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ্। রাসূলে পাক (সা) মেহেদী, মধু, সিনা বা সোনামুখী গাছের পাতা, মুসাব্বর, সুরমা, আগর কাঠ, কুসত, কালোজিরা, দুম্বার চাকি, কুম্বা, যয়তুন (Olive oil), সফর জাল (মিহিদানা), আজওয়া, খেজুর, বরনী খেজুর, আনজির বা বিলাতি ডুমুর প্রভৃতির চিকিৎসাজনিত উপকারিতা বর্ণনা করে প্রতিকারমূলক চিকিৎসা এগিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা এ দ্রব্যাদির রাসূল-বর্ণিত উপকারিতা চেয়েছেন তাঁরাই উপকৃত হয়েছেন। আমাদেরকে আল্লাহ্ রাসূল (সা)-এর বাতলে দেওয়া পথের উপকারিতা উদঘাটন ও আমল করার সুযোগ দিন।

অগ্রপথিক। সেপ্টেম্বর ২০০৩

চক্ষুরোগ ও প্রতিকার

ডা. এম. এ. মান্নান কবীর

মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে চোখ অন্যতম সেরা সম্পদ। কোনও ব্যক্তির অন্য কোনও অঙ্গ না থাকলে তাঁর ভীষণ কষ্ট হবে একথা ঠিক, কিন্তু সে তো সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। যার দুটি চোখ নেই কিংবা চোখে দেখে না তাঁর মতো অসহায় এবং হতভাগ্য ব্যক্তি সম্ভবত আর কেউই এ জগতে নেই। সে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এই সুন্দর বিশাল পৃথিবীর অফুরন্ত নেয়ামতগুলো দেখতে পারছে না। এমনকি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বা আপনজনকেও দেখতে পারছে না। সে কেবল কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গিয়ে একাকার হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হচ্ছে। এ জন্য সুন্দর এবং ভাল চোখ সকল মানুষই কামনা করে। তাই চোখে কোনও খুঁত কিংবা রোগ দেখা দিলে কখনও বসে থাকা উচিত নয়।

যদিও মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, তবু এ ব্যাপারে মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে। চোখ হচ্ছে একটি অত্যন্ত জটিল সেন্স-অরগান বা ইন্দ্রিয়-প্রত্যঙ্গ। আমরা প্রতিদিন যা কিছু দেখি তা প্রথমে পরিবর্তিত হয় একটি 'ইমেজ'। তারপর সেই ইমেজ পরিবর্তিত হয় 'নার্ভ ম্যাসেজ' বা 'স্নায়ুবার্তায়' এবং তারপরে এই স্নায়ুবার্তা মস্তিষ্কে পৌঁছলে মস্তিষ্ক সেই বার্তাকে বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দেয় আমরা কী দেখছি।

চোখের গঠন

মাথার খুলির মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কের পুরোভাগের একটি অংশ থেকে এবং মুখমণ্ডলের অস্থিগুলোর গোলাকার গর্তের মধ্যে দু'টি চক্ষুগোলক (Eye ball) অবস্থিত। আমরা এর কেবল সামনের অংশটুকু দেখতে পাই। চোখের গোলকদু'টি দেখতে ডিম্বাকৃতির মতো। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ১ ইঞ্চি। ভ্রূণের নীচ ও দুপাশ হতে দুটি উপবৃদ্ধি বের হয়ে আসে এবং পরে মোটা হয়, এটাকে বলা হয় অপটিক প্লেট। অপটিক প্লেট নীচ থেকে ছিদ্র করা রবারের বলের মতো ভিতরে প্রবেশ করে, এটাকে বলা হয় প্রাথমিক চক্ষুকোষ থলি। চক্ষুকোষ-থলি সামনের বহিঃস্তকের উপরিতলকে স্পর্শ করে এবং বহিঃস্তকের উপরিতলের কিছু অংশ এর সাথে প্রবেশ করে। ফলে চক্ষুকোষ-থলি অপটিক কাপে পরিণত হয়। এই অপটিক কাপের দুটি স্তর আছে।

একটি ভিতরের এবং অপরটি বাইরের। চক্ষুপটের সম্পূর্ণ স্নায়ু-স্তরগুলো তৈরী হয় ভিতরের স্তর থেকে। বহিঃস্তরের উপরিতলের যে অংশ অপটিক কাপে ঢোকে তা ধীরে ধীরে মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থূল আকার ধারণ করে, এটাকে বলা হয় লেন্সপ্লেট। লেন্সপ্লেটের অনুপ্রবেশে সৃষ্টি হয় লেন্সকোষ-থলি। অপটিক কাপের চতুর্দিক দিয়ে এবং মধ্যস্তক অবস্থান দিয়ে শ্বেতপটল (Sclera), চক্ষুস্বচ্ছের (Cornea) উপঝিল্লি ছাড়া সম্পূর্ণ চক্ষুস্বচ্ছ ও চক্ষুকৃষ্ণ তৈরী হয়। অপটিক কাপের সামনের কিছু অংশ মধ্যস্তকের সাথে মিশে সিলিয়ারী বডি ও কনীনিকা তৈরী হয়। চক্ষুস্বচ্ছের সামনে বহিস্তক ক্রমে উপরে ও নীচে সরে যেতে থাকে। কিছু মধ্যস্তক তার মধ্যে প্রবেশ করে; ফলে চক্ষুপল্লব (Eyelied) তৈরী হয়। বহিঃস্তক থেকে চক্ষুবর্ত্ম (Conjunctive) ও চক্ষুস্বচ্ছের উপঝিল্লী তৈরী হয়। চক্ষুগোলকের বাইরের মাংস মধ্যস্তক থেকে তৈরী। অপটিক কাপের মধ্যের স্তর থেকে কিছু জেলীর মত বস্তু ক্ষারিত হয়ে প্রাথমিক কাচীয় (Primary Vitreous) তৈরী করে এবং দ্বিতীয় কাচীয় (Secondary Vitreous) দ্বারা পরে প্রাথমিক কাচীয় স্থানচ্যুত হয়।

ভ্রূণের কত দিনে চোখের প্রারম্ভকাল, এ ব্যাপারে প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী বলেন, "ভ্রূণের ৬ সপ্তাহ (ভ্রূণ যখন ১৩ মি. মি.) বয়স থেকেই চোখের ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্যায় শুরু হয়। অপটিক কাপ প্রায় ১২ সপ্তাহে (ভ্রূণ যখন ৫০ মি. মি.) তৈরী হয়। আইরিশ ৪ মাসে (ভ্রূণ যখন ৬৫ মি.মি.) তৈরী হতে থাকে।"[১]

চোখের বিভিন্ন রোগ

আমাদের দেশে ১১ প্রকার মারাত্মক চক্ষু রোগের বেশি আক্রমণ ঘটতে দেখা যায়। যেমন (১) গ্লুকোমা (২) মাইওপিয়া (৩) চোখের মণিতে ঘা (৪) অপুষ্টিজনিত কারণে অন্ধত্ব (৫) রেটিনাল ডিটাচমেন্ট (৬) ছানি পড়া (৭) সময়মতো চশমা না নেয়ায় অন্ধত্ব (৮) ট্যারা চোখ পরীক্ষা না করায় অন্ধত্ব (৯) ব্লাডপ্রেসারের কারণে চোখে প্রদাহ (১০) চোখ লাল হওয়া (১১) ডায়বেটিসজনিত কারণে চক্ষুরোগ।

১. গ্লুকোমা

চোখের ভিতরের স্বাভাবিক চাপ অপেক্ষা বেড়ে গিয়ে চক্ষুর পিছনের অপটিক ডিস্কের কাপিং বা চোখের যে কোনও অংশের ক্ষতি করাকে (বিশেষ ক্ষেত্রে দৃষ্টির সীমারেখা পরিবর্তন করে) বলা হয় চোখের উচ্চ চাপ বা গ্লুকোমা (Glaucoma)। আরও ব্যাপকভাবে বলা যায় যে, গাড়ির টায়ার কিংবা ফুটবল বা বেলুন ফুলিয়ে রাখতে যেমন প্রয়োজন হাওয়া, তেমনি চোখকে ফুলিয়ে রাখতে এবং চোখের স্বাভাবিক আকৃতি ও সুষ্ঠু কর্ম সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় অভ্যন্তরীণ চাপ প্রয়োজন। এই চাপ ঠিক রাখার জন্য চোখে এক ধরনের জলীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়ে

থাকে, এটাকে বলা হয় অ্যাকোয়াস। চক্ষুগোলকের অভ্যন্তরে সিলিয়ারী বডি নামক অংশ হতে সবসময় অ্যাকোয়াস হিউমার (Aqueous Humour) নামে স্বচ্ছ জলীয় পদার্থ তৈরী হচ্ছে এবং চক্ষুস্বচ্ছ (Cornea) ও শ্বেতপটলের (Sclera) সংযোগস্থলে অবস্থিত সূক্ষ্ম জালিকার মতো ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে রক্তে ফিরে যাচ্ছে। এই জলীয় পদার্থের কিছু অংশ সব সময় চোখের ভিতরে থেকে এর অভ্যন্তরীণ চাপ (১০ হতে ২১ মি. মি. পারদ স্তম্ভ) রক্ষা করে। কোনও কারণে অ্যাকোয়াস হিউমার কম হলে চোখের চাপ কমে যায় এবং বেশি হলে চাপ বেড়ে যায়। চোখের এই চাপ বেড়ে গিয়ে যখন চোখের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে অতিসংবেদনশীল স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি সাধন করে তখন তাকে বলা হয় চোখের উচ্চচাপ বা গ্লুকোমা (Glaucoma)।

চোখের নানা রোগের মধ্যে গ্লুকোমা একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগ হলে আস্তে আস্তে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। কোনও কোনও গ্লুকোমা রোগী নিজের চোখের রোগের অস্তিত্ব বুঝতে পারার পূর্বেই শতকরা ৯০ ভাগ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। এই রোগে চোখের যে দৃষ্টিশক্তি চলে যায় তা চিকিৎসা করে কখনও ফিরে পাওয়া যায় না। কেবল অবশিষ্ট দৃষ্টিশক্তিটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্যে চিকিৎসা করা হয়।

চোখের ভিতরে একটা পানির চাপ থাকে। এই পানি চোখের ভিতরেই তৈরী হয় এবং ভিতরে ভিতরেই বেরিয়ে যায়। চোখের বাইরে যে পানি বেরিয়ে আসে তার সাথে ভিতরের পানির কোনও সম্পর্ক নাই। কোন কারণে যদি ভিতরের এই পানি বের হতে না পারে তাহলে সেই পানি এটা চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে চোখের সূক্ষ্ম নার্ভগুলো চাপের প্রভাবে শুকিয়ে যেতে থাকে। চোখের এই নার্ভ বা রক্তের শিরা শুকিয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। এটা পারমান্যান্ট ক্ষতি। এরপরে কেবল (গ্লুকোমার ক্ষেত্রে) চোখের দৃষ্টিশক্তি যেটুকু আছে তা ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়।

গ্লুকোমা রোগের কারণ

এই রোগের সঠিক কারণ জানা যায়নি। তবে সাধারণত চল্লিশ বছরের পরে এ রোগ হতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ কোষ্ঠকাঠিন্য, হার্টের দুর্বলতা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস রোগে ভোগা, অপুষ্টিজনিত স্নায়বিক রোগ, উদরাময়, পুরাতন আমাশায়, এনিমিয়া ইত্যাদি কারণে এ রোগ হতে পারে।

গ্লুকোমা রোগের লক্ষণ

১. প্রথমে চোখে অস্পষ্ট দেখে এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা দেখা দেয়।

২. সবকিছুই যেন রামধনুর রঙের মতো দেখতে পায়।

৩. ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, নিম্ন রক্তচাপ, এনিমিয়া ইত্যাদি রোগ থাকতে পারে।

গ্লুকোমা রোগের চিকিৎসার পরামর্শ

এই রোগের প্রথম অবস্থায় সুচিকিৎসা করা হলে সুফল পাওয়া যায়। ভুল চিকিৎসা কিংবা চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটলে অথবা অপচিকিৎসা হলে আরোগ্য করা কঠিন হতে পারে। এ জন্য যখন রোগী চোখে ভাল দেখতে পায় না কিংবা আবছা দেখতে শুরু করে তখনই সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সাধারণত চল্লিশ বছরের আগে গ্লুকোমা হয় না। এক্ষেত্রে বিলম্ব মারাত্মক ক্ষতিও করতে পারে। যেমন চোখ অন্ধ পর্যন্ত হতে পারে।

পুষ্টিকর হালকা খাদ্য খেতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

মাইওপিয়া

মাইওপিয়া অর্থ নিকট দৃষ্টি বা 'শর্ট সাইটেডনেস'। চোখের গোলকের (Eye-ball) সামনে পিছনের দূরত্ব বেড়ে যায়। ফলে বিষয়বস্তুটি খুব কাছে না আনলে দেখা যায় না। এই অবস্থায় অবতল পরকলা (Minus Lens) ব্যবহার করলে বস্তুটি ঠিকভাবে দেখা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে চোখের এই অবস্থায় দৃষ্টির প্রখরতা এতো কম থাকে যে, অবতল পরকলা (Minus Lens) ব্যবহার করলেও সম্পূর্ণ দৃষ্টি ঠিকভাবে আসে না। মনে রাখতে হবে যে, মাইওপিয়া যদি কম থাকে তাহলে এটা চোখের রোগ নয় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মাইওপিয়া বেশি থাকলে তার সাথে চোখের রোগ থাকতে পারে। মাইওপিয়া বেশি থাকলে তার সাথে চোখের রোগ থাকতে পারে। মাইওপিয়া যাদের আছে তাদের অনেকের চোখ বেশ বড় এবং খুব সুন্দর দেখা যায়। তাই বলে সকল বড় ও সুন্দর চোখের ব্যক্তিরই যে মাইওপিয়া আছে এটা ভাবা উচিত নয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি হওয়ার পরেও মাইওপিয়া রোগের সমস্যা আজও বিদ্যমান। এই রোগে আক্রান্ত রোগীরা নিকটের সবকিছু অত্যন্ত পরিষ্কার দেখেন কিন্তু দূরের কোনও কিছুই পরিষ্কার দেখেন না। সবকিছু অস্পষ্ট বা ধোঁয়াটে দেখেন। এই অবস্থা বাচ্চা বা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশি হতে দেখা যায়। বয়স যতো বাড়তে থাকে অর্থাৎ কুড়ি-পঁচিশ পর্যন্ত চোখের গোলক (Eye-ball) লম্বা হতে থাকে। এই লম্বা হওয়াকে বলা হয় হ্রস্ব দৃষ্টি বা মাইওপয়া (Mypia)।

চোখের গোলক (Eye-ball) লম্বা হতে থাকলে চোখের পাওয়ার একটু একটু করে বাড়তে থাকে। কুড়ি-পঁচিশ বছরের পর যখন শারীরিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় তখন চোখের পাওয়ারও আর তেমন বাড়তে দেখা যায় না। যেসব ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি বেড়ে যেতেই থাকে সেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের মাইওপিয়াকে বলা হয় কমপ্লিকেটেড বা ডেওডোরাস মাইওপিয়া। কোনও কোনও চিকিৎসক এটাকে ম্যালিগন্যান্ট মাইওপিয়া বলেন। কারণ, এই ধরনের মাইওপিয়া পরে দৃষ্টিহীনতা নিয়ে আসতে পারে। চোখ যতো লম্বা হয়, পিছনের পর্দাগুলোয় ততোই টান পড়তে থাকে।

মাইওপিয়া রোগের কারণ

১. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়স বেশি হলে পরকলার (Lens thickness)-এর কিছু পরিবর্তন হয়। ফলে এই রোগ হতে পার।

২. মাইওপিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বংশগত রোগ। আব্বা-আম্মার যদি এই রোগ থাকে তাহলে সন্তানদেরও হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেক আব্বা-আম্মা বলেন যে, আমাদের চোখ ভাল অথচ আমাদের ছেলেমেয়ের এই রোগ হলো কীভাবে! এই ক্ষেত্রে বংশের ইতিহাস জানতে গেলে দেখা যায় যে, বংশের অন্য কারোর কিংবা দু' এক পুরুষ পূর্বে কারোর এই রোগ ছিলো।

মাইওপিয়া রোগের লক্ষণ

এই রোগ হলে বই কিংবা কোনও বস্তু খুব কাছে না আনলে পরিষ্কার দেখা যায় না। অর্থাৎ ৫/৬ ইঞ্চি দূরে আনলে তখন স্পষ্ট দেখা যায়। আবার দূরে কম দূরত্ব পর্যন্ত সবকিছু পরিষ্কার দেখা যায় কিন্তু বেশি দূরের কোনও কিছু স্পষ্ট দেখা যায় না।

মাইওপিয়ার প্রাথমিক চিকিৎসার পরামর্শ

১. এই রোগ হলে প্রতিদিন ৩/৪ বার পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে চোখ ধোয়া খুব উপকারী। বিশেষজ্ঞরা বলেন, "চোখে রোগ হোক বা না হোক দৈনিক ৩/৪ বার পরিষ্কার পানি দিয়ে চোখ ধুইলে চোখের অর্ধেক রোগ বেরিয়ে যায়।" এতে চোখের ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে এবং দীর্ঘদিন দৃষ্টিশক্তি ঠিক যাকে।

২. নোংরা কাপড় বা রুমাল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করা উচিত নয় এবং অতি উজ্জ্বল আলো, অক্সি-অ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলো, সূর্য বা সূর্যগ্রহণ প্রভৃতির দিকে তাকানো উচিত নয়।

৩. বই পড়ার সময় ১২-১৪ ইঞ্চি দূরে রেখে পড়া উচিত।

৪. শিশুদের চোখে কম দেখার ভাব দেখলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৫. চল্লিশ বছর বয়সে চোখ পরীক্ষা করা কর্তব্য। প্রয়োজনবোধে চশমা ব্যবহার করতে হবে।

৬. চকচকে সানগ্লাস ব্যবহার করা উচিত নয়।

৭. ফ্লুরোসেন্ট আলোতে বা টিউব লাইটে চোখের উপকার হয়।

৮. মাইওপিয়া হলে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে, কী খাব, কী খেলে এই রোগ কমবে? এ ব্যাপারে প্রফেসর পি. মণ্ডল বলেন ঃ "ভালো পুষ্টিকর খাবার দাবারের সঙ্গে মাইওপিয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। পুষ্টির অভাব থেকে মাইওপিয়া হয় না। ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালাদের মাইওপিয়া হয় না। মায়েরা জিজ্ঞেস করেন, ছেলেকে গাজর খাওয়াব কি না, মাছের মাথা খাওয়াব কি না, শুগলি খাওয়াব কি না ! এসব খাওয়ালে চোখ ভাল থাকবে এমন কোন কথা নেই। পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর ভাল

থাকে। সেই হিসেবে চোখও ভাল থাকবে কিন্তু চোখ খারাপ হয়েছে অতএব গাজর খেলে, কডলিভার অয়েল খেলে, বেশি করে ভিটামিন-'এ' খেলে মাইওপিয়া ভালো হয়ে যেতে থাকবে এমন ধারণা ঠিক নয়।"[২]

৯. যেসব ছেলেমেয়ের মাইওপিয়া হয়েছে, চশমা পরছে, তাদের ক্ষেত্রে অনেককে দেখা যায় বই পড়তে খুব ভালবাসে। এরা বাইরে কম মেশে এবং খেলাধুলাও কম করে। এতে চোখ আরও খারাপ হতে পারে।

১০. মাইওপিয়ার ক্ষেত্রে চশমার বদলে 'কন্‌টাক্‌ট লেন্‌স' ব্যবহার করা ভাল। কোনো ছোট ছেলে বা মেয়ের মাইওপিয়া হলে তাকে চশমার পরিবর্তে কন্‌টাক্‌ট লেন্স দেওয়া হলে পাওয়ার আর বাড়ে না। বাড়লেও খুব বেশি বাড়ে না। কন্‌টাক্‌ট লেন্স-এর কাজ হচ্ছে চোখের পাওয়ার আটকানো।

৩. চোখের ছানি

চোখে ছানি পড়া আমাদের দেশে একটা সাংঘাতিক মারাত্মক ধরনের রোগ বলা যায়। কারণ, আমাদের দেশে বয়সকালে যত লোক অন্ধ হচ্ছে তার প্রায় ৫০ থেকে ৬০ ভাগ হয় ছানি থেকে। এই রোগ সাধারণত ৫০ বছর বয়সের পরে বেশি হয়।

চোখের ছানি কী

আমাদের চোখের অভ্যন্তরে পরকলা (Lens) নামক একটি অংশ আছে। এই লেন্সের মাধ্যমে বাইরের কোন বস্তু হতে আলোকরশ্মি চোখের ভিতর প্রবেশ করে এবং চোখের অভ্যন্তরে অবস্থিত রেটিনা নামক স্থানে ঐ বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরী করে, ফলে উক্ত বস্তুকে আমরা দেখতে পাই। চোখের লেন্স বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। এর মধ্যে প্রোটিন একটি অংশ। বৃদ্ধ বয়সে অনেক সময় এই প্রোটিন তার নিজস্ব গুণাবলী পরিবর্তন করে কিছুটা পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। ফলে লেন্স-প্রোটিন কিছুটা জমাট বেঁধে গিয়ে লেন্সকে অস্বচ্ছ করে তোলে, ফলে স্বচ্ছ লেন্স দিয়ে যতটা সহজে আলোকরশ্মি চোখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, অস্বচ্ছ লেন্স দিয়ে সেভাবে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে রেটিনার উপরও বস্তুর কোনও প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয় না এবং যার কারণে আমরা চোখে দেখতে পাই না। এই অবস্থার সৃষ্টিকে বলা হয় চোখের ছানি বা (Cataract)। অনেকের ধারণা, ছানি বলতে চোখের মধ্যে পর্দা পড়া বোঝায়। তাই অনেকে গ্রামের হাতুড়ে চিকিৎসক দ্বারা চোখের পর্দা কাটায়। আর হাতুড়ে চিকিৎসক পর্দা কাটার নামে ঘোলাটে লেন্সকে ধাক্কা দিয়ে চোখের পিছনের দিকে ফেলে দেয়। প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী বলেন ঃ "যেহেতু ঘোলাটে লেন্স আলোকরশ্মি চোখের ভেতরে প্রবেশে বাধা হচ্ছিল, এর অনুপস্থিতিতে আলোকরশ্মি চোখের ভেতর প্রবেশ করতে পারে, এভাবে হাতুড়ে ডাক্তারের দ্বারা বেশ কিছু রোগী ভালো হতে পারে, তবে মনে রাখতে হবে যে, এই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়াটা খুবই

সাময়িক এবং চোখের পেছনে সরে যাওয়া পরকলা চোখের মধ্যে এমন ক্রিয়ার সৃষ্টি করে যাতে চোখ অন্ধ হতে বাধ্য, অন্ধ হওয়াটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।"

চোখের ছানির কারণ

১. সঠিক কারণ অজানা। তবে বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই রোগ হতে দেখা যায়। আবার আব্বা-আম্মার ছানি থাকলে ছেলেমেয়েরও সম্ভাবনা থাকে। তবে আব্বা-আম্মার যদি বেশি বয়সে অর্থাৎ ৬০-৬৫ বছর বয়সে ছানি হয় তাহলে ছেলেমেয়ের আরও কম বয়সে অর্থাৎ ৪৫-৫০ বছর বয়সে ছানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাঁরা ডায়াবেটিসে-আক্রান্ত তাঁরা দু'ভাবে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। (ক) রোগীর দেহে সুগারের পরিমাণ অস্বাভাবিক মাত্রায় বেড়ে গেলে চোখের পরকলার (Lens) বিপাক প্রণালীতে জটিলতা দেখা দেয়। বিশেষ করে অনেক দিন ধরে রক্তে সুগারের মাত্রা ২০০ মি. গ্রা. বা ততোধিক হলে 'সেরবিটাল' নামক এলকোহলের আধিক্য দেখা দেয়। যার উপস্থিত পরকলার জন্যে ক্ষতিকর। ফলে লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে। এই প্রকার ছানি কম বয়সের ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। (খ) দ্বিতীয় প্রকারের ছানি ইনসুলিন অনির্ভর ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে বেশি হতে দেখা যায়।

২. ভিটামিন-'এ' এবং 'ই' এই দুটি অতি প্রয়োজনীয় ভিটামিনের অভাবে চোখে ছানি পড়ার আশংকা থাকে। যাদের শরীরে ভিটামিন 'ই' এবং 'ক্যারোটিনের' অভাব আছে তাদের পরবর্তীকালে চোখে ছানি পড়ার আশংকা তিনগুণ বেড়ে যায়। গবেষকরা মনে করেন, "যেসব রাসায়নিক পদার্থ চোখের (প্রোটিন) উপাদানগুলোকে অক্সিজেনযুক্ত করে সেগুলোর কারণে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে চোখের ছানির সম্পর্ক আছে। এই ক্ষয়ক্ষতির প্রতিহত করার ক্ষমতা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। ভিটামিন 'এ' ও 'ই' এন্টিঅক্সিডেন্ট এবং এগুলো ঐ ক্ষতিরোধে সহায়তা করে।"[৪]

৩. অধিক উত্তাপ বা রোদে ঘোরা, রোদে বসে কাজ করা ইত্যাদি কারণেও ছানি পড়তে পারে'।

৪. সিফিলিস রোগের কারণেও চোখে ছানি পড়তে পারে।

৫. জন্মের সময় শিশু চোখে ছানি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। এটাকে Congenital Cataract বলা হয়। এই ধরনের ছানির হার খুব কম।

৬. অনেক সময় চোখে আঘাতজনিত কারণে ছানি সৃষ্টি হতে পারে। এটাকে বলা হয় Traumatic Cataract. আমাদের দেশে এই ধরনের চোখের ছানির হার কিছুটা বেশি।

চোখের ছানির লক্ষণ

আস্তে আস্তে দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। চোখের লেন্স ও আবরণী পর্দা দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে দূরের কোনও পদার্থ পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না। সবকিছুই ঝাপসা বা আবছা

দেখে। উজ্জ্বল আলো দেখে দূরের প্রদীপের আলো বলে ভুল করে। আবার অনেক সময় একটি আলোকে অনেকগুলো আলো বলে মনে করে। চোখের স্বাভাবিক বর্ণ ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে।

জটিলতা

সঠিক সময় সুচিকিৎসা করা না হলে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। ছানি পড়ার প্রাথমিক পর্যায়ে কিংবা একেবারে শেষ পর্যায়ে গ্লুকোমা বেড়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যায়ের এই গ্লুকোমাকে বলা হয় Phacolytic Glaucoma.

ছানির চিকিৎসার পরামর্শ

চোখের ছানির প্রাথমিক অবস্থায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ অত্যন্ত কার্যকর। এতে অপারেশনের কোনও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন চোখের পুতলী এবং শ্বেতাংশ ক্রমে ক্রমে শক্ত হয় তখন সাধারণত অপারেশন ছাড়া আরোগ্য হয় না। প্রধানত দু'প্রকার অপারেশন প্রচলিত আছে। ১. Intracapsular cataract extraction এবং (২) Extracapsular cataract extraction. চোখের ছানির যে কোনও অবস্থায় এবং যে কোনও বয়সে অপারেশন করা যায়। ডায়াবেটিস কিংবা হৃদরোগ থাকলে কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। অবশ্য বর্তমানে ডায়াবেটিস থাকলেও সেটা নিয়ন্ত্রণ করে অপারেশন করা যায়। প্রফেসর পি. মণ্ডল বলেন, "বেশি বয়স হলে অনেকেই অপারেশন করাতে চান না। অথবা বয়স হয়ে গেছে একটা চোখে ছানি অপারেশন হয়েছে এমন ব্যক্তিরা প্রায়ই বলেন, একটা চোখে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি আর অপারেশনের ঝামেলার দরকার নেই। এটা খুব বিপজ্জনক ভাবনা। ছানি থেকে যাওয়ার পরও কেউ যদি ছানি কাটাতে গড়িমসি করেন তা হলে তাঁর ছানি থেকে গ্লুকোমা হতে পারে। চোখ লাল হয়ে অস্বস্তি হতে পারে, শেষকালে এমন হতে পারে যে চোখটা হয়তো তুলে ফেলতে হবে।"[৫]

৪. ট্যারা চোখ

মানুষের শারীরিক ত্রুটি নানা রকমের হয়। ট্যারা চোখও একটি শারীরিক ত্রুটি। মানুষ এই ত্রুটির জন্য হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়েন। কারণ, এটা ভয়াবহ রূপও ধারণ করতে পারে। এই সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি কোন একটি নির্দিষ্ট দ্রষ্টব্য বস্তুর দিকে তাকাতে গেলে এক চোখ থাকে সোজা এবং অন্য চোখ বেঁকে যায়। এই বাঁকা চোখেই বলা হয় ট্যারা চোখ বা Squint Eyes.

এই রোগে আক্রান্ত অনেক রোগীর চোখ সবসময়ই ট্যারা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রোগীর চোখ ঠিক আছে অথচ রোগীর এক চোখ বন্ধ করে আবার খুললে তখন দেখা যায় যে চোখ ট্যারা আছে। এই প্রকার গুপ্ত ট্যারা রোগ একমাত্র বিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক ব্যতীত বুঝতে পারেন না। যাদের চোখ ট্যারা

অনেক সময় মানুষের কাছে নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করেন। অথচ সঠিক সময়ে এই রোগের সুচিকিৎসা করা হলে ট্যারা চোখ স্বাভাবিক হতে পারে এবং তাতে সামান্য বিপদও নেই।

ট্যারা চোখ রোগের কারণ

১. নির্দিষ্ট দূরত্বে পাশাপাশি রয়েছে দুটি চোখ। এই চোখদুটি উপরে-নীচে, ডানে-বামে ঘুরানোর জন্য চোখে কতগুলো মাংসপেশী (Muscle) আছে এবং সেই মাংসপেশীগুলো নিজেদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে কাজকর্ম করে ও দু'চোখে পড়া আলোকরশ্মি সমান্তরাল অক্ষরেখা চোখের ভিতরের সংবেদনশীল পর্দা চক্ষুপটে (Retina) গিয়ে পড়ে, ফলে দু'চোখে একই সাথে একই বস্তুর ত্রিমাত্রিক পায় অতি স্বচ্ছভাবে এবং এটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বলা হয় Binowlar Vision. কোন কারণে দু'চোখের ভারসাম্য রক্ষাকারী মাংসপেশী অসুস্থ হলে কিংবা অন্য কোন কারণে দু'চোখের উপর সমান্তরাল পড়া অক্ষরেখা সমান্তরাল না থাকতে পারলে চোখ ট্যারা হতে পারে।

২. দু'চোখের অসম দৃষ্টির একটি কিংবা উভয়ের অস্বচ্ছতার কারণে চোখ ট্যারা হতে পারে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে এই অস্বচ্ছতা কর্নিয়া, অ্যাকোয়াস, লেন্স কিংবা ভিট্রিয়াস-এর যে কোনও স্থানে থাকতে পারে।

৩. চোখকে উপরে-নীচে, ডানে-বামে ঘোরানোর মাংসপেশীগুলো কোনও কারণে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় তখন এক চোখ অন্য চোখের সমান্তরাল অক্ষরেখা থেকে সরে যায়, এ কারণে চোখ ট্যারা দেখায়।

৪. বহুদিন কোনও জটিল রোগে ভোগার পর চোখ ট্যারা হতে পারে।

৫. চোখের পেশীর পক্ষাঘাত ছাড়াই চোখ ট্যারা হতে পারে।

ট্যারা চোখের লক্ষণ

চোখের মণি বাঁকাভাবে থাকে। অনেক সময় রোগী যে দিকে তাকায় চোখের মণি তা থেকে ভিন্ন দিকে থাকে বলে মনে হয়। অবশজনিত ট্যারা থাকলে কোনও একটি বিশেষ বস্তুর দিকে তাকালে দুটি মনে হয়। চোখ বিশেষ দিকে সম্পূর্ণ ঘোরানো যায় না (Limitation of Movement)। কারও কারও বমি বমি ভাব কিংবা বমি হতে পারে। ঘূর্ণানুভূতি (Vertigo) হতে পারে। কারও কারও বংশগতভাবে চোখ ট্যারা হতে দেখা যায়।

সতর্কতা (ট্যারা চোখের)

১. শিশুদের জন্মের পর বিশেষ করে যাদের Flat Nasal Bridge অথবা চওড়া Epocantitic Ford চীনা বা গারো শিশুদের মতো কিংবা দু'চোখ তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি রয়েছে, তাদের ট্যারা চোখ বলে ভুল হতে পারে। তবে শিশুদের স্বাভাবিক

বিকাশের সাথে সাথে এই অসামঞ্জস্যতা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। শিশুদের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি সঠিকভাবে নির্ণয় করার পর দ্রুত চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

২. অনেক ক্ষেত্রেই অসম দৃষ্টি এবং দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা। চশমা ব্যবহার করে এই ত্রুটি দূর করা যায়।

৩. শিশুর জন্য সঠিক সময়ে চিকিৎসা তার দৃষ্টিশক্তির উপর এক জরুরী সাহায্য হিসাবেই গণ্য হয়। তা না হলে শিশুর স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে চশমা ব্যবহার ও ঔষধ সেবনের পরও যদি এই ত্রুটি থাকে তাহলে অবশ্যই অপারেশন করতে হবে।

৪. ছোট সময়ে চিকিৎসা করা হলে চোখ ভাল হয় কিন্তু তা না হলে এই সমস্যা বেড়ে গিয়ে অন্ধত্ব পর্যন্ত হতে পারে।

প্রতিকার (ট্যারা চোখের)

১. বদ্ধ আবহাওয়ায় এবং তীব্র আলোতে বই পড়া কিংবা কাজকর্ম করা নিষেধ।

২. ভোরে ঘুম থেকে উঠে খালি পায়ে কিছুদূর দৌড় দিয়ে যাবে এবং আবার দৌড়ে ফিরে আসতে হবে। এইভাবে প্রতিদিন সকালে ২-৩ বার করতে হবে।

৩. দিনে কমপক্ষে এক ঘন্টা চোখকে বিশ্রাম দিতে হবে।

৪. দেওয়ালের উপর কয়েকটি অক্ষর লিখে ২০ ফুট দূর থেকে ভাল চোখটি বন্ধ করে ট্যারা চোখের সাহায্যে সেই লেখা পড়তে হবে কমপক্ষে একটি মিনিট। আবার ট্যারা চোখ বন্ধ করে ভাল চোখ দিয়ে পড়তে হবে। এইভাবে ৫-৭ দিন পড়তে হবে প্রতিদিন ৩-৪ বার করে।

৫. হাতে একটি কলম নিয়ে এক হাত দূরত্বে রেখে কলমের নিবের উপর লক্ষ করতে হবে এবং আস্তে আস্তে কাছে আনতে হবে; আবার একহাত দূরে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে প্রতিদিন ২-৩ বার করতে হবে।

৬. একটি যে কোন ও ধাতুর গ্লাসে ছোট একটি ছিদ্র করে সেই ছিদ্র দিয়ে দূরের কোন বস্তু কিংবা অক্ষর পড়ার চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিন ৫-৬ বার।

৭. একটা চেয়ারে সোজাভাবে বসে চোখ দু'টো বন্ধ করে আবার খুলতে হবে এবং আবার চোখ বন্ধ করে আবার খুলতে হবে। এই সময়ে হাতে একটি বই রেখে বই পড়ার চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে ২০-২৫ দিন করতে হবে এবং প্রতিদিন ৩-৪ বার করে।

৮. একটি দেওয়ালের গায়ে কালো কালি দিয়ে কয়েকটি অক্ষর লিখে বিশ ফুট দূরে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে অক্ষরগুলো প্রতিদিন ৩-৪ বার পড়তে হবে।

পথ্য ঃ দুধ, ছানা, শরবত, ডাব, ফলমূল, শাক-শব্জি এবং লঘুপাক খাদ্য খেতে হবে।

ট্যারা চোখ চিকিৎসার পরামর্শ

মা-বাবা যখনই দেখবেন যে, শিশুর চোখ ট্যারা ভাব, তৎক্ষণাৎ চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। অস্বচ্ছ বা দু'চোখের মধ্যে অসম দৃষ্টির কারণে চোখের মাংসপেশীগুলো ভারসাম্য হারাতে পারে। চোখ সামান্য ট্যারা হলে কেবল ওষুধ সেবন, চশমা ব্যবহার বা চোখের ব্যায়াম করে কখনও কখনও ভাল ফল পাওয়া যায়। বেশি ট্যারা চোখের ক্ষেত্রে অপারেশন না করে চোখ সোজা করার অন্য কোনও উপায় নেই। আবার চোখ খুব বেশি ট্যারা হলে একটি চোখের উপর অপারেশন করে পুরো ফল নাও পাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় চোখের অপারেশন করে চোখ একেবারে স্বাভাবিক করা যায়। ডা. পার্থ হাজারি বলেন, "অস্বচ্ছ বা অসম দৃষ্টির কারণে যদি শিশুর চোখ ট্যারাভাব দেখা যায়, চশমা বা অন্যান্য চিকিৎসার সাহায্য না নিলে সেই ট্যারাভাব ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া কোনও কোনও শিশুর চিকিৎসা না করানোর জন্য একটি চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। বেশী বয়সে চিকিৎসা শুরু করলে আর ওই চোখে দৃষ্টিই ফিরে পাওয়া যায় না। অবশ্য ট্যারা চোখটা বাইরে থেকে দেখতে সোজা করে দেওয়া যে কোনও বয়সেই সম্ভব।"[৬]

৫. চোখের আঘাত

চোখে কোনও সামান্যতম আঘাত লাগলে বা পাপড়ি চলে গেলে কিংবা অন্য কোনও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু প্রবেশ করলেই সৃষ্টি হতে পারে অতি জটিল সমস্যা। চোখে আঘাতজনিত কারণে শতকরা ৫-১০ ভাগ লোক অন্ধত্বের শিকার হচ্ছে। এ ছাড়া রয়েছে আঘাতজনিত চক্ষুরোগের অচিকিৎসা ও কুচিকিৎসার কুফল অর্থাৎ অন্ধত্ব। গ্রামের মানুষ চোখের আঘাতে বিভিন্ন পাতার রস কিংবা শামুকের রস চোখে লাগিয়ে দেয়; এটা আঘাতের চেয়েও মারাত্মক হতে পারে। আঘাতের পরে সঠিক চিকিৎসা না হলে সংক্রমণ দ্বারা আক্রান্ত হয়েও চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

চোখের আঘাতের কারণ

১. অজান্তে, অসতর্কতাবশত কিংবা হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা থেকে চোখে আঘাত লাগতে পারে। ২. চোখে কোনও পোকা-মাকড় ইত্যাদির ধাক্কা বা আঘাত লেগে ইনজুরি হতে পারে। ৩. রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় চোখে ধূলোবালির সাথে আঘাত লাগতে পারে। ৪. কল-কারখানায় কাজ করার সময় লোহার কণা, এলুমনিয়ামের কণা ইত্যাদি দ্বারা চোখ ইনজুরি হতে পারে। ৫. গ্রামের কৃষকরা ধান কাটার সময় ধানের সাথে চোখে আঘাত লাগতে পারে। ৬. ধান মাড়াইয়ের সময় তুষের গুঁড়া বাতাসের সাথে উড়ে এসে চোখে আঘাত লাগতে পারে। ৭. ট্রেনে, বাসে প্রভৃতি যানবাহনে চলাচলের সময় কয়লার গুঁড়া, ধূলোবালি ইত্যাদি বাতাসের সাথে উড়ে এসে চোখে আঘাত লাগতে পারে। ৮. কোন কেমিক্যাল কিংবা বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা চোখ ইনজুরি

হতে পারে। ৯. যুদ্ধ, গণআন্দোলন ও অসামাজিক কাজের সময় হাত বোমা ইত্যাদি দ্বারা চোখে আঘাত কিংবা ইনজুরি হতে পারে। ১০. নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণের সময় প্রসূতির সঠিক পরিচর্যা না হলে, চোখে আঘাত লেগে অনেক সময় নবজাতক শিশুর চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

চোখে আঘাতের লক্ষণ

২. চোখে আঘাত লাগার কারণে চোখ ফুলে ওঠে, লালবর্ণ হয়, ব্যথা ও যন্ত্রণা হয়। ২. চোখ দিয়ে পানি পড়ে, ৩. চোখের সাদা অংশে কখনও কখনও রক্ত জমে যায়, ৪. রাতে চোখ জড়ে যায় এবং পিচুটি পড়ে; একই সাথে মাথা ব্যথা ও যন্ত্রণা হতে পারে, ৫. আলোক অসহ্য, ৬. কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণে চোখের সাদা অংশ কিংবা মণি পর্যন্ত ইনজুরি হতে পারে, ৭. রাস্তার দুর্ঘটনায় সরাসরি চোখে আঘাত লেগে স্বচ্ছ ঝিল্লির (Conjunctiva) নীচে রক্ত জমতে পার, এমনকি স্বচ্ছ ঝিল্লি ছিঁড়েও যেতে পারে, ৮. চক্ষু গোলকের বাইরের মাংসপেশী আঘাতে ছিঁড়ে যেতে পারে।

সাবধানতা (চোখের আঘাতে)

১. ধূলোবালি ইত্যাদির কণা কিংবা রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা পুড়ে যাওয়া ছাড়া চোখে কোনো অবস্থাতেই পানি দেওয়া যাবে না। ২. শিশুদের সূক্ষ্মাগ্র খেলনা দেওয়া যাবে না। তাতে বিপদ হতে পারে। ৩. দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেলে কিংবা ব্যাথাযুক্ত লাল চোখ নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া রোগীর কাজে যোগদান করা যাবে না। ৪. চোখে প্রাথমিক পরিচর্যার জন্য শ্রমিকের নিজের স্বার্থেই কল-কারখানায় চোখের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫. চোখে যে কোনও ধরনের ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, চোখের সামান্য আঘাতও মারাত্মক হতে পারে এবং আঘাতের ২৪ ঘন্টা পর চক্ষু পরীক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে চিকিৎসাও কঠিন হতে পারে। ৬. অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখকে রক্ষার জন্য ঝালাই মিস্ত্রীদের প্রয়োজন অনুযায়ী কালো চশমা (Gogles) কিংবা প্রটেকটিভ ডিভাইসেস (Protective devices) ব্যবহার করতে হবে।

চোখের আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসার পরামর্শ

১. চোখে কোনও কিছু পড়লে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। যদি তাতে বেরিয়ে না যায় তাহলে পরিষ্কার কাপড়ের কোণা দিয়ে কিংবা তুলা দিয়ে বের করার চেষ্টা করতে হবে। তাতেও যদি বের না হয় তাহলে চক্ষু চিকিৎসককে দেখাতে হবে। কখনও চোখ রগড়ানো যাবে না। তাতে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

২. চোখে ঘুষি বা ভোঁতা বস্তুর আঘাতে (সামান্য আঘাতেও) ও অস্বাভাবিক ক্ষতের কারণে চোখের পাতায় (Eyelids) রক্তক্ষরণ হয়ে কালো বর্ণ হলে, কনীনিকা

(Iris) ছিঁড়ে গেলে, চোখ কালো বর্ণ হলে, চক্ষু ঝিল্লির নীচে রক্ত জমা হলে, চোখের ভিতর রক্তক্ষরণ হলে, চক্ষুপটে (Retina) রক্তক্ষরণ হলে, চক্ষুপট বিচ্ছেদ হলে, চক্ষুগোলক কেটে গেলে, পরকলা (Lens) স্থানচ্যুতি হলে, কাচীয়ে (Vitreous) রক্ত ক্ষরণ হলে, চক্ষুগোলকের পানির চাপ বেড়ে গেলে, চক্ষু-স্নায়ুতে (Optic nerve) আঘাত লাগলে, চক্ষুগোলকের হাড় ভেঙে গেলে, চোখের পাতা বন্ধ থাকলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে কখনও দেরী না করে চোখে পরিষ্কার পট্টি দিয়ে তাড়াতাড়ি চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তা না হলে চোখে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. জামাল নিজামউদ্দিন আহমেদ বলেন, "বাহ্যিক সামান্য ক্ষতের চিহ্ন থাকলেও দেরী না করে চোখে পরিষ্কার পট্টি দিয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন। এমতাবস্থায় যত দেরী করবেন চোখের তত ক্ষতি হবে। কোনও অবস্থাতেই চোখে ওষুধ বা পানি দেবেন না।"[৭]

৩. কর্নিয়ায় ঘর্ষণ বা আঁচড় লেগে চোখে যদি বালুবালু কিংবা ময়লা অনুভব করে অথচ চোখে কিছুই দেখা যায় না, এমতাবস্থায় মনে করতে হবে যে, নিশ্চয়ই কর্নিয়ায় ঘর্ষণ বা আঁচড় লেগেছে এবং তখনই কোন দেরী না করে চোখে পরিষ্কার পট্টি দিয়ে চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ২৪ঘণ্টা পার না হলে পট্টি খোলা যাবে না।

৪. চোখ কালো বর্ণ হলে তাড়াতাড়ি চোখে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা শেক দিতে হবে এবং ব্যথা হলে, ব্যথা বেড়ে গেলে, ব্যথা না কমলে চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৫. চোখে গুতা লেগে ফুটা হলে কখনও চোখে পানি কিংবা মলম ব্যবহার করা যাবে না এবং জোর করে দেখার চেষ্টা করা যাবে না। চক্ষু চিকিৎসক দেখাতে হবে।

৬. আগুনের তাপে পুড়ে গেলে পরিষ্কার পট্টি দিতে হবে এবং হাসপাতালে নিতে হবে।

৭. রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা পুড়ে গেলে আঙুল দিয়ে চোখের পাতা (Eyelids) ফাঁক করে পরিষ্কার ঠাণ্ডা পানি তাৎক্ষণিকভাবে চোখে ঢালতে হবে। এক চোখে হলে পুরো চোখের দিকে মাথা কাত করতে হবে। তা না হলে ভাল চোখও কলুষিত হতে পারে। দু' চোখে হলে পানি পাত্রে মাথা ডুবিয়ে চোখ খুলে ধুয়ে নিতে হবে কমপক্ষে ২০-৩০ মিনিট এবং তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিতে হবে। প্রখ্যাত চক্ষুবিশেষজ্ঞ সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী বলেন ঃ "যে কোনও রাসায়নিক দ্রব্য চোখে পড়লে সাথে সাথে চোখে পানি দিতে হবে। পরিষ্কার পানি না পেলে যে কোনও পানি চোখে দেবার জন্যে ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে চোখ ভালভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে পরে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে রাসায়নিক দ্রব্যকে পানি দিয়ে দ্রুত ধুয়ে ফেলতে পারলে বহু চোখ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পায়।"[৮]

৬. রাতকানা

আমাদের দেশে রাতকানা মানুষের সংখ্যা অনেক। প্রতিবছর কেবল ভিটামিন 'এ'-এর অভাবজনিত কারণে প্রায় একলাখ শিশু রাতকানা রোগে ভোগে। রাতকানা রোগে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে প্রতিবছর প্রায় ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। ৬ মাস বয়স হতে ৬ বছরের নীচের বয়সী শিশুদের রাতকানা রোগ বেশি হয়।

রাতকানা কী ? দিনের বেলায় চোখে সবকিছু ভালভাবেই পরিষ্কার দেখে অথচ রাতে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পায় না, এই অবস্থাকে বলা হয় রাতকানা। আমার মনে হয়, দেশে এমন কোনও গ্রাম নেই যে, খোঁজ করলে ২/৪ জন রাতকানা রোগী পাওয়া যাবে না। এই রোগ তিন ধরনের হতে দেখা যায়। ১. জন্মগত—এই প্রকার রাতকানা রোগ একেবারেই আরোগ্য হয় না। ২. রেটিনাইটিস পিগমেনটোসা—এই প্রকার রাতকানা রোগও আরোগ্য হতে দেখা যায় না। ৩. কেরাটোম্যালেশিয়া—এই প্রকার রাতকানা রোগটি ভিটামিন-'এ'র অভাবে হয়। এজন্য ভিটামিন-'এ' এবং পুষ্টিকর খাদ্য খেলে এই প্রকার রোগ আরোগ্য হয়।

রাতকানার কারণ

এই রোগের মূল কারণ হলো অপুষ্টি। তা ছাড়া দীর্ঘদিন রোগে ভোগা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করা, কোনও কারণে রক্তহীনতা বা ভিটামিন-'এ'-এর অভাব প্রভৃতি কারণে এ রোগ হতে পারে।

রাতকানার লক্ষণ

১. চোখে প্রথম অবস্থায় প্রদাহ ও সামান্য ঘায়ের মত হতে দেখা যায়। ২. চোখ দিয়ে পানি পড়া, ব্যথা, জায়গায় জায়গায় ঘা ইত্যাদি হতে দেখা যায়। ৩. চোখের বিভিন্ন অংশের এপিথিলিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বিভিন্ন অংশের Lesion হতে থাকে। ৪. দিনের বেলা সবকিছু স্পষ্ট দেখে, কিন্তু যতো সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে থাকে ততো ক্রমশ চোখে সবকিছু অস্পষ্ট দেখতে শুরু করে এবং রাতে একেবারেই দেখতে পায় না।

রাতকানার উপসর্গ

চোখে ঘা কিংবা রাতকানা রোগের সময়মত সুচিকিৎসা করা না হলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

রাতকানা প্রতিরোধ

ভিটামিন-সমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেলে শিশুর অন্ধত্ব সহজে প্রতিরোধ করা যায়। শালদুধসহ শিশুকে দু'বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। প্রতিদিনের খাদ্যের চাহিদার সাথে ভিটামিন 'এ' জাতীয় খাদ্য খাওয়াতে হবে। শিশুকে সবুজ শাক-সব্জি ও ফলমূল খাওয়াতে হবে। শিশুর হাম, ডায়রিয়া ও অপুষ্টির চিকিৎসা করাতে হবে।

৭. চোখ ওঠা

জীবাণুর আক্রমণ, অ্যালার্জিসহ বিভিন্ন কারণে নেত্রবর্ত্মকলার প্রদাহ হলে তাকে বলা হয় চোখ ওঠা বা কনজাংটিভাইটিস। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিক থেকে চোখ ওঠা বা কনজাংটিভাইটিস জাতীয় চক্ষুরোগ অর্থাৎ লাল চোখ বা রক্তচক্ষু একটি বিপদের পূর্ব সংকেত।

চোখ ওঠা রোগ হলো একটি অতি সাধারণ চক্ষুপ্রদাহ। এই রোগ হলে চোখের বাইরের সাদা অংশ এবং চোখের পাতা আক্রান্ত হয়। ফলে চোখ লাল হয়, মাঝে মাঝে পিচুটি পড়ে, চোখ দিয়ে বারবার পানি পড়ে, চোখ ফোলে।

রোগের কারণ

(১) কখনও কখনও Virus-এর আক্রমণ থেকে এই রোগ হতে পারে। (২) দীর্ঘ সময় চোখে ধূলোবালি, ধোঁয়া, রোদের তাপ, ঠাণ্ডা বাতাস, জীবাণুর আক্রমণ ইত্যাদি কারণে এ রোগ হতে পারে। (৩) চোখ ওঠা রোগীর ব্যবহৃত রুমাল, তোয়ালে, গামছা, কাপড় ইত্যাদি ব্যবহারের কারণেও এই রোগ হতে পারে।

চোগের লক্ষণ

(১) চোখের সাদা অংশ লাল হয়, চোখ করকর করে,মনে হয় যেন চোখের মধ্যে আগুনের মতো তাপ। আলোক অসহ্য। (২) চোখ দিয়ে পানি পড়ে, পিচুটি পড়ে । (৩) চোখের পাতাদু'টি ভারী হয়। (৪) ঘুমালে চোখ জুড়ে যায় এবং তাতে কুটকুট করে কাটা বেঁধার মতো কষ্ট পায়। (৫) চোখ সবসময় জ্বালা করতে থাকে এবং মনে হয় চোখে যেন কেউ মরিচ গুলে দিয়েছে। (৬) চোখের রোগ বাড়লে ব্যথা হয় এবং চোখ টনটন করে। (৭) শিশুর জন্মের সময় মায়ের গনোরিয়া থাকলে সে জন্য শিশুর চোখও আক্রান্ত হতে পারে। এটাকে বলা হয় Opthalmia Neonotorum রোগ।

উপসর্গ

এই রোগ জীবাণুজনিত কারণে হলে এবং তার সুচিকিৎসা না হলে এই রোগ থেকে পরে আইরাইটিস রোগ হতে পারে।

চিকিৎসা পরামর্শ

(১) চোখ ভাল পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুতে হবে এবং কালো চশমা পরতে হবে। (২) চোখ কখনও রগড়াবেন না এবং হলুদ বা কাল পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে তা দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ মোছা ভাল। (৩) হালকা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে। (৪) টক দ্রব্য খাওয়া নিষেধ। (৫) টেলিভিশন সবসময় ১০ থেকে ১২ ফিট দূরে থেকে বসে দেখা উচিত এবং খালি চোখে টেলিভিশন দেখা ক্ষতিকর, চোখে রঙিন চশমা পরে নিতে হবে।

(৬) ডা. আই. এস. রায় বলেন, "অসুখ হোক বা না হোক দিনে অন্তত চারবার পরিষ্কার পানিতে চোখ ধোয়া দরকার। এতে চোখের অর্ধেক জীবাণু বেরিয়ে যায়।"[৯]

তথ্যসূত্র

(১) আপনার চোখ, সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, অনাময় পাবলিশার্স, ৩৬৭ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫। পৃষ্ঠা ১৬।
(২) নিকট দৃষ্টিতে চশমা অত্যাবশ্যক নয়, গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়, মাসিক গণস্বাস্থ্য, ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৯৭।
(৩) আপনার চোখ, সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, অনাময় পাবলিশার্স, ৩৬৭ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪।
(৪) বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল, ৫ ডিসেম্বর ১৯৯২।
(৫) লেজার চিকিৎসা, সানন্দা, ৪র্থ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ১২ জুলাই ১৯৯০।
(৬) ট্যারা চোখ সোজা, ডা. পার্থ হাজারি, সানন্দা, ঐ।
(৭) চোখের আঘাতজনিত সমস্যায় করণীয়, দৈনিক ইত্তেফাক, ১২/১২/১৯৯৪
(৮) আপনার চোখ, সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, অনাময় পাবলিশার্স, ৩৬৭ এলিফ্যানট রোড, ঢাকা-১২০৫। পৃষ্ঠা ৭৩।
(৯) চোখ ওঠা, ডা. আই. আই.এস.রায়, সানন্দা, ১২ জুলাই ১৯৯০, ৪র্থ বর্ষ ২৫ সংখ্যা।

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস

ডা. আলহাজ্জ মু. মনিরুল আলম

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এসোসিয়েশন এবং বার্ডেম (BIRDEM)-এর জরিপকৃত পরিসংখ্যানে প্রকাশ, বাংলাদেশে ২০ লক্ষের অধিক লোক বহুমূত্র অর্থাৎ ডায়াবেটিক রোগে ভুগছে। এ সংখ্যা নিখুঁত নয়। এভাবে ঘরে ঘরে জরিপ চালালে এ সংখ্যা আরও বাড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ডায়াবেটিস রোগ ও রোগীর এ হার নিশ্চয়ই আতঙ্কজনক। কারণ ১০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ২০ লক্ষ ডায়াবেটিক রোগী মানে প্রতি ৫০ জনে একজন।

এ রোগ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবার হতে পারে। তবে চল্লিশোর্ধ্ব মানুষেরা এর শিকার বেশি। তাই সবারই এ রোগ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা সমীচীন।

ডায়াবেটিক রোগ

রক্তে, পরবর্তীতে প্রস্রাবে শর্করা অর্থাৎ চিনির ভাগ বেড়ে গেলে বহুমূত্র রোগ হয়। প্রধানত প্রতি ১০০ মি.লি. রক্তে অভুক্ত অবস্থায় ১২০ মি. গ্রাম-এর উপর শর্করা জমলে তবেই প্রস্রাবে এ শর্করা ধরা পড়ে। এ জন্যে এ রোগের সর্বজনবিদিত নাম মধুমেহ। ডায়াবেটিস, বহুমূত্র, মধুমেহ একই রোগের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

ডায়াবেটিস সাধারণত দু'প্রকার ঃ ১. ডায়াবেটিস মেলিটাস, ২. ডায়াবেটিস ইনসেপিডাস। আমাদের বক্তব্য প্রথমোক্ত ডায়াবেটিস অর্থাৎ মধুমেহ বা ডায়াবেটিস মেলিটাস সম্পর্কে। কারণ, এটা শুধু ভুল নয় বরং জীবনের জন্য ধীর-বিষ (Slow poison) হিসেবে কাজ করে। একদিন জীবন প্রদীপ হঠাৎ নিভিয়ে দেয়।

ধারণা

অনেকে প্রস্রাবের আগে-পরে সাদা জাতীয় কিছু দেখে মনে করেন যে, প্রস্রাবে সুগার বা চিনি যাচ্ছে। আসলে প্রস্রাবের চিনি চোখে দেখা যায় না। আগে পরে বা প্রস্রাবের সাথে যা যায় তা অন্য জিনিস বা অন্য রোগের জন্য। তবে জমানো প্রস্রাবে কালো পিঁপড়া এলে প্রস্রাব পরীক্ষা করানো দরকার– কোনও সুগার বা বহুমূত্র রোগের নিদর্শন আছে কি না তা জানার জন্য।

ডায়াবেটিস-এর কারণ

ডায়াবেটিস একটি বিপাকজনিত ব্যাধি। সাধারণত অগ্নাশয় (Pancreas) নামক আমাদের পেট-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্গান (Organ) অর্থাৎ বিপাকীয় অন্ত্রের অসুস্থতা, অকার্যকারিতা, কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতা, অন্য রোগের কারণে শৈল্য চিকিৎসার ফলে এ অন্ত্রের ক্ষতি বা ধ্বংস ইত্যাদি কারণে আমাদের বিপাকীয় কাজের অপরিহার্য বিপাকীয় বা হজমী রস 'ইনসুলীন'-যা এ অগ্নাশয় কর্তৃক প্রস্তুত হয়- তার অভাব ঘটলেই বহুমূত্র অর্থাৎ মধুমেহ রোগ হয়।

ডায়াবেটিসপ্রবণ লোক

যে কোনও বয়সে, যে কোনও সময়ে যে কোন লোক ডায়াবেটিস-এর শিকার হতে পারে। তবে তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে এর প্রবণতা অত্যধিক।

ক. যাদের বংশের বা রক্তের সম্বন্ধের মধ্যে ডায়াবেটিস আছে তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে।

খ. মাত্রাতিরিক্ত ওজন ও মেদবহুল দেহধারী মানুষ।

গ. শারীরিক পরিশ্রম ও ব্যায়ামের অভাব। বিশেষ P জাতীয় লোক। যেমন ঃ P—পুলিশ, P—প্রফেসর বা অধ্যাপক, P—পলিটিশিয়ান বা রাজনীতিবিদ, P—Physician বা চিকিৎসক, P—Pupils—রাতজাগা পড়ুয়া শিক্ষার্থী প্রমুখের বেশি হয়।

ডায়াবেটিস সৃষ্টির পরিবেশ

১. শারীরিক স্থূলতা, ২. গর্ভাবস্থা, ৩. আঘাত, ৪. ক্ষত, ৫. অস্ত্রোপচার, ৬. মানসিক বৈকল্য, ৭. দুশ্চিন্তা, হতাশা, ৮. মানসিক বিপর্যয় বা আঘাত, ৯. চল্লিশ বা চল্লিশোর্ধ্ব বয়স।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ

৭টি—P, একটি R. ১. Polyurea— ঘন ঘন প্রস্রাব, ২. Polydypsia— ঘন ঘন পিপাসা, ৩. Polyphagia—ঘন ঘন ক্ষিধে, ৪. Physical Weight Loss যথেষ্ট ভুঁড়ি ভোজন সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া, চামড়া শুকিয়ে যাওয়া, ৫. Physical Feebleness and Tiredness—শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি, ৬. Peripheral Scabies—খোস-পাঁচড়া প্রভৃতি চর্মরোগ, ৭. Peripheral Neuropathy হাত-পা অবশ ও অনুভূতিহীনতা ও Eye Sight Loss—চোখে রক্ত বা ক্যাটার‍্যাকটজনিত কারণে দৃষ্টিশক্তিহীনতা।

প্রতিরোধ, প্রতিবিধান, প্রতিকার

ডায়াবেটিস একবার হলে সারানো কঠিন। সম্পূর্ণ সারানো যায় না কিন্তু এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এবং এটাই ডায়াবেটিস চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এ রোগের প্রতিরোধের জন্য ৪টা ডি (DDDD) অবশ্যই মানতে হবে। তবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সুনিশ্চিত এবং দীর্ঘায়ু লাভ সহজ হবে।

D—Diet Control— খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, D—Drugs ওষুধ, D—Discipline— শৃঙ্খলা, D—Daily Exercise and Walking— দৈনিক ব্যায়াম ও হাঁটা।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

যেহেতু রক্তে প্রয়োজনাতিরিক্ত ও অপরিপাককৃত শর্করা অর্থাৎ চিনি বৃদ্ধি তথা অসম খাদ্যই ডায়াবেটিসের প্রধান কারণ- শর্করাযুক্ত খাদ্য নিয়ন্ত্রণই ডায়াবেটিসের মোক্ষম ও প্রধান উপায়।

ডায়াবেটিস রোগীকে সুষম খাদ্য নিয়মিত ও সময়মত খেতে হবে। মিষ্টি জাতীয় খাদ্য যেমন চিনি, গুড়, খেজুরের রস, যে ফল পাকলে মিষ্টি হয়- কাঁঠাল, পাকা পেঁপে, পাকা কলা, পাকা আম, মিষ্টি ইত্যাদি বাদ দিতে হবে। একজন পূর্ণবয়স্ক কর্মব্যস্ত লোকের জন্য ২০০ ক্যালরী সমৃদ্ধ-

শর্করা- ৭১.৫ গ্রাম, আমিষ- ৭৪.০ গ্রাম, চর্বি- ৬৫.৮ গ্রাম।

খাদ্যই সুষম খাদ্যের উত্তম তালিকা। তবে মিশ্রি, চিনি, গুড় জাতীয় শর্করা সম্পূর্ণ বর্জনীয়। যে কোনও কারণে যদি কোনও মিষ্টি বা মিষ্টি ফল খাওয়া পড়ে ঐ মিষ্টি বা ফলে যে পরিমাণ শর্করা আছে সে পরিমাণ শর্করাসম্বলিত অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সেদিনের জন্যে খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। শস্য জাতীয় খাদ্য ও মাটির নিচের শাঁস ও মূলজাতীয় তরকারী না খাওয়া ভাল।

শৃঙ্খলা

ডায়াবেটিস রোগীকে অত্যন্ত সময় ও নিয়মানুগভাবে চলতে হবে। এ নিয়ম ও সময়ানুবর্তিতাই ডায়াবেটিস রোগীর বাঁচার উপায়- তথা জীবনকাঠি। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা মেনে চললে অনেক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসও নিয়ন্ত্রণে থাকে। শৃঙ্খলার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো প্রধান ঃ

১. নিয়মিত ও সুষম খাদ্য নিতে হবে।

২. নিয়মিত ও পরিমাণমত ব্যায়াম করতে হবে।

৩. ওষুধ ও চিকিৎসা যদি প্রয়োজন হয় তা নিয়মমত চালিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্রাদি- যদি থাকে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

৪. শরীর, জামা-কাপড়, বিছানাপত্র ও ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৫. পায়ের যত্ন নিতে হবে।

৬. নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা—দৈনিক অন্তত দু'বার ভোরে খালি পেটের প্রথম প্রস্রাব এবং দুপুরে খাওয়ার ২ ঘণ্টা পর- করতে হবে। প্রস্রাব পরীক্ষার ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য একটি ভাল খাতা তৈরী করে তাতে ফলাফল নিয়মিত লিখে রাখতে হবে।

৭. মিষ্টি সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে।

৮. শারীরিক যে কোনও অবনতি বা অসুবিধার কারণে সুচিকিৎসকের পরামর্শ বা নিকটস্থ ডায়াবেটিক সেন্টারে দেখা করতে হবে।

৯. একমাত্র ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ডায়াবেটিক রোগীর চিকিৎসা না করা।

মনে রাখতে হবে যে, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ব্যায়াম ও শরীর (Exercise and Walking)-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ওষুধ

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা সকল ডায়াবেটিস রোগীর জন্য অপরিহার্য। কিন্তু তাতে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না এলে কালবিলম্ব না করে রক্তে শর্করার আধিক্য অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শমত মৌখিক বড়ি বা ইনসুলিন (একমাত্র ইঞ্জেকশন) ইঞ্জেকশন নিতেই হবে। এ ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ ও প্রস্রাব পরীক্ষা নিয়মিতভাবে মেনে চলতে হবে।

অন্যান্য ভেষজ

উচ্ছে, কাঁচা রসুন, প্রচুর পানি ফলদায়ক।

পরিণতি

উপরোক্ত চারটি 'D' না মানলে ডায়বেটিস রোগীর গুরুতর পরিণতি অবধারিত।

অগ্রপথিক। নভেম্বর ১৯৮৭

গর্ভিনীর শুশ্রূষা

ডা. খোদেজা বেগম

গর্ভবতী মায়ের শুশ্রূষা কেন ? যে নতুন মুখটি এ পৃথিবীতে আসছে, যে একদিন দেশ ও জাতির বিরাট খেদমতে আত্মনিয়োগ করবে, তার জন্য একজন গর্ভবতী মায়ের শুশ্রূষা করা এবং সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর থেকে আরম্ভ করে গর্ভোত্তরকাল পর্যন্ত তার স্বাস্থ্যের যথার্থ যত্ন নেয়া অপরিহার্য। বিবাহিত জীবনে মেয়েদের মা হওয়া মানে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটা। আর সে আশা ফলপ্রসূ হয় যদি উপযুক্ত সময়ে প্রকৃতভাবে গর্ভবতী মায়ের সেবাযত্ন নেয়া হয়। আমাদের দেশে মেয়েরা পুঁথিগত বিদ্যার অগ্রবর্তী হলেও অনেকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ সময়টায় যত্ন নেয়াকে নেহায়েত অপ্রয়োজন বলে মনে করে, যার জন্য সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর চৈতন্যোদয় হলে এ সময়ে প্রকৃত ক্ষতির মাশুল দেয়া সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। একজন গর্ভবতী মা হচ্ছেন সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি তথা চাবিকাঠি—দেশের সম্পদ। তার প্রতি যদি এভাবে অবহেলা প্রদর্শিত হয় তাহলে সমস্ত জাতিকেই এর খেসারত দিতে হয়। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান হতে আমরা যা কিছু শিখতে পেরেছি তার চাইতেও সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহ্ আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত– সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করে আমাদের আলোকোজ্জ্বল জ্ঞান ও বোধশক্তি দিয়েছেন। এর বদৌলতে আমরা নিজেদের জীব-জন্তু থেকে আলাদা করে অনেক উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। এরপরও যদি আমরা ভুল করি এবং এ গুরুদায়িত্বকে অবহেলার চোখে দেখি তা হলে এর খেসারত আমাদের হয়ে আর কেউ বহন করবে না।

গর্ভবতী পরিচর্যাকে ইংরেজিতে বলে এন্টিনেটাল কেয়ার। এ অবস্থায় ভাল পরিচর্যার অভাবে রক্তহীন, তা তড়কা, অতিরিক্ত বমি, গর্ভস্রাব ও রক্তস্রাব প্রভৃতি কারণে বহু প্রসূতির মৃত্যু হয়।

প্রসূতির খুব সাবধানে থাকা দরকার। অনুমান করা হয় আমাদের বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় চার লক্ষ গর্ভপাত হয় আর ত্রিশ হাজার স্ত্রীলোক সূতিকা-সংক্রান্ত রোগে মারা যায়। সাবধান হলে গর্ভরক্ষা করা যায়। গর্ভবতীর খাওয়া-পরা, পরিশ্রম, ঘুম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, মনের অবস্থা এ সমস্ত বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক—

যাতে গর্ভাবস্থায় রোগগুলো না হয় তারও ব্যবস্থা করা দরকার। সময়মত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

যা সহজে হজম হয় অথচ যাতে বেশি পুষ্টি বিদ্যমান এমন খাদ্য খেতে দেয়া উচিত। যেমন ঃ ঢেঁকিছাঁটা চালের চিন্তা করা অবান্তর তবুও চেষ্টা করা ভাল। ফ্যান না ফেলে ভাত রাঁধলে প্রসূতির জন্য অমোঘ মহৌষধ। মাছের ঝোল, মুগের কিংবা মশুরীর ডাল, পটল কি ডুমুরের তরকারী, মোচার তরকারী কিংবা ভর্তা খুবই উপকারী। দুধ, ঘি ও মাখনের তো তুলনাই নেই। ডিম, মাংস এ অবস্থায় শ্রেয় নয়। পোয়াতি সব সময় টাটকা জিনিস খাবে। বাসি মাছ তরকারীর মত বিষ আর নেই।

পেয়ারা, কলা, লেবু, আনারস, বেল, পেঁপে, আঙুর, নাসপাতি, আম-জাম, খেজুর, কিসমিস্ যখন যা ভাল পাওয়া যায় খেতে দেয়া উচিত। দুধ, ঘি, মাখন, টাটকা ফলমূল, শাক-সবজির ভিতর 'ভিটামিন' বলে একরকম পুষ্টিকর জিনিস থাকে। ঐসব প্রত্যহ খেতে দেয়া উচিত। আস্ত মুগছোলা, মটর, অল্প ভিজিয়ে রাখলে তা থেকে যখন অঙ্কুর গজায় তখন এতে বেশি 'ভিটামিন' থাকে। বাজারের বাজে খাবার না দিয়ে অঙ্কুরিত ছোলা, মটর প্রভৃতি আদা ও গুড় দিয়ে খেতে দিলে ক্ষিধে বাড়ে, পুষ্টি হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

টাটকা মুড়ি নারিকেলও ভাল। আজকাল চর্বি মেশানো বিস্কুট প্রভৃতি নরম জিনিস খেয়ে শক্ত জিনিস কেউ খেতে চায় না। তাই দাঁত-মাড়ী, গালের মাংসপেশী তেমন শক্ত ও পুরু হয় না। তাই অকালে দাঁত পড়ে যায়।

কেউ কেউ মনে করে পোয়াতির দুজনের খাবার খেতে হয়। এটা নিয়মিত ভুল। গর্ভের শেষ ২/৩ মাসে সন্তান বাড়ে– এ সময় অতিরিক্ত এক গ্লাস দুধ খেলেই যথেষ্ট। একসঙ্গে খুব খাওয়া যাবে না। রাতে গুরু আহার কিংবা অনেকক্ষণ পেট খালিও রাখা ঠিক নয়। ঘুম থেকে উঠেই কিছু খাওয়া উচিত। এমনকি সকাল বেলা শরীর ম্যাচ ম্যাচ করে বিছানা থেকে উঠে আগেই দুধ খাওয়া উচিত। একরকম জিনিস না খেতে দিয়ে মাঝে মাঝে খাবার বদলানো আবশ্যক। পরিষ্কার এবং সেখানে সহজে বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় বসে খাওয়া উচিত। খাওয়ার ঠিক পরেই কোনও রকম কঠিন পরিশ্রম করা যাবে না। ঘুমালে হজম হতে দেরী হয়, খাবার পর গোসল করলে ও খাদ্য খাওয়ার সময় কি তার ঠিক পরে কোনও চিন্তা, দুঃখ বা রাগ করলে অজীর্ণ হয়। এসব নিয়ম মানলে কোনদিনও কঠিন অসুখ হবে না, গর্ভবতী মায়ের মনে রাখা উচিত তাদের ব্যবহারের দরুন যেন কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না হয়। পেটে অসুখ হলে অনেক সময় গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভাবস্থায় প্রস্রাব খোলাসা রাখার জন্য জলীয় জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন। রাতে যদি পাঁচ পোয়ার কম প্রস্রাব হয় তাহলে মনে করতে হবে পানি কম খাওয়া হচ্ছে। দুধ ঘোলে পানিতে মধুশুদ্ধ অন্তত প্রতিদিন ৩/৪

সের তরল জিনিস খাওয়া দরকার। চা পান না করা ভাল। গম ভেঙে গুঁড়ো করে চায়ের মত করে খেলে বেশী উপকার হয়।

পোশাক

পরনের কাপড় খুব ঢিলা করে পরিধান করা ভাল। অন্যথায় কাশি, প্রস্রাবের অসুখ হতে পারে। যারা জুতো মোজা পরে তাদের পা বেশীক্ষণ বেঁধে রাখা উচিত নয় এবং উঁচু হিলের জুতা পরাও ঠিক নয়। তাতে পায়ের শিরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে কিংবা ফুলো বাড়তে পারে। আঁটসাঁট পোশাকের দরুন স্তনের বোঁটা চ্যাপ্টা হয়ে যায়। ভিতরে ঢুকে যায়। দুধের বোঁটা শিশু অনেক সময় জোরে টানে বলে, টাটায়, ঘা হয় এবং ফেটে যেতে পারে ও পরে রক্ত পড়ে।

পরিশ্রম

গর্ভবতীকে নিয়মিত স্বাভাবিক পরিশ্রম করতে হবে। যে সব পোয়াতি কেবল বসে বসে কাল কাটায় তাদের প্রসবে খুব কষ্ট হয়। ঘরের যে কোনও কাজ করলেই যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। কাজ করার লোক থাকলেও নিজের উপকারের জন্য একটা না একটা কাজ করা চাই। উল বোনার কাজ কিংবা সেলাই করা এসব বসার কাজ নয়, একটু যাতে নড়াচড়া হয় কিংবা হাত পা চলে এরূপ কাজ করতে হবে। প্রতিদিন অন্তত ২/৩ ঘন্টা ঘরের বাইরে খোলা বাতাসে চলাফেরা করা উচিত। যাদের কোনও কাজ-কাম নেই তাদের বাগানে, ছাদে বা উঠানে পায়চারি করে বেড়ানো উচিত। কোন কারণে বেশিদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হলে ভাল করে হাত পা ডলানো উচিত। গর্ভবতীর পক্ষে বেশি উঁচু সিঁড়ি উঠানামা করা বা বেশি ভারী জিনিস তোলা নিষেধ। বার বার গাড়ী চড়া, লাফান, ঝাঁপান, দৌড়াদৌড়ি করা একেবারে নিষেধ। পোয়াতিকে কোথাও পাঠাতে হলে সাড়ে চার মাসের পর আর প্রসব সম্ভাবনার ১ মাস আগে পাঠানো উচিত। সাড়ে চার মাসের আগে ভ্রুণ আলগা থাকে। নড়াচড়া পেলে গর্ভ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। গর্ভের পূর্বে যে সময় ঋতু হতো সে সময় বিশেষ সাবধানে থাকা দরকার। কারণ সে সময় অনেক পোয়াতির, বিশেষত বাধক রোগীনীদের গর্ভপাত হবার আশংকা থাকে। গর্ভাবস্থায় পায়ে সেলাই মেশিন চালানো ঠিক না। এতে পা ফোলা বাড়ে, পেটে ও পায়ে ব্যথা হয়, পায়ের শিরা ফুলে যায়।

ঘুম

ঘুমের সম্বন্ধে নিয়ম পালন করতে হবে। পোয়াতিকে রাত জাগা উচিত নয়। ১৬/১৭ বছরের পোয়াতির ১০ ঘন্টা ঘুমের দরকার। রোজ একসময়ে ঘুম চাই। গর্ভাবস্থায় স্বামী থেকে স্বতন্ত্র থাকা উপকারী। তা না হলে গর্ভপাত হওয়ার আশংকা থাকে। শোবার ঘরে খুব পরিষ্কার বাতাস খেলবে, এতে মায়ের রক্ত পরিষ্কার হবে, সেই রক্ত সন্তানের গায়ে চলাচল করবে। রাতে জানালা দরজা খোলা রাখতে হবে যাতে

মুক্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। তা না হলে উভয়ের ক্ষতির আশংকা। শোবার সময় কোনও দুশ্চিন্তা যেন না থাকে, এতে ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা বিশেষ প্রয়োজন। প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে ঘাম এবং শরীরের দূষিত পদার্থ বের হয়। রীতিমত গোসল না করলে লোমকূপের মুখ বন্ধ থাকার দরুন ভেতরে দূষিত পদার্থ বের হওয়ায় বিঘ্ন ঘটে, এতে নানা রকম কঠিন পীড়ার উৎপত্তি হয়। গর্ভাবস্থায় শরীরের ভেতর অনেক দুষিত পদার্থের সৃষ্টি হয়। এর সময় বেশি বেশি প্রস্রাবের সাথে এবং শরীরের ঘামের সাথে এই দূষিত পদার্থ নির্গত হয়। তাই নিত্য গোসল করা অতীব প্রয়োজন, যাতে লোমকূপের গোড়া পরিষ্কার থাকে।

স্তনের যত্ন

স্তনের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া আবশ্যক। গর্ভের শেষ কয়মাসে স্তনের বোঁটা দিনে ৫/৭ বার ঠাণ্ডা পানি দিয়ে মুছে মাখন লাগিয়ে রাখতে হবে। বোঁটার চামড়া পুরু খসখসে হলে ফাটার আশংকা থাকে। তাই মাখনই ভাল। বোঁটা যদি স্তনের ভেতর ঢুকে যায়। প্রতিদিন অনেকবার বোঁটা টেনে তুলতে হবে। মাঝেমধ্যে স্তনের নিচ থেকে বোঁটার দিকে আস্তে আস্তে মুছে তুলতে হবে। এরূপ করলে প্রসবের পর দুধ আসে। বর্তমানে মায়ের দুধই সন্তানের একমাত্র সম্বল। তাই খুব যত্ন সহকারে ভবিষ্যতের সন্তানদের রিজিকের জন্য হুঁশিয়ার থাকা প্রত্যেক মায়ের গুরু দায়িত্ব। গমের চোকলের মত স্তনের বোঁটায় যা লেগে থাকে– তা যদি সহজে না ওঠে তবে ফোটানো নারিকেল তেল দিয়ে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তা না হলে পরে বোঁটা ফেটে রক্ত পড়তে পারে।

দাঁত

গর্ভাবস্থায় থুথু অম্ল হয়– তাই দাঁত প্রায়ই নষ্ট হয়। ফল এবং শাক-সব্জি বেশি করে খাওয়া উচিত। এতে দাঁত নষ্ট না হওয়ার প্রতিষেধক ক্ষমতা বর্তমান থাকে। প্রতিবার খাবারের পর দাঁত ভাল করে পরিষ্কার করতে হবে– যাতে খাদ্যের কণা দাঁতের ফাঁকে জমা না হয়– তা না হলে দাঁতের গোড়ায় পচন ধরে– অকালে দাঁত পড়ে যায়। হাদীস শরীফেও প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করে অযু করে নামায পড়লে সাধারণ নামায পড়া থেকে ৭০ গুণ বেশি সওয়াবের নির্দেশ রয়েছে।

প্রস্রাব পরীক্ষা

তিন মাস থেকে সাত মাস পর্যন্ত মাসে একবার তারপর প্রসব পর্যন্ত মাসে দুবার প্রস্রাব পরীক্ষা করানো উচিত। প্রথম পোয়াতির কোনও উপসর্গ না থাকলেও প্রস্রাব পরীক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। আর বহু সন্তানবতীর হাত পা ফোলা থাকলে অবশ্যই শীঘ্র প্রস্রাব পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

মানসিকতা

মনের অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখা দরকার। ভয় ভাবনা হয় এমন কোনও কাজ করতে, গল্প শুনতে বা পড়তে দেয়া উচিত নয়। ভীতিপূর্ণ বা উত্তেজনাপূর্ণ কোনও দৃশ্য দেখা অনুচিত। রাতে একা যেতে দেয়া ও কোনও পোয়াতির মৃত্যু দৃশ্য দেখতে দেওয়া অনুচিত। সব সময় উৎসাহ এবং যাতে আমোদ থাকে সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

ওজন পরীক্ষা

ওজন পরীক্ষার প্রয়োজন ৪র্থ মাস থেকে। বিশেষ কোনও রোগ না থাকলেও যদি ওজন কমে এবং তা যদি প্রসব সম্ভাবনার ১ হতে ৫ দিনের মধ্যে হয় তা হলে প্রসবের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

রক্তের চাপ পরীক্ষা

রক্তের চাপ পরীক্ষা কারানোও আবশ্যক। গর্ভের পাঁচ মাস থেকে তা শুরু করতে হবে। রক্তের চাপ যদি স্বাভাবিক থেকে বেশি থাকে তবে সময়মত চিকিৎসা করতে হবে। আমাদের দেশে প্রায়ই অধিক রক্ত চাপের দরুন এক্লমশিয়া হয়ে প্রসূতি এবং শিশু উভয়েই প্রাণ হারায়। পর পর ফিট হওয়ার দরুন বুঝতে না পেরে মনে করে ভূতে পেয়েছে, তার জন্য সময় মত চিকিৎসা না করার দরুন অকালে নিঃশেষ হয়ে যায় দু'টি প্রাণ।

উপরোক্ত নিয়ম-নীতি অবলম্বনে আপনিও স্বাস্থ্যবান সুন্দর নতুন মুখ উপহার পেতে পারেন।

অগ্রপথিক। নভেম্বর ১৯৮৭

রোযায় পেপটিক আলসারভীতি বিজ্ঞান ও ইসলামী দৃষ্টিতে সমাধান

ডা. এইচ. এম. এ. আর. মামুনূর রশীদ

মাহে রমযানের রোযা-প্রত্যেক বালেগ মুসলমান নর-নারীর জন্য অবশ্যকর্তব্য। দুঃখের বিষয়, এ বরকতপূর্ণ ও কল্যাণময় রোযা বিপুল সংখ্যক জনগণ পেপটিক আল্‌সারভীতির কারণে রাখেন না। আমি ডাক্তার হিসাবে এ বিষয়টি যখন বিজ্ঞান ও ইসলামের দৃষ্টিতে দেখি তখন দেখতে পাই যে, রোযা পেপটিক আলসার সৃষ্টি করে না।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "তোমরা যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হ'ল যেমন করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৩ আয়াত)

রমযান শরীফের রোযা পাগল ও নাবালেগ ব্যতীত নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, অন্ধ-বধির-শ্রমিক সকলের উপর ফরয। শরীয়তে বর্ণিত ওযর ব্যতীত রমযানের রোযা না রাখা কারো জন্য বৈধ নয় (বেহেশতী জেওর, পৃষ্ঠা ২৫২)। এ আয়াতে কারীমা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল মাহে রমযানের গুরুত্ব এবং ঠুনকো ওজর আপত্তিতে রোযা ছাড়া যাবে না।

বাংলাদেশের কয়েকজন উচ্চপদস্থ গবেষক-ডাক্তার রোযার উপর যে গবেষণা চালান তার বিবরণ ও গবেষণার ফলাফল বর্ণনা করা হলো ঃ পাকস্থলির এসিড– ১৯৫৯ সালের রমযান মাসে ৭ জন রোযাদার ও ৫ জন বেরোযাদার ভলান্টিয়ারের পাকস্থলির এসিড (Hcl) পরীক্ষা করা হয় (Gastric Juice Analysis)। রোযার আগে ও পরে বেরোযাদার কন্ট্রোলদের এসিড প্রায়ই অপরিবর্তিত থাকে, কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। রোযাদারদের সংখ্যা কম বলে দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৮ জন ভলান্টিয়ারের উপর পরীক্ষা চালানো হয়। উভয় পর্যায়ে মোট ২৫ জন রোযাদারের এসিড ১৭ জনের স্বাভাবিক (Isochlorhydria), ৭ জনের বেশী (Hypochrlorhydric) এবং ১ জনের কম (Hypochlorhydria) ছিল। রোযার মাসে চতুর্থ সপ্তাহে এদের এসিড দাঁড়ায় ২০ জনের স্বাভাবিক আর ৫ জনের বেশি। ৭ জনের বেশি এসিড রোযা শেষে ৭ জনের স্বাভাবিক হয়ে যায় ও ২ জনের বেশিই থাকে। তবে ১৭ জনের

স্বাভাবিক এসিড রোযা শেষে ১৪ জনের এসিড স্বাভাবিক থাকে আর ৩ জনের এসিড বাড়ে। একজনের কম এসিড রোযা শেষে স্বাভাবিক হয়। সুতরাং রোযায় এসিড বৃদ্ধির তুলনায় হ্রাস পায় অনেক বেশি।

পাকস্থলির এসিড ঃ কেউ কেউ মনে করেন যে, রোযায় পাকস্থলির এসিড (Gastric Hcl) বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে পাকস্থলির বা ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথমাংশে (Doudenum) ঘা (Peptic Ulcer) হতে পারে। বর্তমান গবেষণায় একথা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তা ছাড়া এরূপ ধারণা শারীরবিদ্যারও বিপরীত। রোযায় পেপটিক আলসার হয় বলে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণও নেই।

এবার ডাঃ ক্লীভ সাহেবের গবেষণার দিকে দৃষ্টি দেই। তিনি Peptic Ulcer নামক একটি গবেষণামূলক পুস্তকে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এ রোগ অনেক কম অথচ দক্ষিণ ভারত, জাপান, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় এ রোগ অত্যন্ত বেশি। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় মুসলমান ও মালয়েশিয়ার মালয়ী মুসলমানদের তুলনায় ঐসব দেশের চীনাদের মধ্যে এ রোগ বেশ কয়েকগুণ বেশি। এ ছাড়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান ও জাপানী বন্দী শিবিরের অনাহারক্লিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কারো Peptic Ulcer বা Ulcer ছিদ্র হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। ডাঃ ক্লীভ জোর দিয়ে বলেন, 'Fasting does not produce organic disease' (দেখুন Cleave T. L. (1962) Peptic Ulcer, John Wright & Sons Ltd. Bristol. p-93.)

পেপটিক আলসারে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কথা

পাকস্থলি এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ ডুয়োডেনাম-এর মিউকোসাতে 'ঘা'কে পেপটিক আলসার বলে। এ ছাড়াও ওসোফেগাস (Oesophegus), জেজুনাম (Jejunum) এবং মেকেলস্ ডাইভারটিকুলাম (Meckels Divertoculum) এ 'ঘা' হতে দেখা যায়। ডুয়োডেনাম আলসার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এটা পাকস্থলির আলসার থেকে ২-৩ গুণ বেশি পাওয়া যায়। ডুয়োডেনামের আলসার মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের বেশি হয়। যার অনুপাত ১ ঃ ৪। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের পাকস্থলিরও ডুয়োডেনাম আলসার উভয়ই হতে দেখা যায়।

পেপটিক আলসারের কারণ

০ যখন এসিড ও পেপসিন (Acid and pepsin) মিউকোসার প্রতিরোধের (Mucosal defence) মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকে না তখন এ রোগের সৃষ্টি হয়।

০ হেলিকোব্যাকটোর পাইলোরি (H. Pylori) এ রোগের জন্য দায়ী।

০ বংশগত– যারা ব্লাড গ্রুপ 'ও' এন্টিজেন (Blood group 'O' antigen) ক্ষরণ গ্যাসট্রিক রসে ভরেন না।

০ ধূমপায়ী।

০ ক্ষতিকর ওষুধ সেবন। বিশেষ করে এসপিরিনজাতীয় ওষুধ।

০ অন্যান্য কারণ।

পেপটিক আলসারের লক্ষণসমূহ

এ রোগে প্রায়ই হয়ে অজীর্ণ থাকে কিন্তু নাভীর উপরে (Epigastric region)-এ ব্যথাই এ রোগের প্রধান লক্ষণ। রোগী এক আঙুল দিয়েও ব্যথার এলাকা দেখাতে পারেন। এটা রোগ নির্ণয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডুয়োডেনাম আলসার রাতে বেশি হয়, অবশ্য দিনেও হয়ে থাকে। যখন রোগী ক্ষুধার্ত হয় তখন ব্যথা ওঠে। বমি বমি ভাব অথবা বমি হয়। বমি হলে ব্যথা কমে যায়। অনেক সময় পাকস্থলি থেকে এসিড উঠে আসার ফলে জ্বালা-পোড়া অনুভূতি আসে। এটাকে হার্টবার্ন (Heart burn) বলে। অরুচি এবং ওজন কমে যাওয়া গ্যাসট্রিক আলসারের লক্ষণ।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

১. এনডোসকোপি ঃ (Endoscopy) : এ পরীক্ষার সাহায্যে এ রোগ সহজেই নির্ণয় করা যায়। এ যন্ত্রের সাহায্যে বায়োপসি (Biopsy) নেওয়া যায়, যা রোগের কারণ নির্ণয় করতে সহায়ক হয়।

২. বেরিয়াম মিল X-ray : এ X-ray-র সাহায্যে পাকস্থলি ও ডুয়োডেনাম ঘা ধরা পড়ে।

চিকিৎসা

এন্টাসিড (Antacid) জাতীয় ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এসিড কমানোর জন্য ওমিপ্রাজল (Omeprazol) এবং রেনিটিডিন (Ranitidin) বহুল ব্যবহৃত হয়। ক্ষত পূরণের জন্য সুক্রালফেট (Sucralfate) একটি ভাল ওষুধ।

আমরা পূর্বেই পেটের ব্যথার কারণ হিসাবে ধূমপান লক্ষ করেছি। বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ধূমপান ক্ষত শুকাতে দেয় না এবং এ রোগ বার বার হওয়াকে ত্বরান্বিত করে। ধূমপান এসিড ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয় এবং অগ্নাশয় (Pancreas)-এর বাইকার্বোনেট ক্ষরণ হতে বাধা দেয়, যার ফলে পেটে ঘা হয় (Robbin and Kumar, Barsic Pathology, 4th Edition, p-517)

বাংলাদেশের মানুষসহ পৃথিবীর সবদেশেই ধূমপান করা যায়। সম্প্রতি দেখা গেছে, ধূমপানের ফলে বিভিন্ন রোগ হওয়ার জন্য উন্নত দেশে এটার হার কমে এসেছে অথচ অনাহারক্লিষ্ট অস্বাস্থ্যবান বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে এ হার বেড়ে চলেছে। সুতরাং পেপটিক আলসার থেকে মুক্তি পেতে হলে ধূমপান অবশ্যই ছাড়তে হবে।

পেপটিক আলসারের আর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ক্ষতিকারক ওষুধ সেবন। এসপিরিন এবং এ জাতীয় ওষুধ যা মাথাধরা, বাত রোগে সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

এসপিরিন, ফিনাইলবুটাজোন (Phenylbutazone), ইনডোমিথাসিন (Indomethacin), আইবুপ্রোফেন (Ibuprofen), পাইরোক্সিকাম (Piroxicam)। এছাড়াও স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ (Steroid) সেবনে পেটের আলসার বেশি হয়। রক্তক্ষরণ (Haemorrhage), কালো পায়খানা (Malaene) এবং শেষে নাড়ী ছিদ্র হয়ে (Perforation) যায়।

পেটব্যথার রোগী ও রোযা ঃ যাঁরা পেটব্যথায় ভোগেন এবং রোযা রাখলে ব্যথা বৃদ্ধি হবে ভাবেন, তাদের জন্য ফয়সালা এই যে, তাঁরা ধূমপান বন্ধ করবেন। ক্ষতিকারক ওষুধ সেবন করবেন না। ডাক্তার সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলে দেবেন যে আপনার পেটে ক্ষতিকারক আলসার (Active ulcer) আছে কি না। Endoscopy এ পরীক্ষার জন্য বেশ ভালো। যদি Active ulcer না থাকে তবে অতি সাধারণ ওষুধ খেলে ভালো হয়। তাদের রোযা রাখাতে কোন অসুবিধা নেই, যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং রোযার জন্য গ্যাসট্রিক বেড়ে যাবে– এ অহেতুক ভয়ভীতি মন থেকে বের করে দিয়ে রোযা রাখবেন। আর যাদের পেটে Active Ulcer আছে তাদের রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে কুরআনিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছি। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারায় আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে বলেছেন, "যদি তোমাদের কেউ অসুস্থ হও বা ভ্রমণে থাকো তবে সে (রোযা না রেখে) পরে (সুস্থ হয়ে) সেই রোযাগুলির কাযা আদায় করবে। (২ ঃ ১৮৪) পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন– আল্লাহ্ তোমাদের কোনও কঠিন দায়িত্ব দিতে চান না বরং দায়িত্ব সহজ করে দিতে চান। (২ ঃ ১৮৫)

যাদের পেট Peptic Ulcer তাজা এবং খালি পেটে খুব ব্যথা হয় তাদের রোযা রাখা উচিত নয়, কারণ তারা অসুস্থ। তাদের ঘন ঘন Alkali/Antacid বা অন্যান্য ওষুধ খেতে হয়। ওষুধ না খেলে Peptic Ulcer Perforation হয়ে যেতে পারে এ অবস্থায় রোযা না রেখে এর কাযা পরে আদায় করে নেবেন। যদি রোগ দুরারোগ্য হয় তবে ফিদইয়া দেবেন।

একজন দীনদার ডাক্তার যদি সার্টিফিকেট দেন যে আপনার পেটে মারাত্মক 'ঘ' (Active Ulcer) আছে, তা হ'লে রোযা ছাড়া জায়েয হবে। যদি ডাক্তার কাফির (অমুসলিম) হন অথবা এমন মুসলমান হন যে, তিনি দীন ইসলামের ঈমানের পরওয়া করেন না, তবে তাঁর কথায় রোযা ছাড়া যাবে না (বেহেশতি জেওর, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৫)।

অগ্রপথিক। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮

ক্যান্সার হতে বাঁচার উপায়

ডাক্তার আবদুল মালেক

ক্যান্সার এইডস গোটা মানব জাতির জন্য আজ এক মহাঅভিশাপ। এইডস অবশ্য আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে না– কিন্তু ক্যান্সারে শতকরা চল্লিশভাগ রোগী এখন মারা যাচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানী বন্ধুদের আন্তরিকতা ও মানবপ্রেম থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের উপর এই অভিশাপ তা কি জানা বা বোঝার প্রয়োজন নেই ? চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কেমো-থেরাপী, রেডিও-থেরাপী– যত চিকিৎসা কৌশল বা প্রযুক্তি মানব সমাজকে উপহার দেয়া হচ্ছে রোগীর মৃত্যুকে তত দ্রুত যেন এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাই এক সুরে আওয়াজ তুলছেন ঃ 'ক্যান্সার হ্যাজ নো আন্সার'– অর্থাৎ ক্যান্সার হয়ে গেলে তার আর কোন চিকিৎসা নেই।

ক্যান্সার কি ? ক্যান্সার কেন হয়– কারণ কি ? ক্যানাসারের আরোগ্যকারী ওষুধ বা ক্যানাসার না হওয়ার জন্য তার কি কোন প্রতিষেধক নেই ? এ নিয়ে আজকার এই কটি কথা। ক্যান্সার যাতে না হয়– হলেও রোগীকে যাতে বাঁচানো যায়, তার জন্য সাধারণ মানুষকে, রোগী বা রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে, রোগীর চিকিৎসককে মৌলিক কথাগুলো জানতে হবে– অন্যথায় চিকিৎসার জৌলুস দিয়ে, রোগীর টাকার প্রাচুর্য দিয়ে রোগীকে বাঁচানো যায় না। সাধারণ মানুষকেও বেহুদা অর্থের অপচয় করে পুষ্টিকর খাদ্য খেয়ে আর দামী দামী ওষুধ সেবন করে মৌলিক তত্ত্ব না পেলে ক্যান্সারের হাত থেকে বাঁচা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন রোগের পরিণতিতে যখন আর রোগ নির্ণয় হয় না– কোন ওষুধ নির্বাচনের লক্ষণও পাওয়া যায় না, যখনই ঐ যন্ত্রণাবহুল অবস্থাকে ক্যান্সার বলা হয়।

ক্যান্সার কি ?

বংশগত কারণে অথবা অর্জিত রোগের জন্য– হাইয়ার এন্টিবাইওটিক এর অসম্পূর্ণ চিকিৎসা, হাতুড়ে বা চাপা দেয়ার চিকিৎসার কুফল হিসেবে, বিবিধ রোগের পরিণতিতে মানসিক অশান্তি, অস্বস্তির ফলে ঘুম, খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির অনিয়ম শরীরের জীবকোষগুলো এলোপাথাড়িভাবে জড় হতে থাকে, বহুদিন ধরে যে অঙ্গে যিনি বেশী দুর্বল সে অঙ্গেই জীবনকোষ জড় হতে থাকলে অর্বুদ বা টিউমার গঠিত হয়।

টিউমার দিন দিন বেড়েই চলে– টিউমার বাড়ার সাথে সাথে তাদের মন ও শরীর দিন দিন ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে থাকে এবং জীবনীশক্তি লয় পেতে থাকে এবং টিউমারে আস্তে আস্তে বেদনা এবং জ্বালা যন্ত্রণা দেখা দিতে থাকে। এমন অবস্থায় যদি কেউ টিউমারের ব্যথা-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সার্জনের চাকু বা চিকিৎসকের 'কেমো-থেরাপী' বা 'রেডিও-থেরাপী'র আশ্রয় নেন– হয়ত সাময়িকভাবে জ্বালা যন্ত্রণা, ব্যথা-বেদনা কমতে পারে– কিন্তু টিউমার অবস্থায় যে কোষগুলো এলোমেলো জট বেঁধেছিল তা ঐ যান্ত্রিক নিপীড়নে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত শরীর তখন ক্যান্সার কোষ ভর্তি হয়ে যায়। লয়-প্রাপ্ত জীবনীশক্তি তখন আর জীবকোষকে তাজা রাখতে সক্ষম হয় না। দেহে জীবনীশক্তি হারিয়ে প্রাণ-শক্তিকে আর ধরে রাখতে পারে না।

পূর্বেই বলেছি যে, অঙ্গ যার যত বেশি দুর্বল– জীবনীশক্তি সে অঙ্গে পরাজিত হয়ে তার সম্পর্ক ছেড়ে দেয় এবং সে অঙ্গে বা অংশে ক্যান্সার হয়েছে বলে অভিহিত করা হয় বিভিন্ন নামে– কাসিনোমা, এমনগোমো, ফিব্রোমা, অটিওমা, লিপোমা, স্টিওটোসা, মায়োমা, সারকোমা, সিস্টোমা, এসেরোমা ইত্যাদি। গলায় বা কণ্ঠে যে দুর্বল– একটুতেই যার টনসিল ফুলে ওঠে, একটুতেই যার স্বর বসে যায়– তার ফেরিংগাইটিস হতে পারে– অনিয়ম ও বংশগত বা অর্জিত দোষ প্রবল হলে ক্যান্সারও হতে পারে। এভাবে লিভারে হলে 'সিরোসিস অব লিভার,' হাড়ে ক্ষয় দেখা দিলে ওস্টিওমা, লাঙ্গে, স্তনে, জিহ্বাতে, ঠোঁটে, ব্রেনে– সর্বতোভাবে যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিভিন্ন নামে দেখা দিতে পারে। নামে আসে যায় না– স্মরণ রাখতে হবে, জীবনীশক্তির সঙ্গে ঐ অঙ্গের বিচ্ছিন্নতা আরম্ভ হয়ে গেছে।

ক্যান্সারের কারণ

ক্যান্সার বা যে কোন জটিলরোগের কারণ চিন্তা করলে এ দুনিয়ার সৃষ্টি-তত্ত্বের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব ভেসে ওঠে। কোন কিছুর আদি বা অন্ত নেই। সবই যেন বীজাঙ্কুরের মত–বীজ হতে বৃক্ষ, আবার বৃক্ষ হতে বীজ। কে কার কারণ কেউ তা জানে না। যেমন মেঘ হতে বৃষ্টি, আবার বৃষ্টির পানি গড়িয়ে সাগরে– সাগরের পানি বাষ্পাকারে মেঘ। মন পঙ্কিল হলে দোষের সৃষ্টি হয়– আবার দোষই মনে পঙ্কিলতা আনে। এভাবে চলছে চক্রাকারে দিন ও রাত। রাতের অন্ধকার না হলে দিনের আলোর কোন মূল্য নেই। সুখ-দুঃখ স্বাস্থ্য ও রোগ যন্ত্রণা। রোগ যন্ত্রণা আছে বলে স্বাস্থ্যের জন্য মানুষের এত হাহাকার। দুয়ের মধ্যে যে কোন একটার অনুপস্থিতিতে অন্যটার মূল্যবোধ হৃদয়ঙ্গম হয়। ক্যান্সারের কষ্ট-যাতনা এক ভয়াবহ অভিশাপ। এই ভয়াবহ অভিশাপ থেকে রেহাই পেতে, স্বাস্থ্য ফিরে পেতে, সুখী সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে সত্যিকার আরোগ্য নীতির অনুসন্ধানে এ প্রয়াস। ৩০/৩২ বছর আগেও ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ছিল খুব কম। এন্টিবাইওটিক ওষুধ, পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধ ও ইনজেকশনের পূর্ব যুগে

ক্যান্সারের প্রায় নামগন্ধই ছিল না। ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর, টাইফয়েট, যক্ষা, গনোরিয়া সিফিলিস, প্লেগ প্রভৃতি রোগ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের বদৌলতে বীজাণু-বিধ্বংসী ওষুধ আবিষ্কারে দেশ হতে তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে– খুব ভাল কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে পীড়াগুলো তো আর মশা মাছি নয়, এমনি তাড়ালেই উড়ে গেলো– আর রোগী সেরে গেলো। মানুষের দেহটাই আসল মানুষ নয়– আসল মানুষ তার প্রাণবৃত্তি এবং জীবনীশক্তি। মানব-শরীর দুভাগে ভাগ করা যায়– স্থূল দেহের যেমন রক্ত মাংস, তেমনি সূক্ষ্ম প্রাণ-বৃত্তিরও 'রয়েছে মন-মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা, দয়া-মায়া, প্রেম, ভালবাসা ইত্যাদি। মানুষ যখন পীড়িত হয় তখন তার প্রাণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিও পীড়িত হয়। তাই, মানুষের অন্তর বা অভ্যন্তরীণ অসুখ না সারিয়ে এই শরীর, স্থূল শরীর বা দৈহিকভাবে সারালেই সারে না। বরঞ্চ নতুন নতুন রোগের হয় সৃষ্টি। নতুন রোগ হলে নতুন নামে ওষুধও আবিষ্কার হয় এবং নব্য নতুন পদ্ধতিতে রোগীর উপর প্রয়োগ করা হয়। ওষুধের চাপে প্রাণ ক্ষীণ হয়ে আসে জীবনীশক্তি বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। প্রাণ ও জীবনীশক্তিকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু ওষুধের পর ওষুধ প্রয়োগে জীবনীশক্তির বিশৃঙ্খলা এত চরমে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত প্রাণ শরীর থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। এভাবে লক্ষ লক্ষ বনি-আদম নীতিবর্জিত চিকিৎসার ফলে ওষুধ খেয়ে খেয়ে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে। নীতিহীন ওষুধ প্রয়োগ ও সেবন ক্যান্সারের জন্ম দিচ্ছে। নীতিহীন ওষুধ প্রয়োগ ও সেবন ক্যান্সারের জন্ম দিচ্ছে। রোগীকে আরোগ্য করা চিকিৎসার উদ্দেশ্য। রোগীকে আরোগ্য না করে, জোর করে শুধু রোগ সারানো চিকিৎসার উদ্দেশ্য নয় এবং এ জাতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মতও নয়। বিজ্ঞান অর্থ যদি বিশেষ ও যুক্তিসম্মত বিশেষ জ্ঞান হয়, তা হলে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বোঝা উচিত প্রাণ ও দেহধারী মানুষের সূক্ষ্ম প্রাণের গুরুত্বই সবচাইতে বেশি। প্রাণ ও জীবনীশক্তির সচেতনতা ও সজীবতা সৃষ্টিই আরোগ্যকলার কৌশল। সত্যিকার চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বা আরোগ্য কৌশলীর সর্বদিক দিক দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বুঝতে হবে সহজ, সরল ও সুখকর উপায়ে রোগীর আরোগ্য সাধনই চিকিৎসকের আদর্শ ও চিকিৎসা জীবনের উদ্দেশ্যে। রোগ শুধু সেরে গিয়ে, রোগী যদি নিঃশেষ হয়ে যায়-আরোগ্যের নামে রোগীকে দুরারোগ্য করে দেয়া-কখনও যুক্তিসংগত এবং বিজ্ঞানসম্মত নয়। ওষুধ দিয়ে উপশম দেয়াতে বাহবা মেলে, চিকিৎসককে লোকে ধন্য ধন্য করে, কিন্তু রোগী বা লোকজন কখনও জানে না যে ঐ মাথা বেদনার উপশমদায়ক ওষুধ এখন হার্টের রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এবং উপশমদায়ক ওষুধই রোগীর জীবনীশক্তিকে ক্ষীণ করে দিচ্ছে। ক্ষুধা নিয়মিত লাগে না, কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা তরল পায়খানা প্রায় লেগেই থাকে। এভাবে একটার পর আর একটা, প্রত্যেকটাতে নতুন করে উপশম দেয়ার জন্য গবেষণা ও ওষুধ সবটাই অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানী হয়ে সাময়িক উপশম ও শান্তির জন্য

অবৈজ্ঞানিক পন্থায় ওষুধ প্রয়োগ নিশ্চয়ই মানবতাবিরোধী। এই মানবতাবিরোধী চক্র সারা পৃথিবীতে আজ জালবিস্তার করে অনেক অবৈধ কাজকেও বৈধ হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে। প্রচার, প্রোপাগাণ্ডা ও বিজ্ঞপ্তির জোরে অবৈধকে বৈধ করে নেয়া হচ্ছে। রংবেরং ফ্যাশনে, নিত্য নতুন ফ্যাশনের জৌলুসে, সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগে উপমশমদায়ক ওষুধ রোগীর উপর প্রয়োগ করে আপাতমধুর ক্রিয়া দ্বারা মানুষকে তাক্ লাগিয়ে দেয়া যায় কিন্তু তার মৌলিক রহস্য উদ্ঘাটন করলে দেখা যায়, রোগীর সত্যিকার আরোগ্যকে অনেক দূরে ঠেলে দেয়া হয়েছে। সত্যিকার আরোগ্যনীতিতে রোগ বা রোগ-দোষকে ভেতর হতে বাইরে আনা—হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক, পাকস্থলি, ফুসফুস ইত্যাদি হচ্ছে মানুষের ভিতরে এবং মাংসপেশী, ত্বক ইত্যাদি শরীরের বাইরে। ভেতরে শান্তি আসার ফলে যদি ঘুম ঠিকমত হয় এবং বাত-বেদনা বা চর্মোপরি ফোঁড়া, ফোস্কা, চর্মরোগ দেখা দেয়—তা হলে সংগতভাবে স্বীকার করতে হবে রোগী আরোগ্য লাভ করছে।

রোগ হলে প্রত্যেকটি মানুষ ভাবে তার চিকিৎসার প্রয়োজন কিন্তু চিকিৎসা ছাড়াও যে সব রোগ আরোগ্য হয়—সে সব রোগী বংশগতভাবে নির্দেষ এবং পবিত্র জীবন-যাপনে তারা অভ্যস্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা হঠাৎ কোন বিপর্যয়ে যে সাময়িক অসুখ-বিসুখ, কষ্ট যন্ত্রণা—তার জন্য সাময়িক উপশমদায়ক ওষুধ কোনও ক্ষতিকর কারণ ঘটায় না—বরঞ্চ জীবনিশক্তির স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তিকে সাহায্য করে এবং রোগী খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনীশক্তির স্বাভাবিক একটা আরোগ্যকারী শক্তি আছে। সামান্য রৌদ্র লেগে মাথা ধরা, সামান্য ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হাঁচি ইত্যাদি জীবনীশক্তির স্বাভাবিক আরোগ্যকারী শক্তি আরোগ্য করতে পারে অযথা বেশি বেশি ওষুধ দিয়ে স্বাভাবিক গতিকে রুদ্ধ করে দেয়ার ফলে যে মহাঅসুখ হয়, তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন, নতুবা রোগীর জন্য আসে মহাবিপদ। তাই অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ খাওয়ার চাইতে না খাওয়া ভাল এবং সত্যিকার চিকিৎসকেরও অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ দেয়ার চাইতে না দেয়া ভাল।

শরীরের সুস্থতার জন্য জীবন-শক্তি সর্ব উপায়ে মানুষের স্বাভাবিকতা রক্ষাকল্পে মানুষের হৃদপিণ্ড থেকে তার ত্বক বা অঙ্গুলির পরিধি পর্যন্ত একটা শৃঙ্খলা বজায় রাখে। একটা দেশ বা রাজ্যের যেভাবে কেন্দ্র বা রাজধানী থাকে, মানুষ ও তার দেহ রাজ্যের কেন্দ্র বা রাজধানী হলো তার হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্ক। ত্বক বা অঙ্গুলীর পরিধি তার সীমান্ত। কেন্দ্র দ্বারা সব কিছু শাসিত হয়। মানুষের কেন্দ্রে অর্থাৎ মস্তিষ্কে ও হৃদপিণ্ডে শৃঙ্খলা বোধ থাকলে শরীরের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা ত্বক পর্যন্ত শৃঙ্খলাবোধ ও স্বাভাবিকতা বিরাজ করে। শৃঙ্খলাবোধ থাকলে তার মানবীয় গুণাবলী সম্পর্কে সে সচেতন ও

সজাগ থাকে। তার শত্রু ষড়-রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য) সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকে। যে কোন কাজ-কর্ম সে ভেবেচিন্তে করে। মন তার শৃঙ্খলার রজ্জুতে আবদ্ধ থাকে। বিক্ষিপ্ততা, হটকারিতা, আবেগ-প্রবণতা, উত্তেজিত অবস্থা তার দমিত থাকে –তাই সে টেনশনে ভোগে না, ক্ষতি হলেও সে ভেঙে যায় না, খুব লাভবান হলেও ভাবাবেগে উৎফুল্ল হয় না। হৃদপিণ্ডের সঠিক ক্রিয়াহেতু রক্তসঞ্চালনে তার কোনও ব্যাঘাত হয় না। সব কিছুতে তার স্বাভাবিকতা বজায় থাকে। মানুষের মননধারা ও চিন্তাধারা অনুযায়ী তার কার্যধারাও পরিচালিত হয়। মানুষের স্বাভাবিকতার মধ্যেই স্বাভাবিক কার্যধারা সংঘটিত হয়। সমগ্র দেহযন্ত্র সম্মিলিতভাবে মিলে যে শক্তি দ্বারা কাজ সম্পাদন করে– সেই শক্তির নাম জীবনীশক্তি। জীবনীশক্তি যে মৌলিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তার নাম প্রাণবৃত্তি। প্রাণবৃত্তির স্পন্দন জীবনীশক্তির দ্বারা বিকশিত হয়। জীবনীশক্তির মূল উৎস প্রাণবৃত্তি। এই প্রাণবৃত্তি মানব দেহে আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে জীবনের পর আগামী জীবনের উদ্দেশ্যে এমন সুনিপুণভাবে তার দেহ-মনকে নিয়োজিত করে–যার জন্য পরম স্রষ্টা মুগ্ধ হয়ে এ দুনিয়াতে তাকে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন, স্রষ্টা মানুষকে তা পবিত্রতা ও স্বাভাবিকতার মধ্যে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র বিধান পবিত্র ও স্বাভাবিক। পবিত্র ও স্বাভাবিকভাবে চলায় পবিত্র আনন্দ নিয়ে মানুষ জীবনে সুখী হয় এবং দীর্ঘ জীবন যাপন করে। পবিত্র ও স্বাভাবিক জীবন যাপনে দাম্পত্য জীবন পবিত্র ও স্বাভাবিক হয়, ঔরসজাত সন্তানও সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়।

আজকার এই পৃথিবীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যত সব চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে– তাতে হোমিওপ্যাথী পদ্ধতি নীতিগতভাবে উন্নত। অতীব দুঃখের সংগে স্বীকার করতে হয় যে, হোমিওপ্যাথদের দক্ষতার অভাবে এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তা অনেক পেছনে পড়ে আছে।

পেছনে পড়ে থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে দু'চার জন যা গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে চিকিৎসা করছে তার ভিত্তিতেই জোর দিয়ে বলতে পারি যে, ক্যান্সার রোগীদের জন্য যদি বি এস এম এম ইউ-এর মত একটি হাসপাতাল আমাদের চিকিৎসাধীনে দেয়া হয়, তাতে শতকরা আশিজন রোগীর আরোগ্যের আমরা আশা রাখি এবং সংগে সংগে প্রতিষেধক ব্যবস্থায় ৫ বছর পরে ক্যান্সার রোগীর মৃত্যুসংখ্যা শতকরা পাঁচ-এ নেমে আসবে। আমার মতে সত্যিকার আরোগ্যনীতিতে ওষুধ প্রয়োগ করলে একবিংশ শতাব্দীতে ক্যান্সার পর্যায়ের রোগী আর দেখা যাবে না।

অগ্রপথিক। নভেম্বর ১৯৮৯

শিশুদের হুপিং কাশি

ডা. মোঃ আবদুল গণি

হুপিং কাশি শিশুদের জন্য খুব কষ্টকর পীড়া, তবে মৃত্যুর হার প্রায়ই থাকে না— যদি চিকিৎসার দোষ না হয়। এটা প্রায়ই সংক্রামক আকারে দেখা দেয় এবং একসঙ্গে অনেক শিশু আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ভিন্নমতাবলম্বীরা এটা ৩ মাসের কম পারে না বা ৩ মাস পরে এমনি সে ভাল হয়ে যায়, বলেন। পরন্তু আমরা হোমিওপ্যাথগণের মতে বিশ্বাসী নই। প্রকৃত ওষুধ প্রয়োগ হলে প্রয়োগকাল হতেই রোগী আরোগ্যের দিকে যেতে থাকে– তবুও ২/৩ সপ্তাহ লেগে যায় পূর্ণ আরোগ্য হতে। এটা প্রায়ই হঠাৎ আসে না। প্রথমত সাধারণ সর্দিকাশি হিসেবে আরম্ভ হয়। ক্রমে নিশ্বাস ফেলার সময় কাশির বেগে কাশতে কাশতে দম আটকান ভাব (আক্ষেপ) এবং কাশি শেষে দম নেয়ার সময় হুপ জাতীয় এক প্রকার শব্দ হয়। শেষোক্ত কারণে একে হুপিং কাশি বলে।

রোগ লক্ষণ অপেক্ষা রোগীর লক্ষণ সাদৃশ্যে চিকিৎসা করলে তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যায়। রোগ লক্ষণে চিকিৎসায় আরোগ্যে বিলম্ব ঘটে। বড়দের প্রায়ই এ রোগ হয় না– হলে সাংঘাতিক আকার ধারণ করে।

একোনাইট ন্যাপ- ৩, ৬, ১২, ৩০ ঃ পীড়ার সূচনাবস্থায় প্রয়োগে কাশি আর হুপিং কাশিতে পরিণত হতে পারে না। ওখানেই আরোগ্য হয়ে যায়। কাশির সময় শিশু গলায় হাত দেয়। শুষ্ক ঠাণ্ডা রোগের কারণ।

আর্নিকা- ৬, ১২, ৩০ ঃ কাশির সময় বুকে খুব ব্যথা পায় বলে শিশু কাশির ঝোঁক বুঝলেই কাঁদতে থাকে ও যতক্ষণ পারে কাশি চেপে রাখে। যখন আর পারে না তখন কাশে ও কাঁদে। তখন তার বমিতে রক্তের ছিটা দেখা যায়। চোখে রক্ত জমে লাল টকটকে হয়।

আর্সেনিক এলব-৩০, ২০০ ঃ এর চারিত্রিক লক্ষণাদি বিদ্যমান থেকে পানি পান মাত্র কাশি বৃদ্ধি হলে প্রযোজ্য।

বেলাডোনা-৩x, ৩, ৬, ৩০ ঃ কাশতে কাশতে চোখ মুখ লাল হয়ে যায়। চোখে রক্ত জমে। থেমে থেমে কাশি বৃদ্ধি পায়। কাশি একেবারেই শুষ্ক। কিছুই পড়ে না। কেবল গলা খুশখুশায় ও কাশি পায়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব-৩০, ২০০, ১০০০ ঃ মোটা সোটা শিশু। শীতকাতর। মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়। পেট বড় ও উঁচু। ডিম ভালবাসে কিন্তু দুধ ভালবাসে না কারণ, খেলে হজম হয় না। শিশুর ক্ষুধা কম।

ক্যালকেরিয়া ফস- ৩০, ২০০, ১০০০ ঃ জীর্ণ-শীর্ণ লম্বাটে শিশু। পেট ভেতর দিকে ঢোকানো। ক্ষুধা খুব বেশি এবং খায়ও বেশি কিন্তু শীর্ণতা সারে না। শিশু শীতকাতর, মাথার ঘামে বালিশ ভিজে যায়।

কার্বোভেজ- ৩০, ২০০ ঃ শিশু অতিশয় দুর্বল। প্রায়ই পেট ফাঁপে ও দুর্গন্ধযুক্ত পায়খানা করে। পাখার বাতাসে ভাল থাকে। প্রান্তদেশ অর্থাৎ কনুই হতে হাতের পাতা ও হাঁটু হতে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঠাণ্ডা এবং তথায় জ্বালা।

ক্যামোমিলা- ৬, ১২, ৩০ ঃ রাগ উঠলেই কাশি বৃদ্ধি (কলোসিস্থ)। মেজাজ খিটখিটে। কেবল কোলে চড়ে বেড়াতে চায়। নানা জিনিসের বায়না ধরে।

সিনা- ২০০, ১০০০ ঃ শিশু নাক-চুলকায়। নিদ্রার মধ্যে দাঁত কাটে। এটা ওটা নানা জিনিসের বায়না ধরে। খিটখিটে মেজাজ খুব বেশি। মিষ্টি খেতে ভালবাসে।

ফরাগ ফ্যাগ্‌টাই- ৬, ৩০ ঃ হুপিং কাশিতে সেখানে অনেকক্ষণ কাশির পর বমি হয়ে তবে কাশির উপশম হয় ও সেই বমির সাথে নির্গত শেষ্মা-জাতীয় পদার্থ লম্বা হয়ে ঝোলে সেখানে ব্যবহার্য। এর কফ সাদা।

কোরালিয়াম রুব্রাম ৬, ৩০ ঃ কাশতে কাশতে মুখমণ্ডল কাল হয়ে ওঠার পর কাশি কিছুটা কমে। কাশি দিনে কম, রাতে খুব বাড়ে। প্রাতঃকালেও বাড়ে।

কুগ্রামমেট- ৬, ৩০, ২০০ ঃ ঝাঁকে ঝাঁকে কাশি আসে অর্থাৎ ২/৪/১০টা যাই হোক একবারে কিছু কাশি হয়ে কমে গিয়ে কিছুক্ষণ ভাল থাকার পর আবার ঐভাবে কয়েকটা কাশি একসঙ্গে হয়ে আবার নিবৃত্ত হয়। এইভাবে বার বার হতে থাকে। কাশির সময় ঠাণ্ডা পানি পানে কাশি কিছুটা কম পড়ে। কাশির সময় মুখমণ্ডল নীল বর্ণ হয়ে যায়। কাশির পর শিশু অবসন্ন হয়ে পড়ে।

ড্রসেরা- ৩০, ২০০ ঃ রাত ১০/১১টায় কাশির বৃদ্ধি। শিশুতে আমযুক্ত উদরাময় থাকতে পারে। সঠিক প্রয়োগ হলে ১ মাত্রাতেই আরোগ্য হয়।

কেলি-বাই-৩০, ২০০ ঃ শেষ রাত– ৩টা হতে ভোর ৭টা পর্যন্ত কাশির বৃদ্ধি। কফ খুব আঠাল। কোথাও লাগলে সেখানে দড়ির মত লম্বা হয়ে ঝুলতে থাকে। সহজে ছাড়ে না। কপালে ও নাকের গোড়ায় বেদনা, কফ হলদে।

কেলিসাল্‌ফ-৬, ৩০, ২০০ ঃ পালসের লক্ষণের শিশু পাল্‌স দ্বারা উপকার না হলে বা আংশিক উপকার হলে কেলিসাল্‌ফ প্রযোজ্য। পাল্‌সে পিপাসা নেই, কিন্তু কেলিসাল্‌ফে পিপাসা আছে। অতএব পাল্‌স্ ব্যবহারের পর রোগী যদি পিপাসা হয় তাতেও এটা প্রয়োগে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়।

মিফাইটিস- ৬, ৩০ শ্লেষ্মা কম কিন্তু আক্ষেপ বেশি। রাতে ও শয়নে বৃদ্ধি।

মার্কসল- ৩০, ২০০, ১০০০ ঃ শয়নের পর কাশির বৃদ্ধি। কিন্তু বাম পার্শ্বে বেশি শয়ন করে। মুখ হতে লালা ঝরে। ঠাণ্ডা-গরম কোনটাই বেশি হলে সহ্য হয় না। নাতিশীতোষ্ণ পছন্দ করে। শরীর খুব ঘামে। কাশতে কাশতে ঘেমে অস্থির হয়।

পালসেটিলা ঃ ৬, ৩০, ২০০ ঃ শিশু গরমকাতর কিন্তু পিপাসাহীন। মেজাজ খুব ঠাণ্ডা, কান্নাকাটি খুব কম করে। খোলা বাতাস খুব পছন্দ করে এবং তাতে ভাল থাকে। পাকা হলুদ রংয়ের কফ।

ভিরেট্রাম এলব-৩x, ৩, ৬, ৩০, ২০০ ঃ কাশির সময় কপালে শীতল ঘর্ম।

রোগীতত্ত্ব ঃ রোগী ৬ বছর বয়স্ক এক বালক। প্রায় ১ মাস যাবত হুপিং কাশিতে ভুগছে। কাশতে কাশতে দম ফুরিয়ে আটকে যায়। তখন নিঃশ্বাস নিতে গেলে সহজে নেয়া যায় না। দুপ দুপ শব্দের মত শব্দ হতে হতে পরে নিঃশ্বাস নেয়া যায়। আগে কাশতে কাশতে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠতো। ১০/১২ দিন যাবত চোখে রক্ত উঠে গেছে এবং সব সময়ে তা চোখে থাকে। কোন সময় দূর হয় না। উজ্জ্বল লাল রঙের চোখ। কোন সময় না জানি চোখ ফেটে রক্ত ঝরতে থাকে বলে ছেলের পিতা একটু কাঁদলেন। আমি দেখলাম চোখ সাংঘাতিক লাল। তন্মধ্যে ডান চোখ আরও বেশি লাল। মোটা-সোটা সুন্দর ছেলে। তার স্বভাব ভাল থাকলে খুব আমুদে কিন্তু অসুখ হলেই একেবারে নেতিয়ে পড়ে। কাশি থেমে থেমে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ কতক্ষণ ভাল থাকে, কতক্ষণ কাশে। আবার কতক্ষণ ভাল থাকে ও কতক্ষণ কাশে এই ভাব প্রথম হতেই চলছে। তার পিতা বলেন, তার জন্য চেষ্টার কম করি নাই। সরিষার তৈল ও পিয়াজ খাওয়াইছি, কফ গলে পড়ার জন্য। তুলসী পাতার রস খাওয়াইছি। ফাগুন গোটার মালা গাঁইথা গলায় দিছি। আর সব ছেলের বেলায় মালা যত শুকায় কাশিও তত কমে কিন্তু আমার ছেলের বেলায় কিন্তু কাশির কিছুই হয় নাই। সব বরাত। যাউক– তারপর এলোপ্যাথি বড়ি– তাও মুড়ীর মত খাওয়াইলাম এতদিন কিন্তু পোলা যা তাই। চেষ্টা আর করতেই চাইছিলাম না কিন্তু পোলার কষ্ট আর মায়ের অস্থিরতার জন্য হোমিওপ্যাথিতে আসলাম। দেহি কিছু অয় কি না ?

ওষুধ নির্বাচন ঃ ডানদিক অধিক আক্রান্ত, সুস্থ থাকলে খুব আমুদে এবং অসুখ হলে ভেঙে পড়ে, চোখ ভয়ানক লাল থেমে থেমে রোগের বৃদ্ধি। লক্ষণ ৪টি বেলাডোনার। চোখে রক্ত জমা আর্নিকা ও মোটা সোটা সুন্দর দেহ ক্যালকেরিয়া কার্বের লক্ষণ। তবে তাদের ঐ একেকটি করে লক্ষণই রোগীতে বিদ্যমান সুতরাং বাদ। অতএব উক্ত তারিখে বেলাডোনা-৩ দুই ঘণ্টা অন্তর দৈনিক ৮ বার করে ২দিনে ১৬ মাত্রা। ৩য় শক্তি উক্ত নিয়মে ১৬ মাত্রা সেবনের পর খবর দেয় কাশি ও চোখে লাল কম। পরের ২ দিনে ৬ষ্ঠ শক্তি ১২ মাত্রা দৈনিক ৬ মাত্রা করে এবং

পরবর্তী ২ দিন দৈনিক ৪ মাত্রা করে ৩০ শক্তির মোট ১০ মাত্রা সেবনে রোগ অর্ধেক কমে গেলে দৈনিক ৪ মাত্রা করে প্লাসিবো সেবন করতে থাকে। কিন্তু ১ সপ্তাহ পর জানায় আর সে কাশছে না। চোখে অতি সামান্য স্থানে রক্ত আছে। তা কমছে না। বেলাডোনা-২০০ দুই মাত্রা ১ ঘণ্টা এবং ৬ দিনের জন্য। ৬×৪ চা মাত্রা করে দৈনিক সেব্য প্লাসিবো ২৪ মাত্রা। আর ওষুধ দিতে হয়নি। এতেই সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যায়।

অগ্রপথিক। অক্টোবর ১৯৮৯

পুষ্টির চাহিদা

মোরশেদা বেগম

প্রত্যেক পিতা-মাতাই চান তার সন্তান স্বাস্থ্যবান হোক, লেখা-পড়ায় ভালো হোক, বুদ্ধিমান হোক, উদ্যমী এবং কর্মঠ হোক। শুধু পিতা-মাতা কেন, সমাজ এবং জাতিরও প্রত্যাশা তাই। প্রত্যাশা করলেই তা পাওয়া যায় না। এই জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথাসময়ে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হয়। মানব দেহকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে হলে ভিত্তি থেকেই সেটাকে শক্ত করতে হবে। কোনো শিশু ভ্রূণ হয়ে মায়ের পেটে জন্ম নিলেই তার জীবনের ভিত্তি শুরু হয় এবং তখন থেকেই তার শরীরটাকে শক্ত করে গড়ে তুলতে হয়।

মায়ের গর্ভে ভ্রূণ হয়ে যেদিন মানব সন্তান জন্ম নেয়, সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার শরীরে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে। জন্মের পর থেকে ২০/২৫ বছর সময় পর্যন্ত তার শরীর বৃদ্ধি পায়, তারপর আর পায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা রকম কাজের জন্য মানুষের শক্তি ব্যয় হয় এবং শরীর ক্ষয় হয়।

মানুষের শরীরের এই পরিবর্তন তথা বৃদ্ধি, ক্ষয়ক্ষতি মেটানো, শক্তি যোগানো এবং জীবাণুর আক্রমণ থেকে শরীরটাকে রক্ষা করার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় জিনিস শরীরে সরবরাহ করতে হয় সেসব জিনিসের সমষ্টিকে বলা হয় খাবার। মায়ের পেটে ভ্রূণ হয়ে যেদিন মানুষ জন্ম নেয়, সেদিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার খাবারের প্রয়োজন হয়।

খাবারের কাজ মূলত তিনটি ঃ

১. শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করা;

২. বিভিন্ন কাজের জন্য শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি যোগানো এবং

৩. বিভিন্ন রোগের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করা।

আমিষ

যেসব খাবার শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করে তাকে আমিষজাতীয় খাবার বলে। আমিষ হলো একাধিক এমাইনো এসিডের যোগফল। আর এমাইনো এসিড হলো কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের যোগফল। আমিষ মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত জরুরী। কেননা চামড়া, রক্ত, মাংস, হাড়, মগজ ইত্যাদি আমিষ

দিয়ে তৈরি হয়। যেহেতু আমিষ চামড়া, রং, মাংস, হাড় ও মগজ তৈরি করে সে জন্য যার বয়স যতো কম হবে তাঁর শরীরের গঠনের জন্য ততো বেশি পরিমাণে আমিষ লাগবে। যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে অন্যান্য খাদ্য উপাদানের তুলনায় আমিষের পরিমাণ বেশি সে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যকে আমিষ জাতীয় খাদ্য বলে। আমিষ জাতীয় খাদ্যকে দু'ভাবে ভাগ করা যায় ঃ

১. প্রাণিজ আমিষ– যেমন–মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি।

২. উদ্ভিজ্জ আমিষ– যেমন–বিভিন্ন ডাল, শুকনো মটর শুটি, শুকনো সীমের বীচি, সয়াবিন ও চীনা বাদাম।

তবে প্রাণিজ আমিষ মানুষের শরীরে কাজে লাগে বেশি, কারণ প্রাণীদের শরীর আমাদের শরীরের মতো রক্ত, মাংস, হাড় ও চামড়া দিয়ে তৈরি। অপরদিকে গাছপালার শরীর মানুষের শরীরের মতো নয় বলে তাদের আমিষ মানুষের শরীরে তুলনামূলকভাবে কম কাজে লাগে। প্রাণিজ আমিষ সহজেই মানুষের শরীর বৃদ্ধিতে অংশ নিতে পারে। শরীরের বৃদ্ধিতে কোনো আমিষের অংশ নেয়ার ক্ষমতাকে বলে ঐ আমিষের কার্যক্ষমতা। সব খাদ্যে আমিষের কার্যক্ষমতা এক নয়। মায়ের বুকের দুধ ও ডিমের আমিষের শতকরা ১০০ ভাগই শরীরের কাজে লাগে। মহান আল্লাহতাআলা ডিমে হাঁস-মুরগীর বাচ্চার আর মায়ের বুকের দুধে মানব শিশুর প্রথম পর্যায়ের বৃদ্ধির জন্য যে আমিষ দরকার তা রেখে দিয়েছেন। অপরদিকে গরুর দুধে আমিষের কার্যক্ষমতা ৭৫ শতাংশ, মাছে ৮৩ শতাংশ, মাংসে ৭০ শতাংশ, ডালে ৪০-৫০ শতাংশ। সুতরাং মায়ের দুধ আর ডিমকে আদর্শ আমিষ জাতীয় খাদ্য বলা যেতে পারে। শিশুর শরীরের বৃদ্ধির কাজটি বেশি। তাই তার বেশি আমিষের প্রয়োজন। সুতরাং শিশুকে মায়ের দুধ, ডিম, মাছ, মাংস বেশি করে খাওয়াতে হবে।

শক্তি

সমস্ত মানুষ কিছু না কিছু কাজ করে। আর এসব করার জন্য শক্তি লাগে। যে যতো বেশি কাজ করে তার ততো বেশি শক্তি লাগে। আবার এমনও অনেক কাজ আছে যা করতে অন্যান্য কাজের চেয়ে বেশি ভাল লাগে। যেমন বসে থাকার চেয়ে হাঁটতে বেশি শক্তি লাগে। আবার হাঁটার চেয়ে দৌড়াতে আরো বেশি শক্তি লাগে।

এছাড়া শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয় পূরণের জন্যও শক্তির দরকার। শিশুর শরীরের বৃদ্ধির কাজটি বেশি। তাই তুলনামূলকভাবে বড়দের চেয়ে এ কাজের জন্য শিশুদের শক্তির প্রয়োজন হয় বেশি। এছাড়া শিশুরা খেলাধূলা করে, এ জন্যও তাদের শক্তির দরকার হয়। গর্ভের শিশুর শরীর বৃদ্ধির জন্য যে শক্তি লাগে তা মাকেই তার নিজের খাবারের মধ্যে দিয়ে যোগাড় করতে হয়। দুগ্ধবতী মা'র দুধ তৈরির জন্য বাড়তি শক্তির দরকার হয়।

সূর্যের আলো এই পৃথিবীতে সমস্ত কাজের শক্তির উৎস। সবুজ রংয়ের উদ্ভিদ বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও পানি সংগ্রহ করে নিয়ে সূর্যের আলোর শক্তির সাহায্যে শর্করা জাতীয় পদার্থ তৈরি করে। উদ্ভিদ তার প্রয়োজনে শর্করা তৈরি করলেও তার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। তাই উদ্ভিদ এই বাড়তি শর্করা তার ফলে-মূলে ও শস্যে যেমন– ভুট্টা, কলা, আলু, চাল, গম, আখ ইত্যাদিতে বিতরণ করে। যা আমরা খাবার হিসেবে খাই এবং তা খেয়ে শক্তি অর্জন করি। এছাড়া তেল জাতীয় খাবার থেকেও প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়। শক্তির পরিমাণ পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা "ক্যালরি" শব্দটি ব্যবহার করি। কোন্ খাবারে শক্তির পরিমাণ কি তা মাপতে হলে ওই খাবারটির প্রতি দেড় ছটাকে কি পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় সে মাপই বোঝায়। শর্করা ও তেল জাতীয় খাদ্যের প্রতি দেড় ছটাকে যে পরিমাণ শক্তি থাকে তা হলো ঃ

ক. শর্করা ৪০০ ক্যালরি

খ. তেল ৯০০ ক্যালরি

তেল জাতীয় খাদ্যে যেহেতু অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় শক্তির পরিমাণ বেশি, সেহেতু শিশুদের ও শারীরিক পরিশ্রমীদের খাবারের সাথে কিছু তেল জাতীয় খাদ্য থাকা উচিত।

রোগ প্রতিরোধ

সব সময়ে নানা ধরনের জীবাণু মানুষের শরীর আক্রমণ করে। ভিটামিন, লবণ, পানি খাদ্যের এই তিনটি উপাদান মানুষের শরীরকে সুস্থ রাখে। তাই এগুলোকে রোগ প্রতিরোধক খাবার বলা হয়।

ভিটামিন

মানুষের শরীরে আমিষ, তেল ও শর্করা জাতীয় খাদ্য যাতে ঠিকমত কাজ করতে পারে সেজন্য ভিটামিনের প্রয়োজন। তাই শরীরে ভিটামিনের অভাব দেখা দিলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে ও রোগাক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে যায়। খাবারের মধ্যে কাজ অনুযায়ী এ. বি. সি. ডি. এবং ই. জাতীয় ভিটামিন পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'এ' ঃ চোখের স্বাস্থ্য ও দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখা, চামড়া মসৃণ রাখা এবং শ্বাসপথের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য ভিটামিন 'এ'-এর প্রয়োজন হয়। শরীরে ভিটামিন 'এ'-এর অভাব হলে চোখে কম দেখা, রাত-কানা ও চোখে ঘা হয় এবং ঘা হওয়ার ফলে চোখ সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া চামড়া খসখসে হয়ে যায় ও ঘন ঘন সর্দি-কাশি লাগে। বিভিন্ন ধরনের শাক, হলুদ ও লাল রংয়ের সবজি ও ফলে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। সবার জন্য এই ভিটামিনের প্রয়োজন হলেও শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাই ফলের মৌসুমে শিশুদের প্রচুর পরিমাণ হলুদ ফল খাওয়াতে হয়।

ভিটামিন 'বি' ঃ এই ভিটামিনকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন– বি-১, বি-২, বি-১১ ইত্যাদি। এই সব ভিটামিনের অভাব হলে বেরিবেরি রোগ, মুখের কোণায় ঘা, বদহজম ও পেটের অসুখ দেখা দেয়। চাল, গম, ভুট্টা, দুধ, সীম ও সবুজ রংয়ের শাকে এই ভিটামিনগুলো পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'সি' ঃ চামড়া, দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য এই ভিটামিনের দরকার। যে কোন তাজা শাক-সব্জিতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়। শুকিয়ে গেলে বা রান্না করলে এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রতিদিন আমাদের কিছু তাজা ও কাঁচা শাক-সব্জি ও ফলমূল খাওয়া উচিত।

ভিটামিন 'ডি' ঃ হাড় ও দাঁত ঠিকমত শক্ত হওয়ার জন্যে এই ভিটামিনের প্রয়োজন। দুধ, ডিম, পালংশাক ও সূর্যের আলোতে এই ভিটামিন পাওয়া যায়।

লবণ

শরীরের জন্য সোডিয়াম ক্লোরাইড যা আমাদের অতি পরিচিত খাবার লবণ, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লৌহগঠিত লবণ খুব প্রয়োজন। সোডিয়াম ও পটাসিয়াম জাতীয় লবণ অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যেও প্রচুর পরিমাণ রয়েছে। তবে আমাদের খাবারে লৌহ ও ক্যালসিয়ামের অভাব দেখা দেয়।

লৌহ ঃ রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামে একটা বিশেষ আমিষ আছে যার কাজ হলো নিঃশ্বাসের অক্সিজেনকে সারা শরীরে পৌঁছে দেয়া। এই হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে লৌহ লাগে। লৌহের অভাব হলে শরীরে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায় যাকে রক্তশূন্যতা বলা হয়। মেয়েদের বিশেষ করে গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মেয়েদের রক্তশূন্যতা বেশি দেখা দেয়। তাই তাদের লৌহের প্রয়োজন হয় বেশি। সীম, মটরশুটি, বরবটি, টিউবওয়েলের পানি ইত্যাদিতে লৌহ থাকে। এ ছাড়া লোহার কড়াই ও চামচ ব্যবহার করলেও লৌহ পাওয়া যায়।

ক্যালসিয়াম ঃ হাড় ও দাঁত বাড়া ও শক্ত হওয়ার জন্য ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন হয়। এর অভাব দেখা দিলে দাঁত উঠতে দেরী হয়, হাড় খুব নরম হয়ে ধনুকের মতো বেঁকে যেতে পারে। শিশুদের এ অবস্থাকে "রিকেট" বলা হয়। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস বিশেষ করে মাছের কাঁটা ও মাংসের হাড়ে ক্যালসিয়াম থাকে।

ভিটামিন ও লবণের এই আলোচনায় এ কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের শরীরে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ দুটো খাদ্য উপাদান পেতে হলে প্রচুর পরিমাণ শাক-সব্জি ও ফলমূল খেতে হবে।

পানি ঃ মানুষের শরীরের ওজনের তিন ভাগের দু'ভাগ বা সত্তর শতাংশ হচ্ছে পানি। খাদ্য ছাড়া কিছুদিন বেঁচে থাকা যায় কিন্তু পানি ছাড়া একদিনও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই পানির অপর নাম দেয়া হয়েছে জীবন। পানি যে শুধু খাওয়ার জন্য

ব্যবহৃত হয় তাই নয়, ধোঁয়া-মোছা, রান্না-বান্না, গোসল সব কাজেই পানির দরকার। তাই পানি বিশুদ্ধ তথা রোগ-জীবাণুমুক্ত হতে হবে। তা না হলে কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, আমাশয়, বদহজম, কৃমি ইত্যাদি রোগ হবে। টিউবওয়েলের পানি রোগ-জীবাণুমুক্ত। তাই সকলকে টিউবওয়েলের পানি পান করতে হবে। আর ধারে কাছে টিউবওয়েল না থাকলে পানি ফুটিয়ে খেতে হবে।

সুষম খাদ্য

এতক্ষণের আলোচনায় একথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের শরীরের প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রত্যেকবারের খাবারে থাকতে হবে ঃ

১. শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণের জন্য আমিষ।

২. শক্তি যোগানোর জন্য শর্করা ও তেল।

৩. রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রোগ প্রতিরোধক ভিটামিন, লবণ ও জীবাণুমুক্ত পানি।

আর এসবগুলো মিলিয়ে যে খাদ্য তৈরি করা হয় তাই সুষম খাদ্য। সুষম খাদ্যের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক. চাল অথবা গম+ডাল+শাক-সব্জি

খ. চাল বা গম+মাছ+ডাল+শাক-সব্জি

গ. চাল বা গম+মাংস+শাক-সব্জি

ঘ. চাল বা গম+মাছ+দুধ

ঙ. মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্য সুষম খাদ্য (৪/৫ মাস বয়স পর্যন্ত)

চ. ডিম এককভাবে একটি সুষম খাদ্য, উপরোক্ত ছক থেকে আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী সুষম খাদ্য খাওয়া যেতে পারে।

অগ্রপথিক। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

শিশুদের সংক্রামক রোগ ও তার প্রতিকার

মুহাম্মদ এবাদুল্লাহ

একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার চেয়ে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কম। উন্নয়নশীল দেশে অজ্ঞতার কারণে এর আকার আরো প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তাছাড়া তথাকথিত আধুনিকতার নামে শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়া থেকে বঞ্চিত করার ফলে শিশুদের দেহে রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমে যায়। ফলে শিশুরা যে কোনও সংক্রামক রোগে সহজে আক্রান্ত হয়। মায়ের দুধ এমন একটি খাদ্য যার কোনও বিকল্প পৃথিবীতে নেই। শিশু জন্মের পর থেকে তার চাহিদানুযায়ী বয়সের সাথে সাথে মায়ের দুধের গুণাগুণ পরিবর্তন হয়। ফলে মায়ের দুধ পানকারী শিশু সহজে জটিল রোগে আক্রান্ত হয় না। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, যে-সমস্ত শিশুরা মায়ের দুধ পান করে না তারাই ডায়রিয়া বা অন্যান্য সংক্রামক রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

নিম্নে শিশুদের সংক্রামক রোগ ও তাঁর প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

হাম ঃ হাম একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। প্রথমে শিশুর জ্বর, কাশি ও সর্দি হয় আর চোখ লাল হয়ে যায়। শিশু ক্রমেই বেশি পীড়িত হতে থাকে। মুখে ঘা এবং ডায়রিয়াও হতে পারে। ২/৩ দিন পর কানের পেছনে এবং গলায় ঘামাচির মত ওঠে। এরপর মুখমণ্ডল ও শরীরে দেখা দেয়। সবার পরে ওঠে হাতে ও পায়ে। হামের আক্রমণে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যথেষ্ট কমে যায়। যার ফলে নিউমোনিয়া, পেটের অসুখ, কান পাকা ইত্যাদি রোগ হতে পারে। মারাত্মক অবস্থায় মস্তিষ্ক প্রদাহ দেখা দিতে পারে।

প্রতিরোধ ঃ শিশুকে বিছানায় শুইয়ে রাখতে হবে, প্রচুর তরল পানীয় ও পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। যদি কানে ব্যথা থাকে তাহলে তাকে এন্টিবায়োটিক দিন।

হাম হলে শিশুকে আলাদা ঘরে রাখতে হবে, অন্যের সাথে মেলামেশা করা বন্ধ রাখতে হবে। ৮ থেকে ১৪ মাস বয়সের মধ্যে আপনার শিশুকে হামের টিকা দিন।

হুপিং কাশি ঃ হুপিং কাশি সংক্রামিত হওয়ার এক বা দুই সপ্তাহ পরে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। সর্দি জ্বর, নাক দিয়ে পানি পড়া এবং কাশি নিয়ে শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কাশি খুব বেড়ে যায় এমনকি কাশতে কাশতে শিশু বমি করে ফেলে।

কাশি বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসে বাতাস ঢোকে, তাই শব্দ করে। হুপিং কাশি ৩ মাস কিংবা তারও বেশী সময় স্থায়ী থাকে। এক বছরের কম বয়সের শিশুর হুপিং কাশি মারাত্মক।

শিশুর ওজন যাতে কমে না যায় সেজন্য তাকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে। বমি হওয়ার পরপরই খাবার দিতে হবে। কাশির জন্য শিশু ঘুমাতে না পারলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। পূর্ব থেকে ভ্যাকসিন গ্রহণ করাই এই রোগ প্রতিকারের অন্যতম ব্যবস্থা।

ধনুষ্টংকার ঃ পশু কিংবা মানুষের মলে যে ধনুষ্টংকারের জীবাণু থাকে তা ক্ষতের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে ধনুষ্টংকার হয়।

নবজাত শিশুর ধনুষ্টংকারের কারণ ঃ শিশুর নাভিরজ্জুর মাধ্যমে ধনুষ্টংকারের জীবাণু দেহে প্রবেশ করে।

যে অস্ত্র দিয়ে নাভিরজ্জু কাটা হয় সেই অস্ত্র যদি সেদ্ধ করে পরিষ্কার করা না হয়,

নাভিরজ্জু যদি শরীর বরাবর কাটা না হয়,

নাভিরজ্জু যদি বড় রেখে কাটা হয় তখনই ধনুষ্টংকার রোগ হওয়ার বেশি সম্ভাবনা থাকে।

লক্ষণ ঃ একটি সংক্রমণ ক্ষত দেখা যায়।

খাবার গিলে খেতে কষ্ট হয়।

দাঁতের কপাটি শক্ত হয়ে যায়। মাংস-পেশী শক্ত হয়ে যায়, সমস্ত শরীরে খিঁচুনী হয়।

প্রতিরোধ ঃ ধনুষ্টংকারের থেকে রক্ষা পেতে হলে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকেরই টীকা নেয়া উচিত। নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অন্যতম উপায়। নাভিরজ্জু কাটার জন্য যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

ডিপথেরিয়া ঃ সর্দির মতই প্রথমে জ্বর, মাথা ব্যথা এবং গলায় ঘা নিয়ে ডিপথেরিয়া শুরু হয়। গলার পেছনের দিকে কখনও কখনও নাকে বা ঠোঁটে হলুদ মেটে পর্দার মত পড়ে। গলাও ফুলে যেতে পারে। প্রশ্বাস দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়।

প্রতিরোধ ঃ রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে। বড় শিশুদের এন্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। গরম পানিতে অল্প লবণ দিয়ে গরগরা করলে উপকার পাওয়া যাবে। দীর্ঘক্ষণ গরম পানির ভাপ নাক দিয়ে টানতে দিন। সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো ডিপিটি ভ্যাকসিন দিয়ে এই রোগ সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

পলিও ঃ দু'বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে পলিও খুবই সাধারণ ব্যাপার। ভাইরাস সংক্রমণ ও সর্দি, জ্বর, বমি এবং ফোঁড়া দিয়ে এর শুরু হয়। কখনও সবগুলো

লক্ষণই একসঙ্গে থাকে। কোনও কোনও সময় শরীরের একটি অংশ অবশ হতে থাকে। অবশ অংগটি ক্রমশ সরু হতে থাকে এবং অন্যান্য অংগের মতো তা আর বেড়ে ওঠে না।

প্রতিরোধ ঃ একবার শুরু হলে কোন ওষুধই অবশতা ছাড়াতে পারে না। এ ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকও কোন কাজ দেয় না। পলিও প্রতিরোধের সর্বোত্তম পন্থা হলো পানি ও ভ্যাকসিন দেয়া, শিশুর ২, ৩ এবং ৪ মাস বয়সের সময় পলিও ড্রপ দিয়ে এই রোগ অতি সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। এই রোগে ইতিমধ্যেই যেসব শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে তাদের প্রচুর পুষ্টিকর খাবার দিন। প্রতিদিন ব্যায়াম করতে দিন। শিশুকে হাঁটানোর চেষ্টা করুন।

আজকে যারা শিশু তারাই ভবিষ্যতে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত হবে। কাজেই তাদের সুষ্ঠু সুন্দর স্বাস্থ্যগত পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ দানে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। একটু সচেতন হলেই শিশুদের এই মারাত্মক বিপর্যয় থেকে তাদের রক্ষা করতে পারি। যারা এ সম্পর্কে অবগত নয় তাদের এ ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া অন্য সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

অগ্রপথিক। মে ১৯৮৭

কৃমির রাজা ফিতা কৃমি

ড. এম আলম

কৃমির রাজা ফিতা কৃমি, ফিতা কৃমির আক্রমণে যে রোগ হয় তার নাম 'টিনিয়াসিস'। ফিতাকৃমিগুলো আকারে চেপ্টা। দেহ অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত। প্রধানত পাঁচ ধরনের ফিতাকৃমি আছে। এরা হলো– ১. টিনিয়া সাজিনাটা, ২. টিনিয়া সেলিয়াম, ৩. হাইমেনোলেপিস নানা, ৪. ডাইফাইলোবথ্রিয়াম লেটাম, ৫. ইগ্রেনুলোসাস।

এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় টি. সাজিনাটা। ডি. লেটাম এদেশে দেখা যায় না। এইচ. নানা ক্বচিৎ দেখা যায়।

কৃমিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হলো ফিতাকৃমি। তাদের মধ্যে আবার রাজা হলো টিনিয়া সাজিনাটা। এ ধরনের এক একটি কৃমি লম্বায় দশ হতে বিশ হাত। এদের সারা দেহ এক হাজার থেকে দু'হাজার খণ্ডে বিভক্ত। এর তুলনায় টি. সেলিয়াম আরেকটু খাটো। মাত্র চার হতে ছয় হাত লম্বা। শরীরেও হাজারের কম সেগমেন্ট বা টুকরো থাকে।

টিনিয়া সাজিনাটার অন্য নাম 'বিফ উপওয়ার্ম'। এরা জীবনচক্রের এক অংশ গরু বা মহিষের শরীরে কাটায় ফলে এমন ধরনের নাম রাখা হয়েছে। এজন্য অসুস্থ প্রাণীর কৃমিযুক্ত গোশ্‌ত কাঁচা ও আধাসিদ্ধ অবস্থায় খেলে এ রোগ হতে পারে। অতএব শিক কাবাব খেতেও প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবে মাংস ভালভাবে সিদ্ধ করলে কৃমিরা মরে যায়।

টিনিয়া সেলিয়ামের আরেক নাম স্পর্ক-টেপওয়ার্ম'। এটি এদেশে দেখা যায় না। অসিদ্ধ শূকরের মাংস হতে এ রোগের বিস্তার হয়। এখানে শূকরের মাংস খাওয়া হয় না বলে এ রোগ একেবারেই নেই।

সব জাতের ফিতাকৃমি একই চেহারার নয়। এদের মাথা ও শরীরেও একটু পার্থক্য আছে। টি. সাজিনাটা মাথা বড়ো, চারকোণাবিশিষ্ট। এর কোনও ঠোঁট বা হুক (রোস্টেলাম) থাকে না কিন্তু টি. সেলিয়ামের মাথা ছোট, গোল, ঠোঁট ও হুকযুক্ত। ফিতাকৃমি পেটের ভেতর ক্ষুদ্রান্ত্রে (স্মল বেটিসটাইন) বাস করে।

রোগের শুরুতে তেমন লক্ষণ দেখা যায় না। পায়ুখানার সাথে আঁতের মতো ছোট ছোট টুকরোই প্রথম রোগীর চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে ডায়রিয়া বা পেটে ব্যথা হতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, শরীরের ওজন কমে যাওয়া, পেট ফোলা— এগুলোই জটিল পর্যায়ে দেখা যায়।

টিনিয়া সেলিয়াম স্নায়বিক গোলযোগ (নিউরোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্স) ও ডি, লোটাস রক্তশূন্যতা (মেকরোসাইটি এনিমিয়া) সৃষ্টি করে। তবে এদেশে নয়।

পায়খানা পরীক্ষা করলে কৃমির ডিম বা টুকরো পাওয়া যায়। টি. সেলিয়ামের বেলায় মাংসের এক্স-রে ছবিতে কৃমির ক্যালসিয়াম জমাকৃত দেহবল্লরী (কেলসিফাইড সিসটিসারকি) পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধের প্রধান উপায় ঃ

১. ভাল গোশ্‌ত দেখে খাওয়া।

২. ভালভাবে গোশ্‌ত সিদ্ধ করা।

৩. অসুস্থ গরু-মহিষের চিকিৎসা করা।

৪. যেখানে-সেখানে পায়খানা না করা ও

৫. সেনিটারী লেট্রিন ব্যবহার করা।

চিকিৎসা ঃ নিচের যে কোনও একটি ওষুধ ব্যবহার করা যাবে।

১. প্রাজিকোয়েন্টাল– সবচেয়ে কার্যকর। ডোজ প্রতি কিলোগ্রাম শারীরিক ওজনের জন্য ১০ মিলিগ্রাম। এ হিসেবে রোগীর ওজন নির্ণয় করে মোট ডোজ ঠিক করা হয়। মাত্র একবার মুখ দিয়ে খেতে হয়।

২. নিকলোসামাইড– সকালে খালি পেটে ২ বড়ি। কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

৩. ডাইক্লোরফেন– ৬ গ্রাম মাত্রার ওষুধ সকাল দশটায় একত্রে মুখে দিয়ে খেতে হয়। এতে কৃমির মাথা বা স্কোলেজ নষ্ট হয়।

৪. বিথিওনাল– সকালে খালি পেটে এক গ্রাম খেতে হয়। ঘণ্টাখানেক পর আরেক গ্রাম। দুই থেকে আট ঘণ্টার মধ্যে এটি খুব ভাল ফল দেয়।

এ ছাড়াও রয়েছে কুইনাক্রিন হাইড্রোক্লোরাইড নামের ওষুধ। তবে আজকাল ব্যবহার কম।

নোট ঃ ফিতাকৃমি খুব বড়ো সাইজের বলে এরা রোগীর দেহে স্বাভাবিক গঠন ও পুষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়। সময়মতো চিকিৎসা করলে পূর্ণ সুস্থতা লাভ করা যায়।

অগ্রপথিক। অক্টোবর ১৯৮৭

আবেগ ও হৃদরোগ

নুরুল ইসলাম মানিক

বর্তমান পৃথিবীতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর কোটি কোটি লোকের মৃত্যু হচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হৃদরোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে আসছেন। বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কিছু নাটকীয় সাফল্যও অর্জন করেছে। অচল হৃদযন্ত্রের স্থলে কৃত্রিম হৃদযন্ত্রও কাজে লাগানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক সফলতা পাওয়া গেলেও পুরোপুরি সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি বিজ্ঞান। মানুষের যত বুদ্ধি ও মেধাই থাক প্রকৃতিকে পুরোপুরি বশে আনা কখনোই সম্ভব নয়। তাই বলে মানুষ বসে থাকেনি। আবিষ্কারের সাধনা এগিয়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে।

হৃদরোগ কেন হয় ? কিই-বা তার প্রতিকারের উপায় — এ নিয়ে আজো মতবিরোধ রয়েছে। একদল বিশেষজ্ঞ যদি একটা মতবাদ দাঁড় করান, অন্যদল বলেন, না ঠিক নয়। এমনটিই দেখা গেছে কয়েক বছর আগে লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'হৃদরোগের কারণ'– শীর্ষক এক বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে। এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন পৃথিবীর সেরা সেরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ। এতে আমেরিকার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রিচার্ড কন্টি মন্তব্য করলেন, ধূমপান করলে হৃদরোগ হয়। কিন্তু বৃটেনের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডি বোলাণ্ড রস তাঁর ভাষণে বললেন, সিগারেট বা ধূমপান করলেই যে হৃদরোগ হয় নিশ্চিতভাবে এরূপ মন্তব্য করা যায় না, তবে ধূমপান হৃদরোগের অন্যতম কারণ।

সম্মেলনে একদল বিশেষজ্ঞ বললেন, বেশি খেলে, মেদাধিক্য হলে, অতিরিক্ত যৌন-জীবন যাপন করলে বা মদ খেলে হৃদরোগ হয়। আরেক দল বললেন, কম খেলে, হালকা-পাতলা থাকলে, সীমিত যৌন-জীবন যাপন করলে কিংবা মদ খাওয়া ছেড়ে দিলেই যে হৃদরোগ হবে না এমন কোনও কথা নেই।

লন্ডনের বিখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ জন মূর বলেন, নিয়মিত ব্যায়াম করলে মানুষ দীর্ঘদিন বাঁচে এবং তাদের হৃদরোগও খুব একটা হয় না। একদল ডাক্তার বলেন, একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হলে পরবর্তী সময়ে ব্যায়ামের ফলে এ রোগ আরো বেশি বেড়ে যেতে পারে।

পৃথিবীর বেশির ভাগ ডাক্তারই বলেন, রক্তের অতিরিক্ত কোলেস্টেরল বাড়লেই হৃদরোগ হয়। কিন্তু ভারতের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ লেখা পাঠক বলেন, রক্তে কোলেস্টেরল বাড়লেই যে হৃদরোগ বাড়বে বা হার্ট অ্যাটাক হবে এর কোন নিশ্চয়তা নেই। তিনি বলেন, রক্তে দু'ধরনের কোলেস্টেরল থাকে। একটিকে বলা হয় লো ডেনসিটি আর অন্যটিকে বলা হয় হাই ডেনসিটি। লো ডেনসিটির কোলেস্টেরল শিরার পক্ষে ক্ষতিকর কিন্তু হাই ডেনসিটির কোলেস্টেরল শিরার দেয়ালকে রক্ষা করে থাকে। তিনি বলেন, যত রকমের হৃদরোগী দেখা যায়, তাদের অধিকাংশই লো ডেনসিটি কোলেস্টেরলের।

হৃদরোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদেরই যদি মতামত হয় এই, তবে সাধারণ মানুষ কি করবে ? কিভাবে তারা নিজেদের রক্ষা করবে সর্বনাশা হৃদরোগের হাত থেকে ?

ভাবনার বিশেষ কোনও কারণ নেই। বিশেষজ্ঞ মহলের মধ্যে হৃদরোগের কারণ নিয়ে মতবিরোধ থাকলেও কি পর্যায়ে হৃদরোগ মানুষ আক্রান্ত হয় এ নিয়ে খুব একটা মতবিরোধ নেই বললেই চলে।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হয় মানসিক উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও আবেগের ভারসাম্যহীনতার জন্যে। মানুষ যদি এসব রিপুগুলোকে নিজের আয়ত্তে আনতে পারে তবে হৃদরোগের হাত থেকে সহজেই মুক্ত হতে পারে অধিকাংশ মানুষ।

ক্রোধের বিস্ফোরণই হৃদরোগের অন্যতম কারণ। এ সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের সেন্ট জর্জেস হাসপাতালের বিখ্যাত ডাক্তার জন হান্টার তাঁর জীবনের বিনিময়ে।

ডাক্তার হান্টার চিকিৎসার ব্যাপারে যেমন ছিলেন ভুবনজয়ী সুনামের অধিকারী, তেমনি বদ-মেজাজের জন্যেও তাঁর জুড়ি মেলা ছিলো ভার। তাঁর সাথে রোগীরা একটু এদিক সেদিক ব্যবহার করলেই তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে রেগে-ক্ষোভে ফেটে পড়তেন। ডাক্তার হান্টার বুঝতে পারলেন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়লে তাঁর বুকে মৃদু যন্ত্রণা হয়। এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা যেদিন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায়, সেদিন এই যন্ত্রণা হয় অসহ্য রকমের।

ডাক্তার হান্টার তাঁর বন্ধুদের বলতেন, দেখো, যদি আকস্মিকভাবে আমার মৃত্যু হয় তবে তা এই বদ-মেজাজের জন্যেই হবে। আমি জানি, হৃদরোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্রোধের বিস্ফোরণ। কিন্তু জেনেও নিজেকে সব সময় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না। নিজের সম্বন্ধে ডাক্তার হান্টারের ভবিষ্যতবাণী ঠিক হয়েছিলো।

একবার তাঁর চেম্বারে এলো একজন খুঁতখুঁতে স্বভাবের রোগী। রোগীটি তার কি রোগ হয়েছে, এসব রোগ কেন হয় ইত্যাদি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ডাক্তার হান্টারকে উত্যক্ত করে তুললো। হান্টার আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। বললেন, দেখো বাপু, এতো প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না।' রোগীর সাথে কথা বলতে

বলতে জন হান্টার একসময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, আবেগে ফেটে পড়লেন। আর তারপরই অসহ্য যন্ত্রণা। নিজের বুকে হাত চেপে ধরেই তিনি রোগীকে বললেন, মাফ করবেন, আমি একটু পাশের ঘরে যাচ্ছি। পাশের ঘরে গিয়েই মেঝের উপর ঢলে পড়লেন এবং ক্রোধের বিস্ফোরণেই হলো তাঁর মৃত্যু। বলা যায়, তখন থেকেই মানুষ হৃদরোগে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর কারণ হিসেবে এই ক্রোধের বিস্ফোরণকে দায়ী করে আসছে। অনেক সময় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে কিংবা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে স্নায়ুবিক অভিঘাতে মৃত্যুবরণ করে। কেউ কেউ আবার কোন দুঃসংবাদে বা দুঃসংবাদের আশংকায় বিমর্ষ হয়ে পড়ে এবং এর ফলে অনেকেই হৃদরোগেও আক্রান্ত হয়। মূলত এসবের কারণ হচ্ছে আবেগ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আবেগের এ অবস্থায় হৃদযন্ত্রের পেশীর সংকোচন ও বিমোচনে দেখা দেয় অসংগতি, রক্ত-সঞ্চালনে দেখা দেয় অস্থিরতা, কাজেই যতদূর পারা যায় ধৈর্যের সাথে বাস্তবকে মেনে নিয়ে পারিপার্শ্বিকতায় দ্রুত নিজেকে খাপ-খাইয়ে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

মানসিক ও স্নায়বিক পরিস্থিতি যে করোনারি হৃদরোগের অন্যতম কারণ এ নিয়ে গত দশক ধরে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা ক্রমেই সোচ্চার হচ্ছেন। ধূমপান হৃদরোগের কারণ এ সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকলেও হাসপাতালে যে-সব লোক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয় তাদের ৫০ শতাংশ ধূমপানের শিকার বলে বিশেষজ্ঞ মহলের বেশির ভাগের ধারণা। আর বাকী ৫০ শতাংশের হৃদরোগ হওয়ার পেছনে কাজ করে মানসিক ভারসাম্যহীনতা। তার উৎস সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি।

আধুনিক সভ্যতা আমাদের যেমন দিয়েছে জীবন ধারণের উপায়, তেমনি আমাদের সুখও হরণ করে নিচ্ছে কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে। নগর সভ্যতা যতই দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে, আমাদের জীবনের চাহিদাও বাড়ছে তত বল্গাহীনভাবে। কোন কিছুতেই আমরা আর তৃপ্ত থাকতে পারছি না। ফলে দেখা দিচ্ছে স্নায়বিক চাপ ও উত্তেজনা। এর ফলে দিনদিন হৃদরোগ বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে কলকারখানার নানা রকম শব্দ, যানবাহনের গতি ইত্যাদির ফলেও আমরা প্রতি মুহূর্তে বিরূপ পরিবেশের শিকার হচ্ছি। নগর সভ্যতায় প্রতিযোগিতার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রাত্যহিক কাজ-কর্মে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যেসব Anxiety দেখা দিচ্ছে– এই সুযোগটিকেও কাজে লাগাচ্ছে সর্বনাশা হৃদরোগ।

কয়েক বছর আগে, হেলসিংকিতে হৃদরোগের সাথে মানসিক কারণ নির্ণয়ের জন্য একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। আলোচনায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ সিদ্ধান্ত নিলেন— মানসিক চাপ কখনো কখনো তাৎক্ষণিক হৃদরোগের কারণ হতে পারে। তারা এও মত দিলেন যে, দীর্ঘ সময় ধরে হৃদপিণ্ড বা হৃদপিণ্ডে রক্ত সংবহনে গড়ে উঠতে পারে ক্রনিক বৈকল্য যার পরিণতিতে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

বোস্টনের হার্ভার্ট স্কুল অব পাবলিক হেল্‌থ-এর বিজ্ঞানীরা মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর উপর চাপ প্রয়োগ করে দেখেছেন যে, স্থান সংকুলানের অভাবে ইঁদুর, গিনিপিগ ইত্যাদি প্রাণীরা মুক্তির জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন এসব মুক্তিপিয়াসী প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলের উপর চাপ প্রয়োগের ফলে দেখা গেছে, ক্রমশ তাদের হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা ধীরগতি হয়ে পড়ে, এমনকি কারো কারো হৃদপিণ্ড বিকল হয়ে যায়। এসব পরীক্ষা থেকে তারা মন্তব্য করেছেন, পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের বাসস্থানের যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে— এর ফলে দিন দিন হৃদরোগের সংখ্যা বাড়ছে।

তাঁরা ওসব প্রাণীর উপর ইলেকট্রিক শক দিয়ে উত্তেজিত করে দেখেছেন, অত্যধিক উত্তেজনার ফলে স্নায়ুমণ্ডলে যে চাপ পড়ে এতে তাৎক্ষণিকভাবে অনেক প্রাণীর মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে। তাঁরা মন্তব্য করেছেন, স্নায়বিক উত্তেজনা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে— উদার-শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ। বর্তমানে এই প্রশান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের অনুকূলে না থাকায় হৃদরোগের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে।

তাঁরা এটাও মন্তব্য করেছেন, ক্রোধ, উত্তেজনা, মাত্রাতিরিক্ত আনন্দ বা ভীতি ছাড়াও করোনারি রক্ত সংবহন অবস্থার অসংগতির জন্যেও অনেকের হৃদরোগ হতে পারে। এ পর্যায়ে তাঁরা হৃদরোগের কারণ বংশগত বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাকে দায়ী করেন।

হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখেছেন আবেগের সাথে যেমন হৃদরোগের কারণ বিদ্যমান, তেমনি ঘুমের সাথেও তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য হচ্ছে, যেসব লোক হৃদরোগে মৃত্যুবরণ করেন তাদের বেশিরভাগই মারা যায় ভোর ৪টা থেকে সকাল ৭টার মধ্যে। এর মানে কি ? তাঁরা বলেন, আমরা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি এটা একটা গোলমেলে সময়, এ সময় মানুষের চোখের পাতায় চলে দ্রুত কম্পন এবং এ সময় ঘুমন্ত মানুষের ধমনীর রক্তচাপে ঘটে দ্রুত হ্রাস-বৃদ্ধি, হৃদপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্ষেত্রেও ঘটে একই অবস্থা। কাজেই হৃদরোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে এই বিপজ্জনক মুহূর্তটি থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ইসলাম ধর্মে এ সময় ঘুম থেকে ওঠে সালাতে যোগ দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। আমাদের মনে হয়, যথাসময়ে জামাতে ফজরের সালাতে অংশগ্রহণের জন্য যারা নিয়মিত খুব ভোরে শয্যা ত্যাগ করেন, তাদের মধ্যে অনেক হৃদরোগীই অলক্ষ্যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যান।

অনেকেই ঘুমের মধ্যে প্রচণ্ড নাক ডাকে। নাক-ডাকার সাথেও হৃদরোগের অজ্ঞাত কারণ নিহিত রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। নাসারন্ধ্রের উর্ধ্বস্থানিক বায়ু চলাচলের পথটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলেই মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডেকে থাকে। এ

অবস্থায় ধমনীর উপর রক্তে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং এ রক্তচাপ বৃদ্ধির ফলে ঘুমের মধ্যেই কারো কারো স্নায়ুতন্ত্র ছিঁড়ে যেতে পারে। পরিণামে মানুষ হৃদরোগের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। ঘুমের মধ্যে যাদের নাক-ডাকার অভ্যাস রয়েছে তিনি চিকিৎসার মাধ্যমে অপারেশন করিয়ে এ রোগটি সারিয়ে ফেলতে পারেন এবং আকস্মিক মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।

বিশেষজ্ঞ মহল বিভিন্ন অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন, যেসব পুরুষ রাতে ৬ ঘণ্টার কম এবং ১০ ঘণ্টার বেশি ঘুমায় তাদের মধ্যে করোনারি হৃদরোগের প্রকোপ বেশি। কোন কারণে কারো হৃদযন্ত্রের বা করোনারি ধমনী যদি আগে থেকে স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সে ক্ষেত্রে মানসিক চাপের প্রভাবে হৃদস্পন্দন আকস্মিক বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উত্তেজিত হলে বা নিজেকে বিপন্ন মনে হলে এ সময় রক্তে অ্যাড্রিনেলিস নামে একশ্রেণীর হরমোন নিঃসৃত হতে থাকে। অ্যাড্রিনেলিস বিভিন্ন পেশীতে রক্ত-সঞ্চালন ত্বরান্বিত করে রক্তপেশীর শক্তি যোগায়। এ শক্তি আসলে যোগায় রক্তে মিশে থাকা ফ্যাড-এসিডে—এ মন্তব্য করেছেন লন্ডনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল স্কুলের চিকিৎসাবিজ্ঞানী মরিস ব্রাউন। দৈহিক কাজ-কর্মে এই শক্তি ব্যয় না হলে তখনই দেখা দেয় অসুবিধা। করোনারি ধমনীর ছিদ্রপথ বন্ধ হতে থাকে। ফলে হৃদস্পন্দন হয় অনিয়মিত এবং রক্ত সঞ্চালনও হয় বাধাগ্রস্ত।

মরিস ব্রাউন ও তাঁর সহযোগিরা মানুষের উপর একটা পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে এ্যালিড্রন হরমোন প্রবেশ করলে প্লাজমা (রক্ত) এ্যালিড্রনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়।

এই অবস্থা ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। মানসিক উত্তেজনার এক পর্যায়ে মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

বোসটন বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডেভিড জেনকিন্স যাদের মানসিক অভিঘাতজনিত হৃদরোগ হয় তাদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।

যাদের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা কম তাদের প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের জীবনে রয়েছে নানা রকমের টানাপোড়েন, সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে তারা খাটো। চাকরি জীবনে এদের নিরাপত্তা কম। আর্থিক উন্নতির জন্যে এদের এমন পেশা গ্রহণ করতে হয় মানসিকতার দিক থেকে যা মোটেই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এরা কাজ করে বটে কিন্তু কাজে কোনও স্বাধীনতা নেই। কর্মকর্তাদের চাপে কখনো কখনো এরা মনের দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর পারিপার্শ্বিকতার শিকার হয়ে এরা মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য নানারূপ নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে। ধূমপান ছাড়া যেন এদের এক মুহূর্তও চলে না। পরিণামে এরা শিকার হয় করোনারি ধমনী রোগের।

জেনকিন্স দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলেছেন তাদের যারা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। আকাঙ্ক্ষার জিনিসের একটু তারতম্য হলেই এরা মানসিক দিক থেকে অত্যন্ত ভেঙে পড়ে, ফলে দেখা দেয় অনিদ্রা, অনিদ্রা থেকে মানসিক অবসাদ এবং হৃদস্পন্দনে অস্বাভাবিকতা এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটারও সম্ভাবনা থাকে।

জেনকিন্স তৃতীয় শ্রেণীতে ফেলেছেন দু'ধরনের মানুষকে। এদের একশ্রেণী হয় অত্যন্ত দায়িত্বশীল ও উদ্যোগী, সময়ানুবর্তিতার উপর এদের থাকে দারুণ বিশ্বাস। কোথাও এসবের বিচ্যুতি দেখলে, এরা অত্যন্ত মানসিক চাপবোধ করেন। ফলে এদের মধ্যে হৃদরোগ হয়ে থাকে। দ্বিতীয় স্তরের চরিত্র হলো— যতদিন বেঁচে আছো খাও-দাও ফুর্তি করো। এদের কোনও কিছুতেই দায়িত্ববোধ নেই। এরা অত্যধিক ভোজনবিলাসী ফুর্তিবাজ। বেশি খেয়ে স্থূল হলেও এরা সাধারণত হৃদরোগে আক্রান্ত হয় কম।

চতুর্থ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তাদের, দায়িত্ব যাদের কাছে বোঝার মতো। শারীরিক শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেলেও যাদের পরিশ্রম করতে হয়। যারা মিলকারখানায় রাতদিন অভারটাইম খাটে। ন্যূনতম জীবন ধারণের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে এদের মনের উপর সৃষ্টি হয় মারাত্মক ধরনের চাপ। এর ফলে এরা কোন না কোন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়।

যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং এতোদিন নানা রকম ভেজাল খাদ্য, ধূমপান, চর্বি জাতীয় খাদ্য, লবণ ইত্যাদিকে হৃদরোগের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো, বলা হতো এসব খাওয়ার ফলেই শরীরের স্বাভাবিক বিপাকীয় কাজ-কর্মে ব্যাঘাত ঘটে। চর্বি জাতীয় খাবারের ফলে রক্ত-সংবহন ধমনী ক্ষীণকায় হওয়ার ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে মানসিক চাপও এই রোগের অন্যতম কারণ। মানসিক দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে জীবনকে যত চাহিদামুক্ত করা যাবে হৃদরোগের হাত থেকে মানুষ তত বেশি মুক্তি পাবে।

অগ্রপথিক। নভেম্বর ১৯৮৬

রোগ জরা ব্যাধি

শাহেরা খাতুন বেলা

২০০০ সাল নাগাদ 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' এই লক্ষ্যে সরকার প্রশাসনকে ঢেলে সাজান। দেশের ৮৫,০০০ গ্রামের প্রতিটি মানব সন্তানের মাঝে চিকিৎসার সুফল পৌঁছাতে সরকার বদ্ধপরিকর। শিক্ষিতের হার শতকরা যেখানে ২২ জন, শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১১৭ জন– তা সত্ত্বেও ১৯৯০ সাল নাগাদ সম্প্রসারিত টীকা দান কর্মসূচির আওতায় সব শিশুদের আনার জন্য সকলেই সচেতন। বর্তমানে জনস্বাস্থ্যের চিত্র বিশেষ করে শহরের বস্তী এবং গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বলা যায় বিপন্ন। স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব মৌল সমস্যাগুলো রয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জ্ঞান। তন্মধ্যে ২,০০০ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন। পঁচাশি হাজার গ্রামের ঘরে ঘরে সুচিকিৎসার সাথে সাথে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালানো হবে। আশাব্যঞ্জক এবং প্রশংসনীয় নিঃসন্দেহে। স্বাস্থ্যজ্ঞান, স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সাধারণ শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের উচ্চকিত ঘোষণা সব সময়ই শোনা যায়। তদুপরি ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, পরিবার কল্যাণ কর্মী, সচেতন ব্যক্তিবর্গ ও সমাজের অন্যান্য মানুষ সবার মধ্যেই একটা চিড়ধরা সম্পর্ক। ডাক্তারের সাথে সমাজের অন্যান্য মানুষের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দিন দিন বাড়ছে। মনে হচ্ছে এটা যেন সমাজের একটা ক্রনিক ব্যাধি। কিছুদিন আগ পর্যন্ত জুনিয়র চিকিৎসকরা তাঁদের ইন্টার্ন প্রশিক্ষণ শেষ করার পর চাকরিতে ধারাবাহিকতাসহ নিয়োগ, স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বাড়ানোর জন্য ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ধর্মঘট চালিয়ে যেতেন। দুঃখজনক হলেও এটা সত্য যে বছরে দুই থেকে তিনবার এ ধর্মঘট চলতো। শিশুমৃত্যুর হার গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। আগে প্রতিটি পরিবারে আট থেকে দশ জন শিশু জন্মাতো। এর মধ্যে চার থেকে পাঁচ জন মারা যেতো এবং বাকীরা জীবিত থাকতো। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় আগের থেকে কিছুটা সচেতন হবার ফলে এখন মারা যাচ্ছে দুই থেকে তিন জন। ফলে পরিবারে সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। অতিরিক্ত সন্তানাদির চাপে বাবা-মা বা অক্ষম দম্পতিরা পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থায় আগ্রহী

হচ্ছেন। রুগ্ন ও অপরিণত শিশু জন্ম নিচ্ছে পুষ্টিহীন মাতৃদেহ থেকে। তারা জন্ম নিচ্ছে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনুপযুক্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। শতকরা ৬০-৭০ জন শিশু জন্ম নিচ্ছে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাই-মাদের হাতে। এটা ঠিক যে, বড় বড় হাসপাতাল থেকে উপজেলা পর্যায়ে মাতৃসদনের অবস্থা কোনভাবেই পর্যাপ্ত নয়। একইভাবে সবার জন্য হাসপাতালের মাতৃসদনে আশ্রয় সম্ভব নয়। হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বাড়ালেই যে সমস্যার সমাধান হবে– তাও বলছি না। সবার জন্য স্বাস্থ্য– এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে শুধু ডাক্তারের সংখ্যা, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার কল্যাণ কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হবে– তাই নয়, সেইসাথে জনগণকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি ও পুষ্টি সংক্রান্ত স্বাস্থ্যজ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত করতে হবে।

আমাদের দেশে ডায়রিয়া ও পেটের অন্যান্য পীড়া ছাড়া শিশু মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অপুষ্টি। দীর্ঘদিন ধরে শিশুরা অপুষ্টিতে ভুগতে ভুগতে কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, কেউ কেউ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে রিকলাঙ্গ হয়ে যায়। সেই সাথে ঐ পরিবারটির সামাজিক ব্যয়, মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বাড়তে থাকে। কারণ একটি পঙ্গু শিশু– শুধু তার নিজের বা ঐ পরিবারের বোঝা নয় বরং সে সমাজেরও বিরাট বোঝা। মা-বাবার অনীহা, অনিচ্ছা, অজ্ঞতার কারণে সমাজের করুণার ছায়া তাকে আশ্রয়ের সন্ধানে থাকতে হয়। উন্নত বিশ্বে, যেমন রাশিয়ায় প্রতি দশ হাজার ৩৭ জন ডাক্তার ও ১০০ জন নার্স, পাশাপাশি ঘনবসতিপূর্ণ ভারতে প্রতি দশ হাজারে পৌনে তিনজন ডাক্তার এবং দুজন নার্স রয়েছে। আমাদের দেশে সেখানে প্রতি সাড়ে সাত হাজারে একজন ডাক্তার এবং প্রায় প্রতি বাইশ হাজারে একজন নার্স রয়েছে। অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে আমাদের ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা অনেক কম। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা, ওষুধ-পথ্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তি ও তার ব্যবহার আরও কম। ১৯৮৪-৮৫ সালে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় দেখেছিলাম সম্ভবত এক টাকা পঁচিশ পয়সা, যার সবটাই মাথাপিছু ব্যয়ও হয় না। কারণ শিক্ষা ব্যয়, গবেষণার খরচ, যানবাহন ও অন্যান্য প্রশাসনিক খরচও সম্ভবত এর মধ্যেই পড়ে। হাসপাতালে ভর্তি অধিকাংশ রোগীরই রয়েছে অপুষ্টিজনিত নানা সমস্যা। জন প্রতি বা একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ক্যালরীর যোগান প্রায় ১৯০০ ক্যালরী, যা প্রয়োজনের চেয়ে কম এবং এই মানুষদের জন্মের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পঞ্চাশ বছরের একটা পরিপূর্ণ জীবনে রোগ, জরা, ব্যাধি থেকে যত দূরে থাকবে, ততই মঙ্গল।

এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে একজন জুনিয়র ডাক্তার, যিনি আর্তের সেবায় নিয়োজিত মনোভাব নিয়ে আসেন, তিনিই বা কি করবেন। তিনি এই সমাজেরই একজন, এই পরিবারেরই একজন। এই দরিদ্র আর্থ-সামাজিক পরিবেশের

উন্নততর প্রতিনিধিও তিনি। তিনি আর্তের সেবা করেন– নিজে অভুক্ত থেকে। কাজেই ভূখানাঙ্গা জনগণের সেবা করবেন তাঁরা কোন সবল হাতে! তবুও তাঁরা এগিয়ে আসেন। কয়েকজন হাতে-গোণা বিশেষজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসক ও অবিবেচকভাবে উপার্জনকারী কিছু সংখ্যক ডাক্তার– যেমন ডাক্তার সমাজের মারাত্মক ব্যাধি, যা সমাজের অন্যান্য শাখায়ও বিদ্যমান, তাঁদের জন্য পুরো ডাক্তার সমাজকে দোষারোপ করাও যুক্তিহীন। বরং অর্থগৃধ্নু না হয়ে, অমানবিক না হয়ে, নিজের সুখ, ঘুম হারাম করে অধিকাংশ ডাক্তারই এগিয়ে আসেন– এটাই সত্য। তবুও কোথায় যেন বিভ্রাট। কেউ সইতে পারেন না কাউকে।

পরিমিত সময় এবং নিষ্ঠা নিয়ে, ভালভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিবার রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন– তাহলে রোগ ও রোগীর জটিলতা খুলতে তৎপর হবেন আরও সহজভাবে। পক্ষান্তরে, সাধারণ রোগে যদি বিশেষজ্ঞের কাছে দৌড়াতে হয় তাহলে আন্তরিকতা সত্ত্বেও সময়ের অভাবে রোগী ভালভাবে দেখা সম্ভব নয়। কারণ, একজন ডাক্তারের ভাল ব্যবহারে রোগীর অসুখ প্রায় অর্ধেক ভাল হয়ে যায়। ডাক্তারের আন্তরিকতা না থাকলে, ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি বেশি থাকলেই রোগীর সাথে ডাক্তারের ব্যবধান দিন দিন বাড়বে। বিতৃষ্ণা, অসহিষ্ণুতা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সব আভিধানিক শব্দই থেকে যাবে। রোগের সাথে ওষুধ, পথ্য– এগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করে তোলাও একজন ডাক্তারের কর্তব্য।

এসব সমস্যার সমাধান রাতারাতি সম্ভব নয়, তবে সমাধান অসম্ভব– এটাও সত্য নয়। বরং চিন্তা-ভাবনা ও পরিমিত মননশীলতার মাধ্যমে একটা সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠুক– এটা আমাদের মত জুনিয়র ডাক্তারদের আগামী দিনের স্বপ্ন।

অগ্রপথিক। জুন ১৯৮০

দুধ ঃ কুরআন ও বিজ্ঞানে

ডা. মুহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ 'তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদের পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্তনিঃসৃত বিশুদ্ধ দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।' (১৬ ঃ ৬৬)

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রথম এবং প্রধান খাদ্যই হচ্ছে দুধ। দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। শিশুরা মায়ের দুধ পান করে অনেকদিন পর্যন্ত জীবন ধারণ করে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষও দুধ পান করে বেঁচে থাকার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ণ লৌহ উপাদান না থাকায় বাইরে থেকে লৌহ সরবরাহ করলে দুধ খেয়ে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব।

আল্লাহ্ বলেন, 'তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে।' আমরা যাদের কাছ থেকে আমাদের অন্যতম জীবনোপকরণ দুধ পাই তারা হচ্ছে চতুষ্পদ জন্তু। মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। জ্ঞানে-গুণে, বুদ্ধিতে-শিক্ষায় মননে মানুষের সমতুল্য কোনও জাতি আল্লাহ্ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেননি। সেই শ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের খাদ্য তিঁনি তৈরি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর স্তনে। যে স্তন থেকে চতুষ্পদ জন্তুর বাচ্চা দুধ খেয়ে জীবন ধারণ করে, সে স্তন থেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবন মানুষের জন্য দুধ আহরিত হয়। মানুষকে মৃত্যুর পর আল্লাহ্র দরবারে হাজিরা দিয়ে ইহকালের কর্মের জবাবদিহি করতে হবে, এ জবাবদিহির উপর নির্ভর করে তাদেরকে বেহেশ্‌ত বা দোযখের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে। চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায় তা হবে না। ওখানে তাদেরকে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে হবে না। দুনিয়ার জীবনই তাদের শেষ জীবন। কিন্তু দুনিয়াতে জীবন ধারণের বেলায় মানুষের জীবন ও পশুর জীবনকে দুধের উপর নির্ভরশীল করে পশুকে আল্লাহ্র সৃষ্টির অঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে মানুষকে বাধ্য করা হয়েছে। মানুষ যেমন আল্লাহ্র এক সৃষ্টি, পশুও তেমনি তারই সৃষ্টি। মর্যাদা হিসেবে মানুষ ও পশুর মাঝে বিরাট ব্যবধান থাকলেও সৃষ্টি হিসেবে মানুষ ও জন্তু আল্লাহ্র কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। জন্তুর দুধ

মানুষের খাদ্য হিসেবে নির্বাচিত করার মাঝে রয়েছে এক অলৌকিক দর্শন। এক সৃষ্টির প্রতি আরেক সৃষ্টির মহব্বত বা মমত্ববোধ তৈরি করার এ যে এক অভূতপূর্ব কৌশল। এখানে নিহিত রয়েছে হক্কুল-ইবাদ-এর গূঢ় রহস্য। চতুষ্পদ জন্তুদের মাঝে চিন্তা করার যে অবকাশ রয়েছে বলে আল্লাহ্ বর্ণনা করেন এটি তাঁর একটি নিদর্শন।

চতুষ্পদ জন্তুদের স্তন থেকে দুধ আহরিত হয়। এখানেও মানুষের জন্য চিন্তা করার যথেষ্ট খোরাক রয়েছে। চতুষ্পদ জন্তুরা ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। ঘাস আর লতা-পাতাকে বেঁটে রস বের করলে তা থেকে এক ফোঁটা দুধ তৈরি করা যাবে না। যেটুকু খাদ্য খেয়ে চতুষ্পদ জন্তু যে পরিমাণ দুধ সরবরাহ করে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সে বস্তু থেকে তার এক-দশমাংস দুধ কোনমতেই উৎপাদন করা সম্ভব নয়। শুধু খাদ্য পেলেই দুধ তৈরি হয় এমন নয়, খাদ্য না পেলেও চতুষ্পদ জন্তুর স্তন থেকে দুধ পাওয়া যায়। খাদ্যের প্রাচুর্যের সাথে দুধের পরিমাণের হেরফের হয় মাত্র। এ যে আল্লাহর আরেক অপূর্ব হিকমতপূর্ণ কৌশল! মানুষের চিন্তার অতীত এ প্রক্রিয়া। পশুর স্তন ও দেহ যেন এক স্বয়ংক্রিয় দুগ্ধ উৎপাদন কারখানা! এ কারখানার সাথে মানুষের তৈরি কোন কারখানারই তুলনা হতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদের পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্তনিঃসৃত বিশুদ্ধ দুগ্ধ....। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলিতে একত্রিত হলে পাকস্থলি তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলির এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়। রক্তকে পৃথক করে রগের মধ্যে পরিচালিত করে এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলিতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়– যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।'

জন্তুর স্তন তার পেটের নিচের দিকে অবস্থিত। স্তনে রয়েছে পর্যাপ্ত রক্তনালী। এ রক্তনালী পুরো স্তনে রক্ত সরবরাহ করে আবার স্তন থেকে টেনে নিয়ে হৃদয়ে (হার্টে) স্থানান্তর করে। এ সকল রক্তনালির গা ঘেঁষেই অবস্থান করে স্তনের দুগ্ধনালী। এ সকল নালী থেকে বেরিয়ে আসে নির্ভেজাল খাঁটি দুধ। স্তনের উপরিভাগে থাকে জন্তুর বৃহৎ পেট। তার মাঝে থাকে তার পাকস্থলি, বৃহদান্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, মলভাণ্ড প্রভৃতি। এগুলোর কাছাকাছি স্থান থেকে আল্লাহর সীমাহীন কুদরতে বেরিয়ে আসে দুধ। জন্তুর উদরস্থিত বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় এবং কারিগরি সমন্বয় ও সহযোগিতায় দুধ তৈরি হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, 'তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে'। যে খাদ্য থেকে গোবর ও রক্ত তৈরি হয়, সে খাদ্যই দুধ তৈরিতে সহায়তা করে– যার কারণে আল্লাহ বলেন, 'বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্তনিঃসৃত দুগ্ধ'।

আল্লাহ একই আয়াতে আরো বলেন, 'যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।' আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে দুধের মত উপাদেয় খাদ্য আর দ্বিতীয়টি নেই। দুধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য। তাই দুধকে বলা হয় আদর্শ খাদ্য।

বিভিন্ন জন্তুর দুধে অবস্থিত বিভিন্ন পদার্থে ও রঙে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। গরুর দুধ হালকা সাদা, ক্যাঙারুর দুধ লাল ও মহিষের দুধ গাঢ় সাদা। তবে গুণের দিক দিয়ে দুধে মৌলিক তেমন কোন পার্থক্য নেই। গরুর দুধ, ছাগলের দুধ ও মহিষের দুধের শতকরা ১০০ ভাগই পানের উপযোগী। গরুর দুধে জলীয়াংশ থাকে ১০০ গ্রামে ৮৭.৫ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৮৬.৮ গ্রাম ও মহিষের দুধে ৮১ গ্রাম। এ কারণেই দুধ হয় তরল এবং কমবেশি ঘনত্বপ্রাপ্ত। গরুর দুধে আমিষ থাকে ৩.২ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৩.৩ গ্রাম, মহিষের দুধে ৪.৩ গ্রাম। গরু এবং ছাগলের দুধে আমিষের পরিমাণের পার্থক্য নগণ্য হলেও মহিষের দুধের পার্থক্য একটু বেশি। আমিষ মানবদেহের ক্ষয়পূরণ করে, বৃদ্ধি ঘটায়, পুষ্টি সাধন করে; জারক রস, হর্মোন, কিছু শক্তি ও তাপ উৎপাদনে সহায়তা করে, রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে, রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে, মাংসপেশী গঠন করে। আমিষের উদ্বৃত্ত অংশ শর্করা বা চর্বিতে পরিণত হতে পারে।

গরুর দুধে চর্বির পরিমাণ থাকে ৪.১ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৪.৫ গ্রাম এবং মহিষের দুধে ৮.৮ গ্রাম। গরু ও ছাগলের দুধে চর্বির পরিমাণ কাছাকাছি হলেও মহিষের দুধে চর্বির পরিমাণ বেশি। চর্বি মানব শরীরে শক্তি ও তাপ উৎপাদন করে, চর্মের কোমলতা ও মাংসের নমনীয়তা রক্ষা করে। চর্মের ও মাংসের মেদ বৃদ্ধি করে সৌন্দর্য ও শরীরের গঠনের সৌকর্য বৃদ্ধি করে। দুধে বিভিন্ন খনিজ পদার্থও বিদ্যমান। এর হার গরু, ছাগল ও মহিষে একই অর্থাৎ ০.৮ গ্রাম। খনিজ পদার্থ দেহ গঠনে গুরুত্বপর্ণ অবদান রাখে।

গরুর দুধে শর্করা জাতীয় পদার্থ থাকে ৪.৪ গ্রাম, ছাগলের দুধে ৪.৬ গ্রাম এবং মহিষের দুধে ৫ গ্রাম। শর্করা দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে, দেহের ওজন বাড়ায়।

গরুর দুধে ক্যালোরীর পরিমাণ ৬৭, ছাগলের দুধে ৭২ এবং মহিষের দুধে ১১৭। মহিষের দুধ এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ক্যালোরী সরবরাহ করে। ক্যালোরী হচ্ছে শক্তির একক। মানুষ ভিটামিনের অভাবে মারা যায় না কিন্তু ক্যালোরীর অভাবে মারা যায়। দুধ প্রয়োজনীয় ক্যালোরী সরবরাহ করে মানুষকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। এ ছাড়া দুধে আরো অনেক প্রয়োজনীয় মূল্যবান পদার্থ রয়েছে। গরুর দুধে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ১২০ মিলিগ্রাম, ছাগলের দুধ ১৭০ মিলিগ্রাম, মহিষের দুধে ১২০ মিলিগ্রাম। ফসফরাসের পরিমাণ গরুর দুধে ৯০ মিলিগ্রাম, ছাগলের দুধে ১২০ মিলিগ্রাম, মহিষের দুধে ১৩০ মিলিগ্রাম। ক্যারটিন গরুর দুধে ৪৯৭ মাইক্রোগ্রাম, ছাগলের দুধে ১৮২ মাইক্রোগ্রাম আর মহিষের দুধে ১৬০ মাইক্রোগ্রাম।

সকল দুধেরই সাধারণ গুণ হচ্ছে বলবর্ধক, আয়ুবর্ধক, স্মৃতিশক্তিবর্ধক, ক্লান্তি, নিদ্রাকারক এবং ত্রিদোষনাশক। প্রাতঃকালে দুধ পান করলে অগ্নিবৃদ্ধি, শারীরিক পুষ্টিবৃদ্ধি ও শুক্র বৃদ্ধি পায়। মধ্যাহ্নে দুধ পান করলে বল বৃদ্ধি ও কফ নাশ হয়। রাত্রে দুধ পান করলে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি হয়, আরামপ্রদ নিদ্রা হয়। শৈশব, বাল্য, কৈশোর যৌবন ও বার্ধক্য সকল বয়সেই দুধ পান করা হিতকর। গরুর দুধ বাত, পিত্ত, রক্তদোষ, হৃদরোগ, বেরিবেরি ও ন্যাফ্রাইটিস রোগে উপকার করে। ছাগলের দুধ মলরোধক এবং তা রক্তাতিসার ও রক্ত আমাশয়ে উপকার করে। মহিষের দুধ রক্তপিত্ত ও দাহ নাশ করে।

দুধ থেকে তৈরি হয় দধি, ঘি, মাখন, পনির, ঘোল প্রভৃতি। নানা প্রকার মিষ্টি ও খাদ্য তৈরিতেও দুধ ব্যবহৃত হয়। এগুলো মানব শরীরের জন্য উপাদেয় ও হিতকর। মিষ্টি দই মধুর রস সরবরাহকারক, শুক্রবর্ধক, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তের শান্তিদায়ক, পুষ্টিকর ও কফনাশক। তা মেদ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। অম্ল বা টক দই অগ্নিবর্ধক, পিত্ত, রক্ত ও কফ বর্ধক, মলরোধক, শোথজনক, পুষ্টিকর ও অরুচিনাশক। ঘি শরীরে চর্বি সরবরাহের এক শ্রেষ্ঠ উৎস। চতুষ্পদ জন্তুর দুধ থেকে তৈরি সকল ঘি-ই আয়ু বাড়ায়, দেহের দৃঢ়তা বাড়ায়, শীত নাশ করে, বল বাড়ায়, কাশি, সৌকুমার্য বৃদ্ধিসহ স্মৃতিশক্তি বর্ধিত করে। রক্তপিত্তে, নেত্ররোগে, শুক্ররোগে ঘি বিশেষ উপকারী। পুরাতন ঘি আক্রান্ত স্থানে মালিশ করলে ব্যথা-বেদনা ও পুরনো সর্দি উপশম হয়।

ঘোল ত্রিদোষনাশক, রুচিবর্ধক, শ্রান্ত-ক্লান্তি হরণকারক, বমন, অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, কলেরা, বাত, জ্বর, ন্যাবা, প্রমেহ, উদর ও কোষ্ঠ সংক্রান্ত রোগের বিশেষ উপকারী।

দুধ প্রকৃতপক্ষে এক উপকারী নিয়ামত। দুধ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে মায়ের দুধের প্রসঙ্গ আসে। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়াবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।'– সূরা বাকারা ঃ ২৩৩ আয়াত।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা আহকাম-এর ১৫ নং আয়াতের এক স্থানে বলেন, "…. তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস।……" ইমাম আবু হানিফা (র) কুরআনের কোনও কোনও আয়াত ও হাদীসের আলোকে শিশুর দুর্বলতার ক্ষেত্রে ত্রিশ মাস পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যদান করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফলে শিশুর জন্ম পরবর্তী আড়াই বছর শিশুর প্রথম এবং প্রধান খাদ্যই থাকে মায়ের দুধ। মায়ের দুধ শিশুর জন্য একটি আদর্শ খাদ্য। শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোনও বিকল্প নেই। শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জীবাণু ধ্বংসকারী

ল্যাকটোফেরিন, কেনডিডা, এলকিবেকনস জাতীয় ফাংগাস ও ইকোলাই, মিগোলা জাতীয় জীবাণুর বিস্তৃতি প্রতিরোধ করে। রক্তে ভাসমান লৌহ কণিকার সংগে যুক্ত হয়ে জীবাণু বেঁচে থাকে ও বিস্তৃতি লাভ করে। মায়ের দুধে লৌহের উপস্থিতি না থাকায় জীবাণু সংক্রমণ প্রতিহত হয়। মায়ের দুধে পলি আনস্যাচুরেবেজ চর্বি বেশি থাকে। এ চর্বি শিশু সহজেই হযম করতে পারে। শিশুর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের আবরণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় কোলেস্টেরল মায়ের দুধে বেশি থাকে। মায়ের দুধে থাকে দুধের চর্বি হযমের জন্য প্রচুর লাইসেস্ জাতীয় এনজাইম। মায়ের দুধে থাকে প্রয়োজনীয় ল্যাকটোজি, উপরন্তু বিফির্ডাস ফ্যাক্টর নামক এক ধরনের বিশেষ শর্করা থাকে চল্লিশ গুণ বেশি। তা ছাড়া মায়ের দুধে থাকে পানি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড, ভিটামিন, এ্যামাইনো এসিড, হিস্টিডিন, লিউসিন, থ্রিওনিন প্রভৃতি পদার্থ।

মায়ের দুধ যেমন উপাদেয় তেমনি উপকারী। মা ও শিশুর মধ্যে স্নেহের বন্ধন দৃঢ় করে এ দুধ। মায়ের কর্তব্য সচেতনতা বৃদ্ধি করে। শিশুর বাঁচার উপকরণ এ দুধ। এ দুধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে শিশু হয় সুস্থ, সবল, স্বাস্থ্যবান ও উজ্জ্বল। মায়ের দুধ পানকারী শিশুদের উদরাময়, ফ্লু ও চর্মরোগ হয় না। নিয়মিত দুধ দানকারী মায়ের স্তন্য ক্যান্সারের আশংকা থাকে না।

দুধ মায়েরই হোক বা চতুষ্পদ প্রাণীরই হোক, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমাদের জন্য বিশেষ নিয়ামত। কুরআন দুধের প্রশংসা করেছে, দুধ প্রকৃতপক্ষেই মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। কুরআনের কথার সত্যতা বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। ফলে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে দুধ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান কুরআন-বর্ণিত আল্লাহ্র বাণীরই সত্যতার প্রতিধ্বনি করে।

অগ্রপথিক। সেপ্টেম্বর ১৯৯

ঘাতক ব্যাধি এইডস ঃ মৃত্যুই যার পরিণাম

কবির উদ্দিন আহমদ

'স্থলে ও পানিতে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়াইয়া পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাইতে চাহেন, যাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসে।' (সূরা রূম ঃ ৪১)

'লজ্জাহীনতার যত পন্থা আছে, উহার নিকটেও যাইও না। তাহা প্রকাশ্যই হউক আর গোপনই হউক।' (সূরা আনআম ঃ ১১৫)

'আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করিয়াছি যাহার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাহাদের পর সৃষ্টি করিয়াছি অন্য জাতি।' (সূরা আম্বিয়া ঃ ১১)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। যে কেহই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে তাহাকে তো শয়তান নিলর্জ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করিবে। যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকিত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হইতে পারিত না।' (সূরা নূর ঃ ২১)

রাসূলে আকরাম (সা) বলেছেন, "যখনই কোন জাতি প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তখনই তাদের মধ্যে এমন ধরনের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে যা ইতিপূর্বে কোন জাতিতে আসেনি।" (ইবনে মাযা)

নবী করীম (সা) বলেন, "যখন তুমি লজ্জা ত্যাগ করবে তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পার।" (বুখারী-মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা)-এর বর্ণনা মতে জানা যায় যে, নবী করীম (সা) একদা বাণী প্রদান করেন, "হে মুহাজির সম্প্রদায়! এমন পাঁচটি অভ্যাস রয়েছে, সেগুলো যেন তোমাদের মধ্যে পাওয়া না যায়, সে জন্য আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এগুলোর মধ্যে হচ্ছে 'অশ্লীলতা'। যখন কোন জাতির মধ্যে 'অশ্লীলতা' প্রকাশ পাবে তখন তাহাদের মাঝে প্লেগ ও বিভিন্ন প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করিবে, যা তাহাদের পূর্বপুরুষরা কখনো শোনেনি।" (আল-হাদীস, ফিরদাউস লিদ্দায় লামী, ৫ম খণ্ড)

রাসূলে আকরাম (সা) আরো বলেছেন, "অন্যায় দুষ্কর্ম হওয়ার পরও লোকেরা যদি তা নির্মূল করার চেষ্টা না করে তবে অচিরেই তারা সকলে আল্লাহর আজাব দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে।" (তিরমিযী)

আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, "সেই মহান সত্তার কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার জীবন—তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের আদেশ করবে এবং অন্যায় দুষ্কৃতিতে বাধা দেবে। যদি তা না কর তবে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি আজাব নাযিল করবেন। তারপর তোমরা তাকে ডাকবে কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না।" (তিরমিযী)

রাসূল করীম (সা) বলেছেন, "আমার উম্মতের কিছু লোক কওমে লুতের অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে তখন তাদের উপরও অনুরূপ আজাব আসার অপেক্ষা কর।" (তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৮০৬-৮০৭)

আজ থেকে ১৪'শ বছর পূর্বে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দেয়া মানব জাতির জন্য সতর্কতামূলক কল্যাণকর বাণী নতুন করে বর্তমান বিশ্ববাসীদের প্রমাণ করে দিল, মানুষের কুৎসিত কর্ম ও বেহায়াপনা অর্থাৎ মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড কত ভয়ঙ্করভাবে তাদের ধ্বংস ডেকে আনে।

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখনই কোন সম্প্রদায়, জাতি বা মানব গোষ্ঠিকে বিশেষ করে জ্ঞান দান করেছেন, সর্বদিক থেকে অভাবমুক্ত করে সম্পদশালী করেছেন বা অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন, ঠিক তখনই তারা নানা ধরনের অন্যায় আচরণ, স্বেচ্ছাচারমূলক কর্মকাণ্ডসহ বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে, যার ফলে তারা সুস্থ চিন্তা-চেতনা-সম্পন্ন মানবিক কর্মকাণ্ডগুলো নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সম্পন্ন করার পরিবর্তে অনিয়মতান্ত্রিক ও অমানবিক পন্থা অবলম্বনের কারণে ক্রমে ক্রমে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত রুচিতে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অন্যায় অপরাধ এবং মানবতাবিরোধী যত প্রকার কর্মকাণ্ড আছে, যা মানুষের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং যা মানব সভ্যতা তথা শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিপর্যস্ত করে তোলে, সম্মিলিতভাবে তাই করেছে এবং একে অপরকে উৎসাহ প্রদান করেছে। যার দরুন দেখা যায় ঐ সমস্ত অঞ্চল, সম্প্রদায়, জাতি বা মানব গোষ্ঠীকে আল্লাহ পাক নানা রকমের আজগুবি রোগ, শোক, প্রাকৃতিক বিপর্যয়সহ বিভিন্ন ধরনের বালা মুসিবত দিয়ে ধ্বংস নতুবা বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন। যার সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে পৃথিবীর বুকে রয়েছে বহু নিদর্শন এবং তাদের বিপর্যয়মূলক কর্মকাণ্ডের বহু ইতিহাস। মানুষ তার সৃষ্টির অতীত এবং ভবিষ্যৎ পরিণতি অর্থাৎ মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে শয়তানের প্ররোচনায়

বিভিন্ন ক্ষতিকর কর্মে লিপ্ত থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে 'আছর' নামক সূরায় যুগের কসম করে বলেছেন ঃ

"নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত এবং সেই ক্ষতির কবল হইতে তাহারাই মুক্ত, যাহারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সহিত পালন করে। তাহা হইল ঈমান, সৎকর্ম, অপরকে সত্যের পথে আহ্বান করেন এবং সবরের উপদেশ দান করেন।"

যদিও সকল ধর্মেই অন্যায় অপরাধ অর্থাৎ মানবতাবিরোধী অশ্লীল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া হয়েছে, একমাত্র ইসলাম ঐ সকল ব্যাপারে শুধু উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি—এর ফলে মানব সমাজ কি ধরনের বা কিভাবে অথবা কেন ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনে কিংবা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, তার বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিচার বিশ্লেষণসহ মানুষের সামনে তুলে ধরেছে এবং মানব জাতি বা সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংস কিংবা চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য প্রবল প্রতিরোধসহ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ্ পাক জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে মানব জাতির সকলকে সীমাবদ্ধ জ্ঞান প্রদান করেছেন, যাতে করে এক মানুষ অপর মানুষের দ্বারা বিভিন্ন দিক থেকে নানা বিষয়ে উপকৃত হতে পারে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজ্ঞানী। তাঁর জ্ঞানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানব জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের সম্মান দিয়ে এবং পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে। আর এক এক জনকে দিয়েছেন বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক জ্ঞান, যাতে করে সম্মিলিতভাবে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা মানব সম্প্রদায় তথা জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারেন। ঐ সমস্ত বিশেষ জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তিসহ বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ যাতে করে শয়তানের প্ররোচনায় তাদের অর্জিত জ্ঞান, বুদ্ধি, চিন্তা, চেতনা বিকৃত, ঘৃণিত, অমানবিক অথবা সীমালংঘনকারী রূপে আত্মপ্রকাশ না করতে পারে এবং পথভ্রষ্ট না হতে পারে তার জন্য আল্লাহ্ পাক যুগে যুগে বহু নবী-রাসূল পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বিধি-বিধান সম্বলিত বাণী বা 'আসমানী কিতাব' দিয়ে। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহ্ পাকের ঐ সমস্ত বিধি বিধান-সম্বলিত সাবধান বাণীকে অবজ্ঞা, অগ্রাহ্য অথবা অবহেলা করেছে, নবী-রাসূলদের সাথে বেয়াদবী করেছে, তাঁদেরকে অপমান কিংবা লাঞ্ছিত করেছে, তখনই ঐ সব জনগোষ্ঠির উপর নাযিল হয়েছে আল্লাহর গজবরূপে বিভিন্ন রকমের দুরারোগ্য ব্যাধি। শুধু তাই নয়, তাদের কার্যকলাপের ধরন অনুযায়ী নানা প্রকারের বালা মুছিবত দিয়ে তিনি ধ্বংস অথবা পঙ্গু করে দিয়েছেন ঐ সমস্ত অভিশপ্ত জনগোষ্ঠিকে, উন্মোচিত করে দিয়েছেন তাদের সভ্যতার আবরণে অসভ্য পৈশাচিক কর্মকাণ্ডগুলো—অতীত ইতিহাসে যার বহু নিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে। এরপর এলো "আইয়ামে জাহেলিয়াত" বা

"অন্ধকার যুগ" অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক যুগ। ঐ সময় সারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের আচরণ এবং কার্যকলাপ এতই চরম নিকৃষ্টের পর্যায়ে পৌঁছেছিল যা পশুত্বকেও হার মানায়। মারামারি, খুনোখুনি, নগ্ন-নৃত্য, গান-বাজনা, মদ্যপান, জুয়া খেলা, সুদের কারবার, জেনা-ব্যভিচার, অন্যায়, অত্যাচার এবং অবিচারসহ যত ধরনের অমানবিক কাজ ছিল সবই মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তারা ঐ সমস্ত সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে কোনও অন্যায় বলেই মনে করত না। বরং গর্বের সাথে নির্লজ্জভাবে তাদের ইত্যাকার কার্যাদি চালিয়ে যেত। মানবতার যখন এমনি শোচনীয় অবস্থা, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক যুগ, গোটা মানব সম্প্রদায় যখন নিশ্চিত ধ্বংসের সম্মুখীন, ঠিক তখনই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পাঠালেন সর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে। তিনি ছিলেন 'সাইয়্যেদুল মুরসালিন' 'সারা বিশ্বের রহমত' স্বরূপ। ফেরেশতা হযরত জিব্রাইল (আ)-এর মারফত তাঁর কাছে আল্লাহ পাঠালেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ কিতাব 'আল-কুরআন, যা মানব জাতির পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। তাঁর পেয়ারা হাবীব সাবধান বাণী প্রচার করলেন বিশ্ববাসীর প্রতি পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে। বার বার সতর্ক করে দিলেন সমগ্র মানব জাতিকে তাদের জীবন যাত্রার সকল প্রকার কর্মকাণ্ড যেন অতীতের অভিশপ্ত জাতিগুলোর মত না হয়। কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দিলেন, যাতে মনগড়া বেপরোয়া উচ্ছৃংখল চিন্তাধারার মাধ্যমে কোনও সমাজ, দেশ ও জাতি পরিচালিত না হয়। তাহলে তাদের ভয়াবহ বিপদ, দুর্গতি এবং অধঃগতির কোনও সীমা থাকবে না।

আমরা বর্তমান বিশ্বের মানব সমাজ বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকার মত উন্নত দেশগুলোতে যত ধরনের ভয়ঙ্কর রোগ বালাই, অস্থিরতাসহ নানা রকমের দুর্ঘটনা, বালা-মুছিবত এবং ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হতে দেখছি তার কারণ অনুসন্ধান করলে স্পষ্টভাবেই দেখা যাবে যে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশিত পথে না চলা, তাঁদের আরোপিত বিধি-নিষেধগুলোকে অবহেলা করা এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নির্লজ্জ প্রচেষ্টারই ফল। আল্লাহ পাক অতীতের নাফরমান, সীমালংঘনকারী মানব গোষ্ঠীকে কোন্ কোন্ আচরণ ও কার্যের জন্য কি কি ধরনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনে ব্যক্ত করেছেন। বর্তমানে বিশ্ববাসী আল্লাহ পাকের সকল প্রকার কঠোর হুঁশিয়ারী এবং সতর্কতামূলক বাণী ধৃষ্টতার সাথে উপেক্ষা করে শুধু বিদ্রোহী হিসেবেই চিহ্নিত হয়নি বরং সৃষ্টিকর্তার প্রতি সরাসরি চ্যালেঞ্জ প্রদানের সমতুল্য অপরাধ করেছে। তাই তো আমরা সারা বিশ্বে, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোতে দেখতে পাচ্ছি

আতংকজনক হারে সামাজিক অবক্ষয়। তারা সভ্যতার মুখোস পরে সুশিক্ষার দাবীদার হয়ে চালিয়ে যাচ্ছে নানা ধরনের অপকর্ম এবং তা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে এ অপকর্মের ফসল পৃথিবীর সমস্ত দেশে। ফলে সারা বিশ্বের সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে ধ্বংস এবং ভয়াবহ বিপর্যয়ের আভাস। এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশবাসীসহ সারা বিশ্ববাসীকে রক্ষা করতে হলে এ মুহূর্তে যা করা অতীব জরুরী, তা নিয়েই লেখা এ প্রবন্ধ ভয়ঙ্কর মৃত্যু এইডস থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়।

সারাবিশ্বের অধিবাসী আজ এইডস নামক এক ভয়ংকর সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে প্রকম্পিত। এইডস আজ বিশ্বের চরম সমস্যা। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনো এ রোগ নিরাময়ের কোনও প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে পারেনি। এ মরণ ব্যাধির কোনও প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কারের সম্ভাবনাও এখন পর্যন্ত অনিশ্চিত।

বর্তমান বিশ্বের এ মারাত্মক ব্যাধি যে ভাইরাস-এর দ্বারা সংক্রমিত হয়, তার নাম "এইচ.আই.ভি" বা হিউম্যান ইম্যুনু ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস'। এ ভাইরাসটি শরীরে প্রবেশ করার পর 'রক্তের টি-হেলপার শ্বেত কণিকাকে আক্রমণ করে ও তার সকল কার্যক্ষমতা নষ্ট করে ফেলে। মানুষের শরীরকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই এ কণিকাগুলির অন্যতম প্রধান কাজ। ফলে এইড্স সংক্রমণের কারণে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বলতে কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। আক্রান্ত ব্যক্তি এ জন্য ক্রমাগত অন্যান্য ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক কিংবা পরজীবী রোগজীবাণুর সহজ শিকারে পরিণত হয়। সাধারণ রোগ ব্যাধি মানুষকে সহজে কাবু করে ফেলে। এ সমস্ত রোগ যেগুলি সাধারণ ও প্রচলিত ঔষধের দ্বারা সহজে নিরাময়যোগ্য ছিল তা ক্রমান্বয়ে চিকিৎসার অতীত হয়ে পড়ে। তার ফলে পৃথিবীতে প্রচলিত সকল চিকিৎসা প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ প্রমাণ করে আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং কোনও একদিন নিরতিশয় অসহায়ভাবে মারা যায়।

এইডস বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রোগ, যা ব্যক্তিবিশেষের অশ্লীল এবং অমানবিক কর্মকাণ্ডের পরিণতি। ইউরোপ ও আমেরিকায় রোগটির বিস্তার মূলত সমকামী পুরুষ ও নেশাকর দ্রব্যগ্রহীতাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। আফ্রিকায় দেখা যায় সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে। এ রোগ নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে আক্রমণ করে। অবৈধ যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায় সবচেয়ে বেশী। মহিলারা পুরুষদের তুলনায় ১০% এইড্স সংক্রমণের ক্ষেত্রে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। সংসারে সাধারণত মহিলারাই পরিচারিকার কাজসহ সকল প্রকার কার্য করে থাকে। সুতরাং কেউ যদি এইড্স আক্রান্ত হয় তবে গোটা পরিবারে ধ্বংস অনিবার্য। যে মহিলার এইডস্ হয়েছে অথবা যার দেহে এইড্স ভাইরাস আছে তার গর্ভের সন্তানের মধ্যেও এইড্স-এর জীবাণু সংক্রমণের আশংকা থাকবে এবং সে জন্য তারও যে কোনও সময় এইড্স হতে পারে।

এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাধারণত ৩ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এইড্‌স রোগীতে পরিণত হয়। একবার এইড্‌স রোগ শনাক্ত করা হলে ঐ ব্যক্তির আয়ু উন্নয়নশীল দেশে ৬-১২ মাস এবং উন্নত দেশে ১-২ বৎসর পর্যন্ত হতে পারে। শিশুদের মধ্যে যারা এইচ.আই.ভি. নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাদের অনেকেরই এইড্‌স-এর উপসর্গ প্রথম বছরেই দেখা দেয় এবং বাকীরা ৮ বা ততোধিক বৎসরের মধ্যে আক্রান্ত হয়।

যৌন অপকর্মের মধ্যে সমকামিতাকেই চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা এ ভয়ংকর রোগ হবার বা প্রসারের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সবচেয়ে লজ্জাকর ব্যাপার এই যে, আধুনিক সভ্যতার দাবীদার পাশ্চাত্য জগতের কোন কোন দেশে আইন করে সমকামিতাকে বৈধ করা হয়েছে কিন্তু দেরীতে হলেও এখন তারা বুঝতে পেরেছে এটি একটি অমানবিক এবং অশ্লীল কাজ; সমাজ এবং দেশ নিশ্চিত ধ্বংস বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাই আবার ইউরোপ এবং আমেরিকাসহ সকল দেশেই সমকামিতা পরিহার করার শ্লোগান শুরু হয়েছে। এখন 'এনাল সেক্স' বা সমকামিতায় উৎসাহী পাশ্চাত্য জগতে এনাল সেক্স-বিরোধী শ্লোগানের বাণী থাকে, "এমন কোন যৌনকর্মে অংশ নিও না যাতে তোমার বা তোমার সাথীর লিঙ্গ, যোনীপথ, মলদ্বার বা মুখ গহ্বর বিনষ্ট হতে পারে।". মোটকথা, মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় যে সব অপকর্মের বিরুদ্ধে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণী দ্বারা মানব জাতিকে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল (সা) বারে বারে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, আজ আসন্ন ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে মানুষ সেসব অনাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনমুখর হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধু গান গেয়ে, সভা সমিতি করে, বড় বড় বক্তব্য বা বিবৃতি দিয়ে মূল্যবান পোস্টার, লিফলেট লাগালেই এ আন্দোলনে জয়ী হওয়া বা মহাবিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না বরং এ মহাবিপদ এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে মানবতাবিরোধী সকল প্রকার অশ্লীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়তে হবে এবং এগুলোকে গুরুতর অন্যায় মনে করে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, এইচ.আই.ভি.-আক্রান্ত ব্যক্তিদের বয়স ১৫-৫৯ এর মধ্যে। এর মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশী দেখা যায় ১৫-২০ বৎসর বয়সী তরুণ যুবকদের মধ্যে। তরুণ যুবকরাই জাতির মেরুদণ্ড, জাতির ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি। তাই এদের মাঝে এইড্‌স সংক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংসেরই ইঙ্গিত বহন করে। ইউরোপ আমেরিকায় অসংযত ও স্বেচ্ছাচারী যৌন অভ্যাসের প্রবণতা একদিকে যেমন এইড্‌স-এর দ্রুত বিস্তার ঘটাচ্ছে তেমনি সেখানে প্রতিরোধের ব্যবস্থাও চলছে ব্যাপকভাবে। আবার বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এসব দেশের তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতেই বিপদের আশংকা সবচেয়ে বেশী। এর কারণ অনুন্নত দেশের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সস্তায় যৌন

বিনোদন, দারিদ্র্য ও অপুষ্টিজনিত দেহের প্রতিরোধ শক্তির দুর্বলতা, বহু ব্যবহৃত সুঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহারের প্রচলিত রীতি, পূর্ব পরীক্ষা ছাড়া রক্ত ভরণের প্রবণতা ইত্যাদি এইড্স-এর পক্ষে এ জাতীয় অনুকূল পরিবেশ রোগটিকে যে কোন সময় সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে মহামারীর পর্যায়ে ঠেলে দিতে পারে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীর নাগরিকদের এইড্স সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৯৮৮ থেকে প্রতি বছর পয়লা ডিসেম্বর 'বিশ্ব এইড্স দিবস' পালিত হয়। এ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তিনটি জোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রথমটি হলো এইড্স ভাইরাস-এর সংক্রমণ প্রতিরোধ। দ্বিতীয়ত এ সংক্রমণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিঘাত কমিয়ে আনা এবং অতীতে এইড্স-এর বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার ঐক্য সাধন। এ তিনটি ক্ষেত্রেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তরফ থেকে নিরলস কাজ চল্ছে যাতে এইড্স-এর ধ্বংসাত্মক বিস্তার বেশিদূর অগ্রসর হতে না পারে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা মনে করে, এ ঘাতক ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার প্রধান উপায় হচ্ছে এইড্স প্রতিরোধ সংক্রান্ত যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হচ্ছে যৌনাচারে সংযত থাকা। অন্যথায়, যৌন সঙ্গী বা সঙ্গীনী এইড্স ভাইরাসের বাহক কি না সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে নিশ্চিত হওয়া আর তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে পুরুষের পক্ষে কনডম ব্যবহার করা। অত্যন্ত ভালভাবে পরীক্ষা না করে কোন ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ অবশ্য পরিত্যাজ্য। এ ছাড়া জীবাণুমুক্ত সুঁচ ও ডিস্পোজেবল সিরিঞ্জ ব্যতীত ইন্জেকশন নেওয়া কখনই উচিত নয়। এমনকি এইডস আক্রান্ত মহিলাদের সন্তান ধারণ করা থেকেও বিরত রাখা। এইডস এখন একটি প্যানডেমিক সমস্যা। বিশ্বব্যাপী এ ব্যাধি শুরু থেকে ব্যাপক আকারে দেখা দেয়া পর্যন্ত প্রায় ১৩ মিলিয়ন নারী, পুরুষ ও শিশু এইচ.আই.ভি.তে আক্রান্ত হয়েছে, যা এইডস রোগের কারণ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী ২০০০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ মিলিয়ন এবং এইডস রোগীর সংখ্যা ১২ থেকে ১৮ মিলিয়ন হতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ৫ থেকে ৬ হাজার লোক এইচ.আই.ভি-তে আক্রান্ত হচ্ছে।

এইচ.আই.ভি-তে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ৩ থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত অত্যন্ত নীরবে এইডস-এর জীবাণু বসবাস করতে থাকে, যা সে নিজেও টের পায় না। এ কারণে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের অজান্তেই সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এ ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়।

মার্কিন চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে এইডস একটি পুরনো ও জটিল যৌন রোগ এবং অবৈধ যৌন সম্পর্ক এ রোগ ছড়াতে সাহায্য করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ লোক এইডস-এ আক্রান্ত। ভারতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ৫০ লক্ষ লোকের রক্তে

এইডস জীবাণু এইচ.আই.ভি. বহন করছে। বিগত বছরগুলোর তুলনায় এইচ.আই.ভি. আক্রান্তের হার নতুনভাবে বেড়ে চলছে, যা সারা বিশ্ববাসীর আতংক এবং উদ্বেগের কারণ। চীন, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে এ মারাত্মক ঘাতক ব্যাধি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বের ১৬৩টি দেশে দশ লাখ শিশুসহ ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখেরও বেশী এইডস রোগী রয়েছে। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর-এ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে বিশ্বব্যাপী এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত ছিল ১ লাখ লোক এবং পরবর্তী ৫ বছরে প্রায় ৩০ লাখ লোক এইডস-এ মারা গেছে।

যদিও এইডস নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবনের জোর প্রচেষ্টা চলছে, তবুও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে কার্যকরভাবে এইডস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রতিটি দেশের জাতীয় এইডস কমিটিগুলোর সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ভয়ংকর ব্যাধির মরণ ছোবল থেকে বিশ্বব্যাপী মানব জাতি বিশেষত তরুণ সমাজকে রক্ষা করার এখনই চরম ও পরম সময়। আর এজন্য সর্বপ্রথম জোরাল পদক্ষেপ নিতে হবে নৈতিক চরিত্র গঠনে। নৈতিক চরিত্রের প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। কারণ, নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন জাতি এবং সমাজকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। তারপর এইচ.আই.ভি. যাতে বিস্তার লাভ না করতে পারে সে ব্যাপারে সঠিক এবং সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হবে। সবচেয়ে জরুরী হল তরুণ সমাজকে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করতে হবে এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধ কঠোরভাবে পালন করতে উৎসাহিত করতে হবে। তা হলে বিশ্বব্যাপী এ ভয়ঙ্কর রোগ থেকে মুক্তি পাবে এবং এর বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে।

অগ্রপথিক। অক্টোবর ১৯৯৭

স্ট্রোক থেকে বাঁচুন

নূর-উন-নবী

স্ট্রোক। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে আকস্মিক মৃত্যু। স্ট্রোক আঁৎকে ওঠার মত একটা শব্দ। অত্যন্ত ভীতিকর শব্দ। আসলে এটা এমনই ভীতিকর নাম যে, আমেরিকার ডাক্তাররা বহু বছর এর উচ্চারণ এড়িয়ে চলতেন। ভয়াবহ হবার কারণ, স্ট্রোকে স্নায়ু এত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কারো কারো মতে স্ট্রোককে মস্তিষ্কে হার্ট এ্যাটাকও বলা যেতে পারে।

একবার স্ট্রোক হলে ধরে নিতে হবে ভবিষ্যতে আরো স্ট্রোক হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ছোট ছোট স্ট্রোক বা ট্রান্সিয়েন্ট ইসেমিক এ্যাটাকও (টিআইএ) ভবিষ্যতে প্রাণসংহারী রূপ নিতে পারে। ছোট ছোট স্ট্রোক থেকে কেউ সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে যেতে পারে অথবা শরীরের কোনও অংশ অবশও হয়ে যেতে পারে।

একদিক থেকে এটা পরিষ্কার যে, নিয়মিত রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে তা কমানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করলে স্ট্রোকের হার দ্রুত হ্রাস পেতে পারে। ডঃ ওয়েস্টন বলেন, রক্তচাপে ভোগেনি এ ধরনের স্ট্রোক-আক্রান্ত ব্যক্তি আমরা কদাচিৎ দেখেছি। এ দু'য়ের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

উক্ত রক্তচাপ সম্পর্কে ইভানস ও রোজির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো ঃ

শরীর ও মনের স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তচাপ বয়সের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপরে সব সময় অবস্থান করতে থাকলে এবং নিয়মিত চেকআপ ও চিকিৎসার প্রয়োজন পড়লে তবেই তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়ে থাকে।

মানুষের স্বাভাবিক রক্তচাপ কত ? একজন মাঝবয়সী লোকের শারীরিক ও মানসিক বিশ্রামের পর রক্তচাপ থাকে সিস্টলিক (Systolic) ১০০-১২০ মি. মি. এবং ডায়াস্টলিক (Diastolic) ৬০-৮০ মি.মি.। এ রক্তচাপের আবার বয়স অনুপাতে তারতম্য ঘটে থাকে। রক্তচাপ কত হলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলা যায় ? সাধারণত সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর কোন মানুষের রক্তচাপ যদি ১৪০/৯০ মি.মি.-এর বেশি থাকে তবে বলা হয় অমুক রক্তচাপে ভুগছেন। এটা কিন্তু সব বয়সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

যেমন—৭৫ বছরের একজন লোকের রক্তচাপ ১৭০/১০৫ না হলে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয় না। বাচ্চাদের বেলায়ও তেমনি তা ভিন্ন। তাই বলে সব উচ্চ রক্তচাপের রোগীরই যে চিকিৎসার প্রয়োজন তাও ঠিক নয়। দেখা গেছে যাদের ডায়াস্টলিক রক্তচাপ ১০০ মি.মি.-এর বেশি থাকে তাদের চিকিৎসা করলে বিভিন্ন জটিলতা এড়ানো সম্ভব। যাদের ডায়াস্টলিক রক্তচাপ ৯০-১০০ মি.মি. তাদের চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা এখন বিতর্কিত বিষয়।

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি দুই-ই কমান যায়। উদাহরণস্বরূপ ক্যালসিয়ামের কথাই ধরা যায়। ক্যালসিয়াম উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে বলে ধারণা করা হয়। কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, লবণ ও লবণজাত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকলে রক্তচাপ হ্রাস পেতে পারে। পরীক্ষায় এটাও দেখা গেছে, কম সোডিয়াম ও কম চর্বিযুক্ত খাদ্যও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা ও ওজন কমানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ধূমপায়ীদের মধ্যে যারা স্ট্রোকের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন তাদের শীঘ্রই এ আত্মঘাতী অভ্যাস বাদ দিতে হবে। ধূমপানে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেক বিশেষজ্ঞ এ কথা মানতে রাজী নন। তবে অন্যরা স্ট্রোক প্রশ্নে ধূমপানের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে "ধূমপান ও স্ট্রোকের ঝুঁকির মধ্যে ইতিবাচক সংযোগ রয়েছে।" হিউস্টন ভেটারনস এডমিনিস্ট্রেশন মেডিক্যাল সেন্টারের ড. জন মেয়ার মনে করেন যে, ধূমপান রক্তনালীর স্থিতিস্থাপকতার হ্রাস ঘটায় এবং ধীরে ধীরে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহকে সংকুচিত করে তোলে। তার মতে, ধূমপান স্ট্রোকের ঝুঁকি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়।

ড. মেয়ার ও তাঁর সহযোগী রবার্ট এল. রজার্স বলেন, যারা ২০ থেকে ৩০ বছর ধরে দৈনিক ২ থেকে ৩ প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করে তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি অধিকমাত্রায় বেড়ে যায়। বেশ কয়েক বছর আগে ড. মেয়ার ধূমপায়ী ও অধূমপায়ীদের মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের তুলনামূলক পরীক্ষা চালানোর কাজ শুরু করেন। তিনি বিপুলসংখ্যক ধূমপায়ী ও অধূমপায়ীর উপর পরীক্ষা চালান। পরীক্ষায় দেখা যায়, ধূমপায়ীদের রক্ত প্রবাহ কমে গিয়েছিল।

ড. মেয়ার বলেন, মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ পরীক্ষা করে ডাক্তার ও রোগী সম্ভাব্য স্ট্রোক সম্পর্কে আগাম অবহিত হতে পারেন এবং তা থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে পারেন। তিনি বলেন, আমরা দেখেছি যে, স্ট্রোকের প্রায় দু'বছর আগে থেকেই মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ হ্রাস পাওয়া শুরু হয়। তিনি আরো বলেন, আমরা মনে করি স্ট্রোক হবার অনেক আশঙ্কা রয়েছে এ ধরনের ব্যক্তি ধূমপান ছেড়ে দিলে তাদের মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। তবে এতে করে রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক স্তরে ফিরে না গেলেও সন্তোষজনক স্তরে গিয়ে পৌঁছবে।

ভিটামিন সি স্ট্রোক প্রতিরোধে সহায়তা করে। বৃটিশ গবেষকরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন, যে সকল ব্যক্তি প্রচুর পরিমাণে তাজা ফল ও সব্জি খায় তাদের স্ট্রোকে প্রাণহানির আশংকা কমে যায়। শরীর চর্চার মাধ্যমেও স্ট্রোককে প্রতিরোধ করা যায়। নেদারল্যান্ডে একটি জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে যে, শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে স্ট্রোকের ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।

কিছুসংখ্যক অভিমত হলো যে ব্যাপকভাবে এন্টিহাইপারটেশন ঔষধ প্রয়োগের পর থেকে স্ট্রোক আক্রান্তের হার হ্রাস পেতে শুরু করে। আবার অন্যান্যের মতে ব্যাপকহারে ভিটামিন সি গ্রহণ এবং লবণের ব্যবহার কমিয়ে দেয়ার মাধ্যমেও স্ট্রোক প্রতিহত করা হচ্ছে।

ড. হোয়েল্টনের মতে উচ্চ রক্তচাপ অথবা স্ট্রোক স্বাভাবিকভাবে মানুষকে আক্রমণ করে না। তিনি বলেন, বয়সের ভারে স্ট্রোক অনিবার্য হয়ে পড়েছে এ ধরনের প্রমাণ নেই। তিনি আরো বলেন, অনেক আদিম সমাজে দেখা গেছে বৃদ্ধ বয়সে মানুষ রক্তচাপ বৃদ্ধি অথবা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়নি। এ কারণে আমরা স্ট্রোককে 'পরিবেশগত অনিয়ম' বলে অভিহিত করতে পারি। শরীরে রাসায়নিক কারণে এটা ঘটে না। অতএব স্ট্রোক প্রতিরোধযোগ্য রোগ।

অগ্রপথিক। জুলাই ১৯৮৭

মায়ের দুধের উপকারিতা

মোহাম্মদ রফিকউল্লাহ্ এমরান

মা! একটি মাত্র বর্ণের কি অনুপম, কি অতুলনীয় শব্দ। এক বর্ণের শব্দটি আমাদের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। মা ও শিশুর মধ্যে যে সম্পর্ক পৃথিবীর মধ্যে বোধ করি এই সম্পর্কটিই সবচেয়ে বেশি নির্মল, নিষ্পাপ, নির্মোহ এক অনাবিল অনুভূতিসম্পন্ন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পর্ক।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার মা ও শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতন। বিশেষত বাংলাদেশের শিশুদের সার্বিক কল্যাণে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করে। উক্ত শিশুনীতি বাস্তবায়ন-পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে 'শিশুর জন্ম ও বেঁচে থাকা' শীর্ষক শিরোনামে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে– সকল শিশুর নিরাপদ জন্মগ্রহণ ও বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার মাধ্যমে শিশুর নিরাপদ জন্ম এবং বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা নেওয়া এবং প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-উত্তর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। কর্মজীবী মহিলাদের প্রসূতিকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া।

শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়েদের উদ্বুদ্ধ করা। কর্মজীবী মহিলারা যাতে তাদের কর্মস্থলে বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়াতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

আজকের শিশু আগামী দিনের রাষ্ট্রীয় কর্ণধার। সুস্থ শিশু মানেই সুস্থ জাতি। বাংলাদেশের শিশুদের পুষ্টিহীনতা অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। শিশুদের সুস্থ, নিরাপদ ও সবলভাবে বেড়ে ওঠার জন্য মায়ের দুধের কোনও বিকল্প নেই। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনে মায়ের দুধই সর্বোত্তম ও নিরাপদ খাবার। সচেতন শিশুদের স্বাস্থ্যবান হয়ে গড়ে ওঠার জন্য মায়ের স্তন্য দানের সমতুল্য অন্য কোনও পন্থা নেই; এই উপায়ে মা ও শিশু উভয়েই স্বাস্থ্যের জন্য বিবেচিত হয় অনন্য শারীরিক মানসিক ভিত্তি; মায়ের দুধের সংক্রমণকারী শক্তি শিশুকে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং স্তন্য দান ও ঘন ঘন সন্তান না হওয়ার মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে।

মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর পবিত্র কালাম পাকের সূরা আল-বাকারায় সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন, "মায়েরা তাদের সন্তানদের পুরো ২ বছর বুকের দুধ পান করাবে ....।" (আয়াত ২৩৩)। এমতাবস্থায় একথা অনস্বীকার্য যে, শিশুর প্রতি মায়ের স্তন্য দান রক্ষা ও উৎসাহিত করা শিশুদের সুষমভাবে বেড়ে ওঠার পক্ষে অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার অন্যতম জরুরী অংশ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

শিশুদের পুষ্টি ও সু-স্বাস্থ্যের জন্য শিশুকে মায়ের দুধ দেওয়া অব্যাহত রাখা এবং যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটেছে সেখানে অভ্যাসটি ফিরিয়ে আনার ওপর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) বেশ কয়েক বছর পূর্ব থেকে গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। শিশুদের মায়ের দুধ দেয়ার নিয়ম পালনে উৎসাহ যোগান এবং যেসব সমস্যা এই অভ্যাসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তার প্রতিবিধান করা জাতিসংঘের এই দুই অংগ-সংগঠনের মা ও শিশু-স্বাস্থ্য এবং নানাবিধ কর্মসূচির অন্যতম অনুষঙ্গ।

শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, স্বাস্থ্য রক্ষা ও পুষ্টিহীনতা দূর করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও মাতৃদুগ্ধের প্রচার অভিযানে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্যাকেজ সার্ভিস দিচ্ছে এবং নানাবিধ কর্মসূচি পালন করে আসছে।

এই কর্মসূচিসমূহের মধ্যে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন করা অন্যতম। প্রতি বছরে ১ হতে ৭ আগস্ট বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালন করার উদ্যোগ নেয়। এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য "মায়ের দুধ জীবন ও শিক্ষার মান বাড়ায়।" মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ '৯৯-এর মূল লক্ষ্যসমূহ হলো ঃ

(ক) শিশুর দেহ মনের সঠিক বৃদ্ধি ও বিকাশে মায়ের দুধ খাওয়ানোর রীতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সহায়তা দানের জন্য গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(খ) সকল স্তরের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশু পালনের একমাত্র আদর্শ খাবার মায়ের দুধ এবং সেই সাথে শিশুকে সঠিকভাবে খাওয়ানোর তথ্য সংযুক্ত করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।

(গ) শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের সহযোগিতায় সকল পর্যায়ের পাঠ্য বিষয়ে মায়ের দুধ খাওয়ানোর সঠিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা। যেমন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যা, নার্সিং, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ইত্যাদি।

(ঘ) শিশু মনের বিকাশ সাধনে ব্যবহৃত খেলনা ও অন্যান্য উপকরণ মায়ের দুধ খাওয়ানোর অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের সাথে সংগতি রেখে তৈরি করার জন্য উৎসাহ প্রদান।

'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ' যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-

র‍্যালী, রচনা প্রতিযোগিতা, শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, মায়ের দুধ খাওয়ানোর উপকারিতা শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান, সেমিনার, ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

পরিবার সমাজের একটি মৌল কাঠামো। আত্মীয়তার নিখুঁত বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রথম সোপান হলো পরিবার। সেই পরিবার থেকে সমাজ, জাতি তথা সমগ্র বিশ্ব শিশুদের সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ চায়। তবে অর্থনৈতিক বিশেষ করে সম্পদের অপর্যাপ্ততার প্রেক্ষিতে পুষ্টিকর ও বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও যথাযথ স্বাস্থ্য সেবা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সত্যি কথা বলতে কি, মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য তেমন একটা বিনিয়োগ করতে হয় না বললেই চলে। অথচ বুকের দুধ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। মাতৃ-দুগ্ধ দান, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম মাধ্যমে পরিবার, নিয়োগকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজ এবং সরকার বিভিন্নভাবে সাশ্রয় করতে পারে।

বিশ্ব মাতৃ-দুগ্ধ সপ্তাহ উদযাপনের মূল উদ্দেশ্যই হলো জাতীয় স্বাস্থ্য খাতে প্রধান বিনিয়োগ হিসাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর রীতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সহায়তাদানে কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মায়ের দুধের অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা বলে শেষ করা যায় না। মায়ের দুধ সকল স্তরে অশেষ কল্যাণ বয়ে আনে। এর অর্থনৈতিক উপকারিতাসমূহের মধ্যে (ক) পারিবারিক (খ) নিয়োগকর্তা ও (গ) জাতির প্রেক্ষিতসমূহে সদন্তভাবে পদচারণা করেছে।

মায়ের দুধ পরিবারের জন্যে যে অশেষ কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, সেগুলো হলো ঃ

০ কৃত্রিম শিশুখাদ্য এবং তা খাওয়ানোর আনুষঙ্গিক সামগ্রীর মত অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটার অপচয় রোধ করে।

০ মায়ের দুধ স্বাস্থ্য খাতে কম খরচ করেও অর্থ সাশ্রয় করছে। যেহেতু মায়ের দুধ পান করেছে এ ধরনের শিশুরা কম অসুস্থ হয়; কাজেই স্বাস্থ্য সেবা খাতে খরচ কমে যায়। বারবার শিশুকে হাসপাতালে/ চিকিৎসকের কাছে নেওয়া-আনা, চিকিৎসকের ফি, ঔষধ এবং অসুস্থ শিশুদের সেবা দানে যে সময় ব্যয় হয় ইত্যাকার বিষয়াবলী।

০ কৃত্রিম শিশু-খাদ্য প্রস্তুত এবং তা ব্যবহারে আনুষঙ্গিক সামগ্রী বিশুদ্ধ করার পেছনে দুষ্প্রাপ্য বিশুদ্ধ পানি, জ্বালানী ও সময় ব্যয় হয় তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

০ কর্মজীবী মায়েদের সন্তানের অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির হার কমে যায়, ফলে কর্মক্ষেত্রে মায়েদের উৎপাদানশীলতা বৃদ্ধি পায়।

নিয়োগকর্তাদের জন্য যেসব উপকার বহন করে আনে সেগুলো হলো ঃ

০ কর্মজীবী মায়েরা শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ানোর সুযোগ পেলে শিশুরা সুস্থ থাকে, মায়েরা কাজে অধিক মনোযোগী ও বিশ্বস্ত থাকে, অনুপস্থিতির হার কমে যায়, ফলে মায়েদের কার্য সম্পাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

যেসব নিয়োগকর্তা কর্মজীবী মায়েদের দুধ খাওয়ানোর জন্য যথাযথ সহায়তা দান করে তাদের দক্ষ কর্মী বাহিনী/ মানব সম্পদ হারানোর সম্ভাবনা কমে যায়। ফলে প্রতিষ্ঠান অধিক লাভবান হয়।

এবং মায়েদের দুধ সর্বোপরি একটি জাতির জন্য যে অশেষ কল্যাণ বয়ে আনে তাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে। মায়ের দুধ কৃত্রিম শিশুখাদ্য আমদানি, বিতরণ এবং ব্যবহার রোধ করে; ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয় না।

নির্ভরযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে বছরে ৭০০ মিলিয়ন লিটার মায়ের দুধ উৎপন্ন হয়। মায়েরা যদি সফলভাবে বুকের দুধ খাওয়ান তবে আরো ৪০০ মিলিয়ন লিটার বাড়তি বুকের দুধ উৎপন্ন হবে। ফলে বাৎসরিক মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১১০০ মিলিয়ন লিটার, যা আমদানিকৃত ৮৩৭ মিলিয়ন লিটার গুঁড়ো দুধের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতি লিটার গরুর দুধের মূল্য যদি আমরা ২০ টাকাও ধরি তবে বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪০০ কোটি টাকা মূল্যের বুকের দুধ উৎপন্ন হয়। প্রতি লিটার গুঁড়ো দুধের মূল্য ৪০ টাকা হিসাবে ১৪০০ কোটি টাকা মূল্যের মায়ের দুধের মূল্য দাঁড়ায় ৪,৪০০ কোটি টাকা। এই পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশের কৃষি খাতে বছরে মোট আয়ের ২১%।

মায়ের বুকের দুধ সম্পর্কে এ যাবৎ উদঘাটিত বৈজ্ঞানিক তথ্য বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য বুকের দুধের কোনও বিকল্প নেই। শিশু খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব সহজেই বুকের দুধ হজম করতে পারে। সন্তান প্রসবে প্রথম দুই তিন দিন মায়ের বুকে ঘন ও হলুদ রঙের আঠালো একপ্রকার দুধ আসে যাকে বলা হয় 'শাল দুধ'। শিশুকে শাল দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে আমাদের দেশে অনেক ধরনের কুসংস্কার রয়েছে। অনেক মা একে পচা দুধ মনে করে ফেলে দেন, আবার অনেকে মনে করেন শাল দুধ খাওয়ালে শিশুর অমঙ্গল বা নানা ধরনের অসুখ-বিসুখ হবে। অথচ শাল দুধ হচ্ছে নবজাতকের শ্রেষ্ঠ খাদ্য, জন্মের পর শিশুর পুষ্টির জন্য যা প্রয়োজন তার সবই রয়েছে শাল দুধে। শাল দুধে রয়েছে পর্যাপ্ত রোগ-প্রতিরোধক উপাদান, যা শিশুকে নানাবিধ রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা করে। এই বিবেচনায় শাল দুধকে আমরা বলতে পারি শিশুর জন্য প্রকৃতি–প্রদত্ত প্রথম টিকা। তাই প্রতি মায়েরই উচিত জন্মের পর পরই শিশুকে বুকের শাল দুধ খাওয়ানো। বুকের দুধে রয়েছে–

- শিশুর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সবচেয়ে উপযোগী আমিষ ও চর্বি।
- অন্যান্য দুধের চেয়ে অধিক পরিমাণে শর্করা, যা শিশুর জন্য অতীব প্রয়োজন।
- প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। যে সকল শিশু বুকের দুধ খায় তাদের আলাদা করে কোন ভিটামিন খাওয়াতে হয় না।

০ বুকের দুধে যথেষ্ট পরিমাণ আয়রন থাকে। এর প্রায় সবটাই শিশু হজম করতে পারে বলে বুকের দুধ খেলে শিশুরা রক্তশূন্যতায় ভোগে না। এতে থাকে প্রচুর পরিমাণে পানি, যে কারণে গ্রীষ্মকালেও শিশুকে আলাদা করে পানি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

০ বুকের দুধে রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণ লবণ ও খনিজ পদার্থ।

০ তা ছাড়া বুকের দুধে থাকে এক ধরনের এনজাইম, যা চর্বি হজম করতে সহায়তা করে।

০ বুকের দুধে কোনও রোগ-জীবাণু থাকে না বলে এ দুধ খেয়ে শিশু কখনও অসুস্থ হয় না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, যে সকল শিশু বুকের দুধ ছাড়া অন্য দুধ পান করে তারা প্রায়ই পেটের অসুখ, নিউমোনিয়াসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বুকের দুধে রয়েছে প্রতিরোধক বহু উপাদান যা শিশুকে রক্ষা করে নানাবিধ অসুখ-বিসুখ থেকে। বুকের দুধে যে সকল রোগ প্রতিরোধক উপাদান রয়েছে সেগুলো হলো–

০ জীবাণু ধ্বংসকারী শ্বেতকণিকা বা লিউকোসাইটস।

০ রোগ প্রতিরোধক ইমিউনো গ্লোবোলিন বা এন্টিবডি। শিশুর শরীরে রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এইসব এন্টিবডি শিশুকে রক্ষা করে রোগের সংক্রমণ থেকে।

০ বুকের দুধে থাকে 'বাই ফিডাস ফ্যাক্টর' নামে এক ধরনের পদার্থ, যা শিশুর পেটে বিশেষ এক ধরনের জীবাণু বা ব্যাক্টেরিয়ার বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

০ এই জীবাণুর নাম ল্যাক্টোব্যাসিলাস, যা পেটে অন্যান্য ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করে শিশুর ডায়রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

০ বুকের দুধে থাকে ল্যাক্টোফেরিন যা শিশুর পেটে লৌহ আয়রন বেঁধে রাখতে পারে, ফলে যে সকল জীবাণু লৌহ ছাড়া বাঁচতে পারে না, সেগুলো ধ্বংস হয়ে যায়।

শিশুরা জাতির অমূল্য সম্পদ। শিশুদের মায়ের দুধ পান করানো সমাজে মায়েদের এক অদ্বিতীয় অবদান। মায়ের দুধ এমনই অকল্পনীয় সম্পদ যে, মায়ের দুধ শিশুদের জীবাণু শিক্ষার মান বাড়ায়। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের এই প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত, যৌক্তিক ও সময়োপযোগী। মায়ের দুধের বিকল্প নেই, এই বাস্তব সত্যটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে অনেক মায়েরাই জানেন না। আমরা অবশ্য আশাবাদী, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালনের প্যাকেজ সার্ভিস মায়েদের এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পানের ইতিবাচক সাড়া জাগাবে। মায়ের দুধের উপকারে রয়েছে বহুমাত্রিকতা। মাতৃদুগ্ধ কেবল শিশুদের পুষ্টি বা শারীরিক বৃদ্ধিতে নয়, শিশুর মানসিকতা বিকাশের মাধ্যমে তাদের জীবন ও শিক্ষার মান বাড়ায়, দুই বছর অবধি শিশুর পুষ্টিহীনতার মত গুরুতর সমস্যা লাগবে না মায়ের দুধ

খাওয়ালে। ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও খাদ্যনালীর দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা থেকেও রক্ষা করে আমাদের অনেকেই হয়ত জানি না, মায়ের দুধে এমন ধরনের ফ্যাটি এসিড রয়েছে যা কোনও পশুর দুধে থাকে না। শিশুর দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতেও মায়ের দুধ ঔষধের মতো কাজ করে। এমতাবস্থায় আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, মায়ের দুধ জীবন ও শিক্ষার মান বাড়ায়। মায়ের দুধের এই বহুমাত্রিক উপকারিতার কথা ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজকর্মী থেকে শুরু করে সকলেরই উচিত মায়েদের জানিয়ে দেওয়া। গুঁড়ো দুধ যে মায়ের দুধের বিকল্প হতে পারে না একথা বলার দায়বদ্ধতা শুধু চিকিৎসক সমাজের প্রতি ন্যস্ত করলেই চলবে না, আমাদের জাতীয়-গরজেই এ দায়িত্ব আমাদের সকলের ওপর বর্তায়। এই বিষয়টিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। উন্নত জাতির জন্য চাই সুস্থ মাতা। একমাত্র সুস্থ মাতাই উপহার দিতে পারে সুস্থ সন্তান। সন্তানের সুস্থতা, পুষ্টি বা স্বাভাবিক মানসিক বিকাশে মায়ের দুধের কোনও বিকল্প নেই।

সুতরাং শুধু বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রচারণায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পূর্ণ স্বীকৃতি ও সার্বিক সহযোগিতা প্রয়োজন। মায়ের দুধ খাওয়ানোর সাথে নিবিড় ভালবাসা বা নিঃস্বার্থপরতা অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা উচিত নয়। অধিকাংশ মা মায়ের দুধ খাওয়ানোকে বাঁকা চোখে দেখে। এটা বাঞ্ছনীয় নয়। পুষ্টি মানের বিচারের দিক থেকে মায়ের দুধের মূল্য অপরিসীম।

মায়ের বুকের দুধ পান করা যেমন প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার, তেমনি প্রতিটি মায়েরও অধিকার রয়েছে তাদের সন্তানদের বুকের দুধ খাওয়ানো। মায়ের দুধের উপযোগিতা ও ফলপ্রসূতা সম্পর্কে গোটা বিশ্বে ইতোমধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে অতি সাম্প্রতিক কালে দেশে দেশে গুঁড়ো দুধের বিরূপ তথা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও আমাদের দেশের অনেক মা এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে ওয়াকিবহাল হতে পারেননি। সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানো ধনী, সম্পদশালী কিংবা ভাগ্যবানদের বিলাসিতা নয়, বরং মায়ের দুধ খাওয়ানো সব মায়েরই ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালনে অন্যান্য দেশের পাশাপাশি আমাদের সদাশয় সরকার যে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছে তা যাতে কেবল আনুষ্ঠানিক গণ্ডির ভেতর সীমাবদ্ধ না থাকে, সে ব্যাপারে সর্বস্তরের জনসাধারণ স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে যার যার দায়িত্ব পালন করলেই এ দিবসটি যথাযথ গুরুত্ব লাভ করবে ও তাৎপর্যবহ হবে।

অগ্রপথিক। সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইউনানী মৌল ধারণা

হাকীম সাইয়েদ মুহাম্মদ আহছান উল্লাহ

চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি আলোচনাই হলো এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। তাই সৃষ্টির রহস্যের আলোচনার ধারায় কিছু না কিছু কথা এসে যাবে বিধায় এর ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নয়। পক্ষান্তরে একে মৌলবাদী আলোচনাও বলা যেতে পারে। কেননা প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন ধারক ও ছাত্র হিসেবে প্রাচীন সংজ্ঞার নিরিখে আধুনিক সংজ্ঞাকে অবহেলা করা যায় না। তবে অধুনা একচোখা চিন্তাধারার দৌরাত্ম্য নিয়ে নয় বরং সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আলোচনা করা যেতে পারে।

সৃষ্টির মূলে যে বিষয়াদি ক্রিয়াশীল, তাকে প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অসূরে তাবীইয়া তথা প্রাকৃতিক বিষয়াদি নামে আখ্যায়িত করেছেন। এর উপরে সৃষ্টির অস্তিত্ব নির্ভরশীল। এদের একটির অনুপস্থিতিতে সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এগুলো সাতটি—

১.আরকান বা আনাসের তথা মৌলিক উপাদান বা বস্তুসমূহ। ২. মিজায্ তথা স্বভাব বা প্রকৃতিসমূহ। ৩. আখলাত তথা ধাতু রসসমূহ। ৪. আ-জা তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ। ৫. আরওয়াহ তথা জীবনীশক্তিসমূহ। ৬. কুওয়াহ তথা বল বীর্যসমূহ। ৭. আফ্আল তথা ক্রিয়া ও কার্যক্রমসমূহ।

প্রথমে আরকান বা আনাসের তথা মৌলিক উপাদান বা বস্তুসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মতে মৌলিক উপাদান বা বস্তু চারটি যথা– ১. 'মা' তথা পানি, ২. নার তথা আগুন, ৩. আরজ তথা মাটি, ৪. রীহ তথা বায়ু।

উল্লিখিত চারটি মৌলিক উপাদান বা বস্তু দ্বারা জীব, উদ্ভিদ ও জড় জাতীয় পদার্থের প্রাথমিক গঠনের সূচনা। জীবদেহকে পর্যালোচনা করলে সর্বশেষ এ বস্তু চতুষ্টয়েরই প্রকাশ ঘটে, যা কোনক্রমেই আর বিভক্ত করা যায় না। বস্তু চতুষ্টয়ের পারস্পরিক যোজনের ফলে কোনও একটি যৌগিক অস্তিত্ব রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরা কথাটি মানতে চান না। তাঁদের দাবি, প্রতিটি যোজনেই যে চারটি উপাদান থাকতে হবে তা শর্ত নয়। এতদভিন্ন তাঁরা উল্লিখিত চারটি বস্তুকে মৌলিক বলেও স্বীকার করেন না। অতএব নিম্নে সংক্ষেপে চারটি উপাদানের প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

বায়ু ঃ প্রাচীন বিজ্ঞানীরা বায়ুর মিজায্ বা স্বভাবকে উষ্ণ-আর্দ্র বলে সাব্যস্ত করেছেন। তবে আমাদের পারিপার্শ্বিক বায়ু, পানি ও মাটির বোখারাত তথা আবদ্ধ বাষ্পের মিলনে বাহ্যত শীতল হয়ে থাকে, আবার কখনো সূর্যের তাপে উষ্ণ হয়ে যায়। অধিক উঁচু স্থানে সূর্যের আলোর প্রতিঘাতজনিত প্রভাব বায়ুর উপর কম হওয়াতে এবং পানিমিশ্রিত বাষ্প বায়ুর সাথে মিলনের ফলে উঁচু স্থানের বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। যে বায়ু আমাদের নিকট দিয়ে চলাফেরা করে তাতে মিশ্রণ রয়েছে। শায়খুর রাঈস আবু আলী ইবনে সীনা তাঁর 'আল কানুন' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের কুল্লিয়াত অংশে লিখেছেন যে, বায়ুতে অবস্থিত নিম্নলিখিত অংশসমূহ পাওয়া যায়, যথা ঃ ১. রীহে বাসীত তথা মৌলিক বায়ু। ২. বোখারাত তথা আবদ্ধ বাষ্প, অর্থাৎ যে দ্রব্যসমূহের উপর উষ্ণতা প্রভাব বিস্তার করে, তথা হতে আবদ্ধ বাষ্প বা বোখারাত সৃষ্টি হয়। ৩. দুখান তথা ধূম্র, অর্থাৎ কোনও শুষ্ক দ্রব্যের উপর যখন উষ্ণতা প্রভাব বিস্তার করে তখন তা থেকে রাকী তথা দাহ্য ক্রিয়ার প্রভাব ধূম্র সৃষ্টি করে। ৪. আজযায়ে নারিয়াহ তথা আগুন বা দাহ্য অংশ। এ চারটি মিশ্রিত বস্তু ব্যতীতও কোন কোন জৈবিক ও উদ্ভিদ বস্তুজনিত সংমিশ্রণ বায়ুতে উপস্থিত থাকে।

আধুনিক গবেষকদের মতে বায়ুতে নিম্নলিখিত অংশের মিশ্রণ থাকে, যেমন ঃ ১. আবকরীন তথা মৌলিক বায়ু বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন), ২. হেমজীন তথা দাহ্য বায়বীয় অংশ (অক্সিজেন)। ৩. আদখেনা তথা কয়লা জাতীয় ক্ষারজনিত আবদ্ধ বায়বীয় পদার্থ (কার্বনিক এসিড গ্যাস)। এতদভিন্ন বায়ুতে কিঞ্চিত মাত্রায় গাজে নওশাদর তথা নিশাদল জাতীয় বাষ্প (এ্যামোনিয়ামে গ্যাস), হেমজুন তথা তীব্র দাহ্য বায়বীয় অংশ (ওজন), এবং সামান্য সংখ্যক এঞ্জেরায়ে মাঈয়াহ তথা পানির অংশ (একোয়াজ) ইত্যাদি। উল্লিখিত অংশসমূহের প্রমাণ কেবল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই দেয়া যেতে পারে।

বস্তুসমূহকে সম্যকভাবে বোঝার জন্য ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

১. "হেমজীন" তথা দাহ্য বায়বীয় পদার্থ (অক্সিজেন) নিতান্ত সূক্ষ্ম, রঙ, গন্ধ ও স্বাদহীন, বায়ু যা প্রতিটি জীবের জীবন রক্ষায় অপরিহার্য। এটি ফুসফুসে প্রবেশ করে রক্তকে পরিষ্কার করে তাকে লাল টকটকে করে।

২. "দুখান" তথা কয়লা জাতীয় ক্ষারজনিত বাষ্প (কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস), যা রঙহীন এক্প্রকার বাষ্প, এতে অল্প বিস্তর স্বাদ ও কিছু গন্ধ থাকে। এটি বায়ু অপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী।

৩. "আবকরীন" তথা মৌলিক বায়ু (নাইট্রোজেন), এটি রং, গন্ধ ও স্বাদহীন বায়ু-বিশেষ। যা "হেমজীন" তথা দাহ্য বায়বীয় (অক্সিজেন) পদার্থের সাথে মিলে তার তীব্রতা ও দহন ভাবকে দমিয়ে দেয়ার কারণে জীব-এর দাহ্যক্রিয়া হতে পরিত্রাণ পেয়ে উপকারী ক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে। কেননা বিশুদ্ধ দাহ্য বায়ু

(হেমজীন বা অক্সিজেন) এমন তীব্র ও দহন শক্তিসম্পন্ন হয় যে, তাতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে কোনও জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

৪. "গাজে নওশাদর" তথা নিশাদলজনিত বাষ্প (এ্যামোনিয়াম গ্যাস)-এ বাষ্প জীব ও উদ্ভিদের আবর্জনা এবং বিকৃত ও পচা-গলা দ্রব্য হতে সৃষ্টি হয়ে বায়ুর সাথে মিশে যায়। জীবের স্বাস্থ্যের জন্য যদিও তা ক্ষতিকর কিন্তু উদ্ভিদের জন্য উপকারী। বায়ুতে উল্লিখিত বস্তু সাধারণত অল্প মাত্রাতেই উপস্থিত থাকে, তাই তার ক্ষতিকর ক্রিয়া, জীব অনুভব করতে পারে না। বায়ুতে যদি তার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে নিশ্চিতভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৫. "হেমজুন" তথা অতি তীব্র দহন শক্তিসম্পন্ন বায়বীয় পদার্থ (ওজন)। এটি হেমজীন তথা দাহ্য বায়বীয় পদার্থের (অক্সিজেন) তীব্রতর দহন ক্ষমতার অধিকারী অংশ, যা নিতান্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বায়ুতে অতি অল্প মাত্রায় অবস্থান করে। বিশেষত পাহাড়ের চূড়ায় ও সমুদ্রপৃষ্ঠে এর বিচরণ অধিক।

পানি ঃ প্রাচীন বিজ্ঞানীগণ পানিকে মৌলিক উপাদান বলে দাবি করেছেন। পানির মিজায্ তথা প্রকৃতি বা স্বভাব শীতল-আর্দ্র। পানিকে তিনটি আকারে পাওয়া যায়। যেমন ঃ ১. "এঞ্জেরায়ে মাঈয়াহ্" তথা পানীয় বাষ্পাকারে। ২. "মাইয়াল" বা তরল আকারে। ৩. "জামেদ" তথা জমাট আকারে। সাধারণত প্রাকৃতিক পানি– বিশুদ্ধাকারে পাওয়া যায় না। অনেক প্রকার আবর্জনার সংমিশ্রণ পানিতে উপস্থিত থাকে। কোন কোন পানিতে মিশ্রণ হয় যেমন, লবণমিশ্রিত পানি। কোন কোন পানি বিভিন্ন দ্রব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন– চুনা প্রভাবিত পানি। কোনও কোনও পানিতে বায়ুমিশ্রিত থাকে। যেমন– পানিকে সিদ্ধ করলে তা বুদ বুদ আকারে দেখা যায়। কোন কোন পানিতে খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। যেমন– গন্ধক, ফিটকিরি, লৌহ, লবণ ইত্যাদি।

আধুনিক বিজ্ঞান পানিকে দুটি বাষ্পীয় বায়ু দ্বারা যোজনীয় বলে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন ঃ ১. হেমজীন তথা দাহ্য বায়বীয় পদার্থ (অক্সিজেন)। ২. মা-ঈন তথা পানীয় পদার্থ (হাইড্রোজেন)। যখন পানীয় অংশ ও দাহ্য বায়বীয় অংশ একত্রে মিলিত হয় তখন তা সাথে সাথে জ্বলতে আরম্ভ করে এবং হালকা এক প্রকার শব্দ হতে থাকে। উভয় দ্রব্য একত্র হয়ে পানির রূপ ধারণ করে। অনুমান করা হয়েছে যে, পানিতে দু'অংশ মা-ঈন ও একাংশ হেমজীন (যথাক্রমে পানীয় অংশ ও দাহ্য বায়বীয় অংশ) হয়ে থাকে। যখন পানিকে বিদ্যুতের দ্বারা উড়ানো হয়, তখন এ দুটি অংশ পরিমিত অবস্থা হতে পৃথক হয়ে যায়।

আগুন সৃষ্টির অস্তিত্বের জন্য একটি অপরিহার্য ও মৌলিক উপাদান বা বস্তু। এর মিজায্ বা স্বভাব উষ্ণ-শুষ্ক। তার স্থান প্রতিটি বস্তুর উর্ধ্বে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অথচ আধুনিক বিজ্ঞান তাকে কোনও গুরুত্বই দিতে চায় না। তাদের মতে "হেমজীন" বা দাহ্য বায়বীয় পদার্থ (অক্সিজেন) যখন কোন দ্রব্যের উপর প্রবলভাবে

প্রক্রিয়া আরম্ভ করে তখন "এস্‌তে আল" বা উগ্র-মূর্তি ধারণ করত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দৃশ্যই আগুন নামে পরিচয় লাভ করে।

মাটি ঃ প্রাচীন বিজ্ঞানীগণ মাটিকেও চারটি মৌলিক উপাদানের একটি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যার মিজায্ শীতল-শুষ্ক। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মাটিকে মুরাক্কাব বা যৌগিক পদার্থ হিসেবে সাব্যস্ত করার পর তাতে অনেক মৌলিক উপাদানের যোজন আছে বলে দাবি করেন।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে মৌলিক উপাদান প্রায় শতাধিক। এদের কিছু "ফিলজী" বা ধাতব (মেটালিক) আর কিছু "গায়রে ফিলজী" বা অধাতব (নন-মেটালিক) হয়ে থাকে। আমার মতে এ সংখ্যা অতি সাধারণ, কেননা উক্ত চারটি মৌলিক উপাদান এ ধরণীতে যে যে মৌলিক বস্তু সৃষ্টি করে রেখেছে তা আবিষ্কার হলে এ সংখ্যার কত যে বিস্তৃতি ঘটবে তা গুণে শুমার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কেবল তখনই সৃষ্টির রহস্য মানুষের আয়ত্তে আসা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে আমরা এ যাবত যা গবেষণা করে আবিষ্কার করেছি, তা শুধু যোজন ও মিশ্রণের সূত্র ধরেই। কিন্তু খালকাত বা সৃষ্টিসূত্র আরো ব্যাপক, যাকে পর্যালোচনা করার জ্ঞান প্রাচীন বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে জন্মসূত্রে অর্জন করতে পারি নাই। বর্তমানে আমরা শুধু কামানো মাথার উপর কেবল ক্ষুরই বুলিয়ে যাচ্ছি, না হয় এখনো ল্যাটিন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের ভাষাকে অনুকরণ করছি কেন ? আমাদের নিজস্ব ভাষা কি বিজ্ঞানের ভাষা হতে পারে না ? আক্ষেপের সুরে কথাগুলো বলতে হলো।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে ১৮টি মৌলিক উপাদান মানবদেহে অবস্থান করে তা নিম্নরূপ ঃ ১. "হেমজীন" বা দাহ্য বায়বীয় পদার্থ (অক্সিজেন), ২. "নূরীন" বা দীপক পদার্থ (ফস্‌ফরাস), ৩. "খেজরীন" বা আবহ পদার্থ (ক্লোরিন), ৪. "সীলীন" বা আস্ত পদার্থ (ফ্লোরিন)। ৫. আবক্বরীন বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন)। ৬. "মা-ঈন" বা পানি জাতীয় পদার্থ (হাইড্রোজেন)। ৭. "মুহমীন" বা কয়লা জাতীয় পদার্থ (কার্বন), ৮. "মেগনেশিয়া" বা চৌম্বকীয় পদার্থ (মেগনেসিয়াম), ৯. আরদ্বীন বা মাটি জাতীয় পদার্থ (ইথিয়াম), ১০. হাদীদ তথা লৌহ জাতীয় পদার্থ (আয়রন), ১১. "কেলসীন" বা চুনা জাতীয় পদার্থ (কেলসিয়াম)। ১২. "ক্লোবীন" বা উপক্ষার জাতীয় পদার্থ (পটাসিয়াম), ১৩. "নীহাস" বা তাম্র জাতীয় পদার্থ (কপার), ১৪. "আসরুব" বা শিশা জাতীয় পদার্থ (লেড), ১৫. "কিবরীত" বা গন্ধক জাতীয় পদার্থ (সালফার) ১৬. "রমলীন" বা বালি জাতীয় পদার্থ (সিলিকাস), ১৭. "বনফসেজীন" বা সমুদ্র শাকীন পদার্থ (আয়োডিন) ১৮. "নাতরুনী" বা সোডা জাতীয় পদার্থ (সোডিয়াম)।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে প্রাচীন ও আধুনিক মতের মধ্যে অনেক গরমিল রয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করলে তা আকাশ-পাতাল দূরে বলেও মনে হয় না।

চারটি মৌলিক উপাদানের পর্যালোচনা করতে গিয়ে যদি আমরা প্রাচীন বিজ্ঞানীদের উল্লেখিত কথাগুলোকে সামনে রাখি, (যেমন তাঁরা বলেছেন যে, আমাদের নিকটে আগুন, পানি, মাটি ও বায়ুকে মৌলিক বা বাসীত বলা যায় না) তবে মতানৈক্য অনেক হ্রাস পাবে। শুধু কি তাই বরং প্রাচীন বিজ্ঞানীদের পর্যালোচনা এবং আধুনিক বিজ্ঞানীদের গবেষণাকে যদি আমরা পাশাপাশি রেখে দেখি, তবে অধিক পরিমাণে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় খুঁজে পাওয়া যাবে।

যেমন বায়ুর ব্যাপারে প্রাচীন প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা তাকে "মুজাইয়েজ" বা মিশ্রণ বলে প্রমাণ করেছে। আধুনিক রসায়নবিদগণ এ রায় মেনে নিয়েছেন কিন্তু তা "মুরাককাব" বা যোজন নয়।

"মুরাককাব" বা যোজনের অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যের একত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একত্রিত হয়ে কোনও নতুন দ্রব্যের রূপ গ্রহণ করা এবং তার বিশেষ বিশেষ অংশের নিজ বিশেষত্ব হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া।

কিন্তু বায়ু তেমন নয়। কেননা "হেমজীন" বা দাহ্য পদার্থ (অক্সিজেন) "আবকরীন" বা ক্ষার জাতীয় পদার্থের (নাইট্রোজেন) বিশেষত্ব বায়ুতে উপস্থিত থাকে। এভাবে প্রাচীন ও আধুনিক রসায়ন বায়ুর যে অংশসমূহ সাব্যস্ত করেছেন তার সমন্বয় নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. প্রাচীন রসায়ন মতে, "রীহে বাসীত" বা আবকরীন" তথা মৌলিক বায়ু বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ আধুনিক বিজ্ঞান যাকে 'নাইট্রোজেন' বলে তা বায়ুতে তুলনামূলকভাবে ৩০.৭৮ শতাংশ কম।

২. প্রাচীন রসায়ন মতে "আয্জায়ে নারীয়াহ" বা "হেমজীন ও হেমজুন" তথা দাহ্য পদার্থ বা তীব্র দাহ্য পদার্থ, আধুনিক রসায়ন মতে অক্সিজেন ও ওজন বায়ুতে তুলনামূলকভাবে ০.২১ শতাংশ ও প্রয়োজনসাপেক্ষ।

৩. প্রাচীন রসায়ন মতে "বোখারীতে মা-ঈয়াহ" বা পানিযুক্ত বাষ্প আধুনিক রসায়ন মতে "একোয়াজ" তুলনামূলকভাবে পরিবর্তনশীল।

৪. প্রাচীন রসায়ন মতে "আয্জায়ে দুখনিয়াহ" বা ধূম্র জাতীয় অংশ, আধুনিক রসায়ন মতে, "কার্বন ডাই অক্সাইড" তুলনামূলকভাবে ৩০ শতাংশ।

৫. প্রাচীন রসায়ন মতে "নাবাতী ওয়া হায়ওয়ানী গেলজাত" বা "গাজে নাওশাদরী" তথা উদ্ভিদ ও প্রাণীজ আবর্জনা বা নিশাদলীয় বাষ্প, আধুনিক রসায়ন মতে "এ্যামোনিয়াম" তুলনামূলকভাবে প্রয়োজনীয় অনুপাত।

"রীহে বাসীত" বা মৌলিক বায়ু নাইট্রোজেন এবং "আয্জায়ে নার" বা দাহ্য বায়বীয় পদার্থকে "অক্সিজেন ও ওজন" জল আখ্যায়িত করা কঠিন কোনও ব্যাপার নয়। কেননা "আবকরীন" বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ "নাইট্রোজেন" বায়ুর বেশির হয়ে

থাকে। হেমজীন ও হেমজুন বা দাহ্য ও তীব্র দাহ্য পদার্থ (অক্সিজেন ও ওজন) প্রকৃতপক্ষে "উনসুরে নারী" বা আগুন জাতীয় উপাদান যে তাতে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

"মা-য়ী বোখারাত" বা পানিধার বাষ্প ও দুখান বা ধূম্রকে প্রাচীন ও আধুনিক রসায়ন বায়ুর অংশ বলে স্বীকার করেছে। অতঃপর 'দুখান" বা নাবাতী ওয়া হায়ওয়ানী গেলজাত" তথা নিশাদলজনিত বাষ্প বা জৈবিক ও উদ্ভিদজাতীয় গলিত আবর্জনা বায়ুর সাথে মিশে বলেও প্রাচীন বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন। আমরা যখন জানতে পারলাম যে, আধুনিক গবেষণায় জৈবিক ও উদ্ভিদজনিত আবর্জনা হতে নিশাদলীয় বাষ্প বা "এ্যামোনিয়াম" গ্যাস সৃষ্টি হয় বলে প্রমাণ করলো তখন আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। কেননা প্রাচীন বিজ্ঞানীদের যুগে আজকের মত অত উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা শুধু জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করে এমন একটি সূত্র আবিষ্কার করতে পারলেন।

প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীগণ বায়ুর প্রাকৃতিক অংশের ব্যাপারে যদিও একমত হতে পারেননি, তবু অপ্রাকৃতিক অংশসমূহের ব্যাপারে কিন্তু দ্বিমত পোষণ করেননি। আধুনিক-বিজ্ঞানীদের গবেষণা মতে বায়ুতে চার প্রকারের "কেসাফাত" বা আবর্জনা থাকে। যেমন ঃ ১. "দুখানী" বা ধূম্রজনিত। ২. "মে-দেনী" বা খনিজজনিত। ৩. 'নাবাতী" বা উদ্ভিদজনিত। ৪. "হায়ওয়ানী" বা জীবজনিত। "দোখানী কেসাফাত" বা ধূম্রজনিত আবর্জনা, যাকে আধুনিক বিজ্ঞান 'কার্বন ডাই অক্সাইড' নাম দিয়েছে "বোখারাতে নাবাতী ওয়া হায়ওয়ানী বা "বোখারাতে নাওশাদরী" তথা জীব ও উদ্ভিদ জনিত বাষ্প বা নিশাদলীয় বাষ্প। এর নাম দেয়া হয়েছে "এ্যামোনিয়াম গ্যাস"। "মা-দেনা কেসাফাত" বা খনিজ আর্বজনাজাতীয় বাষ্পীয় ধূম্র, যেমন ঃ মাটি, চুনাপাথর, সিসা ও তাম্র ইত্যাদির অংশ বা কণা বায়ুতে মিশ্রিত হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

এতদ্ব্যতীত নাবাতী ওয়া হায়ওয়ানী কেসাফাত বা জৈবিক উদ্ভিদজনিত আবর্জনা-সমূহও বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে মিশে বায়ুকে দূষিত করে নানা প্রকার সংক্রামক রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। মূলত তা জৈবিক ও উদ্ভিদজনিত আবর্জনার পচন হতেই সৃষ্টি হয়।

এর সমর্থনে প্রাচীন বিজ্ঞানী 'আল্লামা আলাউদ্দীন কারশী' তাঁর "মুজেযুল কানূন" নামক গ্রন্থে বায়ুতে নিম্নলিখিত আবর্জনা পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন। ১. "নিতিয়ান" বা এঁদো ডোবার আবদ্ধজনিত বাষ্প। ২. "নাবাতী কেসাফাত" বা লতাগুল্ম ও ক্ষতিকর বৃক্ষাদি পচা আবদ্ধজনিত বাষ্প। ৩. "মুতাওয়াতের কেসাফাতী দুখান" বা অবিরাম ধূলাবালিজনিত ধূম্র বায়ু, ৪. "বদবুয়ে মুরদেগান" বা মৃতজনিত দুর্গন্ধ জাতীয় বায়ু, ৫. "দোখান" বা ধূম্রজনিত বায়ু।

এর মধ্যে প্রথম দুটি উদ্ভিদজনিত আবর্জনা। অবিরাম ধূলাবালিজনিত বাষ্প হলো খনিজ আবর্জনা। "দোখান" হলো ধূম্রজনিত আবর্জনা এবং মৃতের দুর্গন্ধ জৈবিক আবর্জনা।

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, উদ্ভিদ ও জৈবিক আবর্জনা পচনের কারণে "বোখারতে নাওশাদরী" বা নিশাদলীয় বাষ্প (এ্যামোনিয়াম গ্যাস) সৃষ্টি হয়, যাকে আধুনিক গবেষণায় বায়ুর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষাক্ত আবর্জনা বলে স্বীকার করা হয়েছে।

উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রমাণ হলো যে, আধুনিক গবেষণা প্রাচীন মতবাদকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে। বায়ুর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। বাকি তিনটি মৌলিক উপাদানের ব্যাপারে অত গভীরে না গিয়ে শুধু ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হবো।

পানিকে আধুনিক বিজ্ঞান "মা-ঈন" বা পানীয় (হাইড্রোজেন) এবং "হেমজীন" বা (দাহ্য) (অক্সিজেন) পদার্থের "মুজাইয়েয্" বা মিশ্রণ বলে আখ্যায়িত করে থাকে। প্রাচীন প্রকৃতি বিদ্যায় যদিও পানিকে মৌলিক বস্তু বলে স্বীকার করা হয়েছে কিন্তু তার সাথে ব্যাখ্যায় গিয়ে বলা হয়েছে যে, পানিতে বায়ুর অংশ মিলিত থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান "হেমজীন" বা দাহ্য পদার্থকে (অক্সিজেন) বায়ুর যুজে আমেল বা ক্রিয়াশীল অংশ বলে সাব্যস্ত করেছে। এভাবে প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাধারায় অধিক পার্থক্য অনুমান করা যায় না।

শায়খুর রাঈস আবু আলী ইবনে সীনা বলেছেন যে, আমাদের আশেপাশের পানি মৌলিক নয়। জমাকৃত স্থানের পানিতে "আয্জায়েরীহী" বা বায়ু ও দাহ্যজনিত অংশ (নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন) উপস্থিত থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানও তা স্বীকার করে। তাদের মত হলো পানিতে "মা-ঈয়াত" বা পানির অংশ (হাইড্রোজেন) ও "আযজায়ে নারী" বা দাহ্য অংশ (অক্সিজেন) পাওয়া যায়। এর সাথে সাথে বায়ু অংশও (নাইট্রোজেন) থাকে, যা পানিকে সিদ্ধ করলে বুদবুদ আকারে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন বিজ্ঞানীদের একটি বিখ্যাত দলের (যাদের আসহাবে খালীত বা ধাতুরস সম্পর্কে গবেষক দল বলা হয়) দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, পানিতে "আয্জায়ে নারী" বা দাহ্য অংশ মৌলিকভাবে পাওয়া যায়। এদের ধারণা আধুনিক চিন্তাধারার সাথে কোনও দ্বিমত সৃষ্টি করে না। কেননা আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র পানিকে মা-ঈন ও হেমজীন বা পানীয় ও দাহ্য অংশের (হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন) মিশ্রণ বলে সাব্যস্ত করে থাকে। এ মতবাদের সমর্থনে প্রাচীন মুসলিম রসায়ন বিশেষজ্ঞদেরও স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিখ্যাত বুযুর্গ সূফী সাধক হযরত জিন্নুন মিসরী (রা) সবিশেষ বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন।

মাটির ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞানীদের মত হলো, মাটি অনেক উপাদানের মিলনের সমষ্টি এবং উপাদান অধিক পরিমাণে মাটিতেই পাওয়া যায়। সুতরাং স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ, গন্ধক, তুতে ইত্যাদি সকল বস্তু মাটি হতেই আহরিত হয়। প্রাচীন বিজ্ঞানীগণ কিন্তু এর বিরোধী নন। বরং তাঁরা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, খনিজ দ্রব্য মাটিতেই পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁরা আরও ব্যখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, কাঠ ইত্যাদির ভস্মে মাটির অংশের প্রাধান্য থাকে বেশি।

আধুনিক বিজ্ঞানীগণও বলেন যে, তাতে "মুহমীন" বা কয়লার অংশের প্রাধান্য (কার্বন) বেশি থাকে। প্রাচীন বিজ্ঞানীগণ আরো বলেছেন যে, ভস্মে মাটির অংশ ব্যতীত অল্প-বিস্তর "নারী" বা দাহ্য, "রীহী" বা বায়ু এবং মায়ী বা পানির অংশও উপস্থিত থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানও তা স্বীকার করে। তাদের মতে ভস্মে "কার্বন" ব্যতীত "অক্সিজেন", "নাইট্রোজেন" এবং "হাইড্রোজেন"ও পাওয়া যায়।

আগুনের ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এটি "হেমজীন" বা দাহ্য পদার্থের (অক্সিজেন) একপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া। মূলত আগুনের কোনও ভিন্ন অস্তিত্ব নেই। প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মধ্যে "একাররাকীন" নামক সম্প্রদায়ও এর ভিন্ন অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। তাঁদের কেউ কেউ ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন যে, বায়ু যখন "এস্‌তে আল" বা উগ্রভাব গ্রহণ করে তখন তা আগুনে রূপান্তরিত হয়। কথাটি আধুনিক বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার সমসাময়িক যে, তাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

আনাসের তথা মৌলিক উপাদানের ব্যাপারে প্রাচীন ব্যাখ্যা আলোচনা করতে হলে প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদের মধ্যকার তুলনামূলক আলোচনার পূর্বে দুটি মৌলিক বিষয়কে বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। এদের মধ্যে প্রথমটি হলো প্রাচীন বিজ্ঞানীগণ উপাদানের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, "হায়ওয়ানাত ও নাবাতাত" বা জীব ও উদ্ভিদ এবং "জমাদাত" বা জড় পদার্থের আয্‌জায়ে উলিয়া বা প্রাথমিক ভিত্তি হলো উল্লিখিত চারটি মৌলিক উপাদান। অর্থাৎ জীব, উদ্ভিদ ও জড় জগতের অস্তিত্বের মূলে অপরিহার্যভাবে এ চারটি মৌলিক উপাদান অংশগ্রহণ করে থাকে। এ সংজ্ঞার ভিত্তিতেই আমরা এমন কোনও বস্তু নিয়ে আলোচনা করব, যা অপরিহার্যভাবে সৃষ্টি গঠনে অংশগ্রহণ করেনি।

দ্বিতীয়টি হলো, প্রাচীন প্রকৃতি বিদ্যায় বার বার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে, চারটি মৌলিক উপাদানের ব্যাপারে আমরা আমাদের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার বায়ু, মাটি, পানি ও আগুনকে নিয়ে চিন্তা করি না। কেননা এগুলোতে মিশ্রণ রয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত চারটি মৌলিক উপাদান নিজ নিজ প্রকৃত অবস্থা নিয়েই সৃষ্টির গঠনে সংযুক্ত হয়েছে।

উল্লিখিত দুটি বিষয়কে সামনে রেখে যদি আমরা অগ্রসর হই তবে প্রাচীন ও আধুনিক উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন কোনও কঠিন ব্যাপার নয়।

সৃষ্টির তিনটি ধারা হতে যদি আমরা জড় পদার্থকে পৃথক করেই দেই (যদিও তা অনেক আধুনিক গবেষকদের মতে চারটি উপাদানেই সমষ্টি) এবং অন্যান্য গঠনের ব্যাপারে চিন্তা করি, তবে বোঝা যাবে যে, তাদের অধিকাংশেই উল্লিখিত চারটি উপাদানের উপস্থিতি দিবালোকের মতই সত্য।

"হেমজীন" বা দাহ্য পদার্থ, (অক্সিজেন), "আবকরীন" বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন), "মা-ঈন" বা পানি জাতীয় পদার্থ (হাইড্রাজেন), "মুহমীন" বা কয়লা জাতীয় পদার্থ (কার্বন) ইত্যাদির যদিও আধুনিক বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, পানি দাহ্য ও কয়লাজাতীয় পদার্থ, জৈবিক ও উদ্ভিদের পেশীজাতীয় তন্ত্রী এবং অন্যান্য নামীয় যোজন বা "মুরাককাব"সমূহের অংশ-হাড়। পক্ষান্তরে ক্ষার জাতীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন) জৈবিক ও উদ্ভিদ পেশীতন্ত্রীতে এককভাবে অংশগ্রহণ করেনি বটে, তবে এতে সন্দেহ নেই যে, "আবকরীন" বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন) উল্লিখিত পেশীতন্ত্রীর প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী গঠনে নিশ্চিতভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞান এ রহস্যকে উদঘাটন করার জন্য বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে গবেষণা করেছে প্রচুর। সুতরাং এ ব্যাপারে নিম্নের কোনও কোনটির দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করা হলো।

শুষ্ক কাঠে নিম্নলিখিত অংশ পাওয়া যায়। যেমন "মুহমীন" বা কয়লাজাতীয় (কার্বন) ৫৫ শতাংশ, "মা-ঈন" বা পানিজাতীয় পদার্থ (হাইড্রোজেন) ৬ শতাংশ, "হেমজীন" বা দাহ্য পদার্থ (অক্সিজেন) ও "আবকরীন" বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন) ৪৪ শতাংশ।

যখন উদ্ভিদ পচন্ আসে বা পচে যায়, তখন তাতে সাধারণত নিম্নলিখিত অংশসমূহের উপস্থিতি পাওয়া যায়। যেমন ঃ "মুহমীনও বা কয়লাজাতীয় পদার্থ (কার্বন) ৫৮ শতাংশ। "মা-ঈন" বা পানি জাতীয় পদার্থ (হাইড্রোজেন) ৫ শতাংশ। "হেমজীন" বা দাহ্য পদার্থ (অক্সিজেন) ও "আবকরীন" বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন) ৩৭ শতাংশ। জ্বালানোর পর তথায় সাধারণত ১ শতাংশ "আরদীন" বা মাটি (ইথিয়াম) পাওয়া যায়।

"মাওয়াদে লাহসিয়াহ" বা মাংসল পদার্থে নিম্নলিখিত অংশসমূহের উপস্থিতি থাকে। যথা ঃ "হেমজীন" বা দাহ্য পদার্থ (অক্সিজেন) ২৯$\frac{১}{৪}$ শতাংশ, "মা-ঈন" বা পানিজাতীয় পদার্থ (হাইড্রোজেন) ৫$\frac{১}{৪}$ শতাংশ। "আবকরীন" বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন) ৪ শতাংশ। "মুহমীন" বা কয়লাজাতীয় পদার্থ (কার্বন) ১২$\frac{১}{২}$ শতাংশ। তা ছাড়া নিতান্ত অল্প মাত্রায় অর্থাৎ ০০$\frac{১}{৪}$ শতাংশ "কিবরীত" বা গন্ধকও (সালফার) থাকে।

উল্লেখিত আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল যে, অধিকাংশ "মুরাককাবাত" বা যোজনে উক্ত চারটি মৌলিক উপাদানই ক্রিয়াশীল। সুতরাং প্রাচীন বিজ্ঞানীগণ যে উপাদান-সমূহকে আগুন, বায়ু, মাটি ও পানি নামে পরিচিত করেছেন, তাদেরকেই আধুনিক বিজ্ঞান, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন নামে আখ্যায়িত করে থাকেন।

প্রাচীন বিজ্ঞানীগণ আমাদের পরিবেশের উপাদানসমূহকে মিশ্রণের সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। তবে উক্ত উপাদানের "বসীত", বা মৌলিক রূপ আমাদের দেহে রয়েছে। অক্সিজেন দ্বারা আগুনের অস্তিত্ব, নাইট্রোজেন দ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব, হাইড্রোজেন দ্বারা পানির অস্তিত্ব ও কার্বন দ্বরা মাটির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

এ স্থানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন বিজ্ঞানিগণও চারটি মৌলিক উপাদানের ব্যাপারে একমত ছিলেন না। এদের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের মত, "আনাসের" বা মৌলিক উপাদান তিনটি যথা ঃ- জামেদ" বা শক্ত (থলিট), "সাইয়াল" বা তরল (ফ্লোয়েড) ও "রীয়াহ" বা বায়বীয় (গ্যাস)। "আনাসের আরবাআ" বা চারি উপাদান উল্লিখিত তিনটি উপাদান দ্বারাই যোজিত। সুতরাং পানিতে 'উনসুরে সাইয়াল' বা তরল উপাদানের প্রভাব বেশি। আবার বায়ুতে উনসুরে রীহী বা বায়বীয় উপাদান এবং উনসুরে সাইয়ালী বা তরলীয় উপাদান। অতঃপর মাটিতে 'উনসুরে জামেদী' বা শক্ত উপাদান এবং আগুনে উনসুরে নারী বা দাহ্য উপাদান ইত্যাদির প্রভাব বেশি। এ মতবাদ অনুযায়ী প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনে কোনও প্রকার সংশয়ের কিছু থাকে না।

উল্লিখিত আলোচনার দ্বারা মনে হয় আধুনিক বিজ্ঞান উক্ত মতবাদকে সর্বসম্মত মতবাদের উপর স্থান দিয়েছে। এ মতবাদ অনুযায়ী যেমন একদিকে চার মৌলিক উপাদানের প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না, অন্যদিকে চারটি উপাদানের আধুনিক সংস্করণ প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপই মনে হয়। সুতরাং উল্লিখিত মতবাদের ব্যাখ্যা ও আধুনিক মতবাদের ব্যাখ্যাকে আমরা এ হিসেবে সমন্বয় সাধন করতে পারি। যেমন ঃ "উনসুরে জামেদ" বা শক্ত উপাদান অর্থে শক্ত বস্তু কার্বন "উনসুরে সাইয়াল" বা তরল উপাদান অর্থে তরল বস্তু হাইড্রোজেন, 'উনসুরে রীহী' বা বায়বীয় উপাদান অর্থে বায়বীয় বস্তু অক্সিজেন। এ মতবাদের ব্যাখ্যা মতে পানিতে "উনসুরে সাইয়ালের" (হাইড্রোজেন), মাটিতে "উনসুরে জামাদের" (কার্বন) ও আগুনে "উনসুর রীহীর" (অক্সিজেন) প্রভাব অধিক থাকে এবং বায়ুতে উনসুরে রীহী" ও উনসুরে সাইয়ালী" উভয়েই মিলিত থাকে।

বায়ুর ব্যাপারে প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে যে, তাতে "হেমজীন" বা অক্সিজেন ব্যতীতও আবদ্ধ বাষ্প উপস্থিত থাকে এবং তা সন্দেহাতীতভাবে হাইড্রোজেন।

প্রকাশ থাকে যে, কোনও কোনও প্রাচীন বিজ্ঞানী "উনসুরে রীহী" বা বায়ুর উপাদানকে (গ্যাস) দুভাগে ভাগ করেছেন। যেমন ঃ যদি বায়ু উগ্রতায় প্রভাবিত না হয়, তবে তা প্রকৃত বায়ুরূপে গণ্য হবে। আর যদি তা উগ্রতা প্রভাবিত হয়, তবে তা আগুন হিসেবে পরিচিত হবে। এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় উপাদান থাকে মাত্র তিনটি।

অর্থাৎ "উনসুরে রীহী" বা বায়বীয় পদার্থ (অক্সিজেন), "উনসুরে মা-য়ী" বা পানীয় পদার্থ হাইড্রোজেন "উনসুরে আরদী" বা মাটি জাতীয় পদার্থ (কার্বন)– এই তিনটি হতেই "মুরাককারাত" বা যোজন এবং জৈবিক উদ্ভিদজনিত দৈহিক তন্ত্রী গঠিত হয়। তা ছাড়া শ্বেতসার জাতীয় রসে "আবকরীন" বা ক্ষারজাতীয় পদার্থ (নাইট্রোজেন) পাওয়া যায় না, তাই যারা তিনটি উপাদানে বিশ্বাসী তাদের মতবাদই আধুনিক বিজ্ঞানীদের একান্ত কাছের মতবাদ বলে মনে হয়।

অগ্রপথিক। জুন ১৯৯৮

নিরামিষ সুসংবাদ

আমিল বতুল

মাছ গোশ্‌ত বাজার থেকে প্রায় উঠেই গেছে। একা আমার নয়, মধ্যবিত্ত প্রত্যেক পরিবারের একই দশা। আর্থিক টানা-পোড়েন, মাছ-গোশতের চড়া দাম সব মিলিয়ে শাকপাতা আর ডাল ভাত গিলতে হচ্ছে দিনের পর দিন। প্রায় দিনই নিরামিষ বা ডাল পাতে দিতে দিতে বিষণ্ন হয়ে ওঠে মায়ের চেহারা। কখনো বলেই ফেলেন, 'দিনের পর দিন নিরামিষ খেয়ে খেয়ে তোদের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আহা রে।'

কেবল আমার মা নয়, প্রায় লোকেরই নিরামিষের প্রতি একটা অবহেলা রয়েছে। ভাষার ব্যবহারের বেলায় এটা টের পাওয়া যায়। আমরা যখন বলি 'জীবন নিরামিষ হয়ে গেছে' তখন জীবনের একঘেয়েমীরই ইংগিত করি। যেন গোশ্‌ত মাছের সাথে জড়িয়ে রয়েছে সব স্বাদ আহলাদ। কিংবা বাধ্য হয়েই নিরামিষী হচ্ছি বলে হয়ত এই নিচু ধারণা।

আমিষ ছাড়া দেহ টিকতে পারে না, কথাটা সত্য। মাছ-গোশত বাদ দিলেই আমিষও বাদ পড়লো ভাবার কোনো কারণ নেই। প্রাণীকূল পৃথিবীতে আমিষের একমাত্র উৎস নয়। উদ্ভিদ থেকে দেহ গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় আমিষ পাওয়া সম্ভব। সুতরাং নিরামিষ বলতে আমাদের ভাষায় মূলত উদ্ভিজ্জ খাবার-দাবার বোঝালেও আমিষের অনুপস্থিত বোঝায় না, আসলে নিরামিষেও আমিষ রয়েছে।

অভাবে পড়ে নিরামিষী হওয়ার দায় পড়ে না পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে। সেখানে আমিষের বাড়-বাড়ন্ত সব সময়। তারপরও সেসব দেশের অধিবাসীরা প্রাণীজ আমিষত্যাগী হচ্ছে। পশ্চিমের একদল চিকিৎসক ও দেহ-বিজ্ঞানী মনে করছে মানুষের দৈহিক মঙ্গলের জন্যেই প্রাণীজ আমিষ-নির্ভরতা কমানো উচিত। আমার করুণাময়ী মায়ের মতোই অনেকেই জানেন না যে শুধু নিরামিষনির্ভর সুস্থ সবল দেহে জীবন যাপন করা সম্ভব।

নিরামিষ খেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা কমে। সাতটা দেশে খাদ্য ও হৃদরোগের তুলনামূলক গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রাণীজ আমিষাহার যেসব দেখে বেশি সেখানে হৃদরোগের ছোবলও সর্বাধিক। খাবার পাতে সবচেয়ে বেশি প্রাণীজ আমিষ জোটে ফিনল্যান্ডবাসীদের, হৃদরোগে মরেও তারা বেশি। এ তালিকার দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তবে সেভেন ডে এডভেনটিসটস নামের মার্কিন নাসারাদের একটা দল ধর্মীয় কারণেই গরু-মুরগী খায় না। গবেষণায় দেখা গেছে অন্যান্য মার্কিনীদের চেয়ে এ দলের লোকেরা হৃদরোগে ৫০ ভাগ কম ভোগে। শিল্পে সমৃদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে জানা যায় চর্বিজাতীয় খাবারের চল কম, হৃদরোগে এদেশের লোক কম মরে।

মিলান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রাণীজ আমিষ ঠেসে খাচ্ছেন যারা তাদের রক্তে নিরামিষাহারীদের চেয়ে উঁচু মাত্রার কোলেস্টেরল জমছে। আরো দেখা গেছে যে বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের আঁশ রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। ব্যাপারটা নিয়ে আরো বিশদ গবেষণা অবশ্য হচ্ছে।

ওজন কমানোর বেলায়ও নিরামিষ খাবারের জুড়ি নেই। দেহের ওজন মাত্রা ছাড়ালে হৃদরোগ, বহুমূত্র, রক্তর উঁচুচাপ এবং পিঠের সমস্যার শিকার হতে হয়। আমিষজীবী লোকগুলো নিরামিষ খাওয়া আরম্ভ করার পর ওজন কমতে এবং শরীর ভালো থাকতে দেখা গেছে। তবে পুষ্টি সমস্যার কাহিল এ দেশটায় ওজন বাড়তি মূলত উঁচুতলার মানুষের সমস্যা।

নিরামিষ ক্যান্সারের আশংকা কমায়। এক দশকের গবেষণায় জানা গেছে যে উঁচু মাত্রার প্রাণীজ চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাদ্য শুধু হৃদরোগ ডেকে আনে না, মলাশয়, স্তন ও জরায়ু ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ায়।

প্রাণীজ আমিষ গ্রহণের সাথে ক্যান্সারে ভোগার সম্ভাবনা অনেকগুলো ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কোলেস্টেরল ও সম্পৃক্ত চর্বি যুক্ত (Saturated fat) খাবার বেশি খেলে হয়ত অন্ত্রে নৈসর্গিক ক্যান্সার উৎপাদক রাসায়নিক জমা হয়। এ জাতীয় খাবারে আঁশের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম বলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হতে সময় নেয়। ফলে ক্যান্সার উৎপাদক রাসায়নিকসমূহের সাথে দেয় টিস্যুর দীর্ঘ সময় ছোঁয়া-ছুঁয়ি চলে। এসট্রজেন হরমোন স্তন ও জরায়ু-ক্যান্সার ত্বরান্বিত হয়। আর চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার অন্ত্র ও দেহ-চর্বিতে এসট্রজেন হরমোন উৎপাদন বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে যে শালগম, বাঁধাকপি, ফুলকপি সহ কয়েক রকম তরিতরকারী খেলে দেহে ক্যান্সাররোধক এনজাইম উৎপাদন বাড়ে। নিউইয়র্কস্থ বাফলোর স্টেট ইউনির্ভাসিটির সোকজাল এন্ড প্রিভেনটেড মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ম্যাকসন গ্রাহাম পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে যারা বাঁধাকপি-পরিবারের তরি-তরকারী নিয়মিত খায় তাদের মলাশয় ও বায়ু ক্যান্সারের সম্ভাবনা অনেক কম। এই তরি-তরকারীর মধ্যে রয়েছে এমন একটা রাসায়নিক পদার্থ যা ক্যান্সার উৎপাদনকারী পদার্থের কাজকর্ম থামিয়ে দেয়।

এরপরও কথা থেকে যাচ্ছে– দৈহিক গঠনের দিক থেকে মানুষকে কি গোশত-খোর হিসাবে পয়দা করা হয়নি ? আর দৈহিক তাগদ ও ক্ষমতার জন্য প্রাণীজ আমিষ কি অপরিহার্য নয় ?

আপনি শুনলে অবাক হবেন যে, দুটো প্রশ্নেরই এক জবাব– না। যদি সৃষ্টির প্রায় শুরু থেকেই মানুষ বহুভোজী অর্থাৎ গোশত মাছ-শাক-সব্জি খাচ্ছে। তবুও দাঁত চোয়াল, পরিপাকতন্ত্রসহ মানবদেহের বাদবাকী যন্ত্রপাতির গঠন ও কর্মকৌশল পরীক্ষা করে মনে হয় মানুষকে মূলত উদ্ভিদভোজী করে তৈরি করা হয়েছে। মানুষের ইতিহাসও এ কথার সাক্ষী। ইতিহাসের অধিকাংশ সময় মানুষ বেঁচে থেকেছে নিরামিষ খাবার খেয়ে। উন্নত কয়েকটা দেশের কথা বাদ দিলে দুনিয়ার বাকী অংশের আদম সন্তান মূলত নিরামিষাহারী হয়ে বেঁচে আছে। আর এসব তথ্য পরিবেশন করেছে দ্য আমেরিকান ডায়েটিক এসোসিয়েশন।

দেহের তাগদের কথা বলছেন ? ভুরি ভুরি পরীক্ষায় প্রমাণ মিলেছে যে আমিষ নয় বরং শস্য, শিম্বজাতীয় খাবার থেকে পাওয়া শর্করা দেহ পেশীর শক্তির যোগান দেয়।

শুধু নিরামিষ খেয়ে শরীর তর-তাজা রাখতে হলে খাওয়া-দাওয়ার সময় একটু খেয়াল রাখলে ভালো ফল পাবেন।

বেশির ভাগ প্রাণীজ আমিষই 'সম্পূর্ণ।' অন্যদিকে বেশির ভাগ উদ্ভিজ্জ আমিষই 'অসম্পূর্ণ।' দেহের প্রয়োজন সঠিকভাবে মেটানোর জন্য চাই 'সম্পূর্ণ' আমিষ। দুই বা তিনটা উদ্ভিজ্জ আমিষ মিশিয়ে নিলে 'সম্পূর্ণ' আমিষ তৈরি করা যায়।

১. শস্যের (চাল গম ইত্যাদির) সাথে শিম্ব জাতীয় (ডাল, মটরশুটি, সীম, চীনাবাদাম) খাবার মিশিয়ে, ২. শিম্বজাতীয় খাবার বাদাম বা বীজজাতীয় খাবারের সাথে মিশিয়ে ৩. ডিম বা খামারজাত খাদ্যদ্রব্যের সাথে উদ্ভিজ্জ আমিষ মিশিয়ে সুফল পাবেন।

খাওয়ার সময় সাধ্যমত ক্যালোরির যোগান ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন। না হলে আমিষ পুড়িয়ে দেহ স্বীয় কাজ কর্ম চালাতে থাকবে, ফলে দেহটিস্যুর পুনর্গঠন ও বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত উপাদানের ঘাটতি ঘটবে। পরিণামে রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়তে হবে হয়ত।

দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজের যোগানের জন্য প্রথমত বিভিন্ন ধরনের শাক-সব্জি ফলমূল খাবেন। তাতে কাজ না হলে বি-১২ গ্রহণ করতে পারেন।

গর্ভাবস্থায় বা শিশু পালনের সময় দেহে, আমিষ, ভিটামিন ও খনিজের চাহিদা বাড়ে। এ সময় খাওয়া দাওয়ার বেলায় যথাসাধ্য চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

অগ্রপথিক। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯

জন্ডিস ঃ কারণ ও প্রতিকার

ডা. (ক্যাপ্টেন) আবদুল বাছেত

জন্ডিস শব্দের অর্থ হলুদ। তাই এই রোগ হলে চোখ হলুদ, চর্মের বর্ণ হলুদ হয়ে যায় এবং সে জন্যই এই জন্ডিস রোগ বলা হয়। কেন চোখ ও চর্মের বর্ণ হলুদ হয়ে যায়, তার একটু ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন। এই হলে রক্তের রক্ত-কণিকা- ভেঙে বিলিরুবিন (Bilirubin) বলে একটি রক্তে বেশী জমা হয়ে পড়ে যার জন্য শরীরের রং অনেকটা হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

এই রোগের লক্ষণ কি ? চোখের বর্ণ হলুদ হওয়ার পরও আরো কিছু কিছু লক্ষণ— যা ভালভাবে লক্ষ করলে প্রথম থেকেই এই রোগ সহজ হয় এবং তখন থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করলে অনেকটা সহজে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। প্রথমেই ৩-৪ দিন সামান্য সামান্য জ্বর হয়। জ্বর খুব বেশী হয় না বলেই (১০০ থেকে ১০১) রোগী এটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। অর্থাৎ কিছু কিছু কাজকর্মও করে এবং এখানে সেখানে ঘুরেও বেড়ায়। তবে রোগী বুঝতে পারে যে, তার শরীরটা ভাল নেই এবং কাজকর্মে তার খুব একটা উৎসাহ বোধ হয় না। প্রথম দিকে এই রোগের সবচেয়ে বড় লক্ষণ এই যে, রোগীর ক্ষুধা কমে যায় এবং সে তার খাওয়ার প্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলে। ভাল ভাল মুখরোচক খাদ্যও তার ভাল লাগে না। জোর করে খেলেও তা হজম হয় না, পেটটা ফুলে থাকে, একটা দারুণ অস্বস্তি ভাব চলতে থাকে। লিভার-সেলগুলির অসুস্থতার কারণেই হজমের ব্যাঘাত ঘটে এবং তার জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিছুদিন এই অবস্থা চলার পরই চোখ ও শরীরের রং হলুদ হয়ে যায়, যা রোগী নিজেও আয়নায় দেখতে পারে অথবা তার নিকট আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের চোখে ধরা পড়ে।

তবে শরীরের রং হলুদ হওয়ার আগেই যে জিনিসটি দেখে এই রোগ চেনা যায়, সেটা রোগীর প্রস্রাব। ভাল করে লক্ষ করলে রোগী দেখতে পারে যে, তার ক্ষুধা-মান্দ্য হওয়ার পরই প্রস্রাবের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে এবং তখনি প্রস্রাবের একটা বিশেষ পরীক্ষা করলে, যাকে বলে বাইল পিগমেন্ট টেস্ট (Bile pigment test) এই রোগ ধরা পড়বে এবং প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভব হবে। এই

রোগের আরো লক্ষণ এই যে, রক্তে বিলিরুবিন-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় নাড়ির গতি (pulse rate) কমে যায়, ৭০-৭২ থেকে ৫০-৬০ এ নেমে আসে, সেইসঙ্গে লিভারের আকার বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা চুলকানি হয়। এইসব লক্ষণ দেখে এর কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। তিন ধরনের জণ্ডিস হতে পারে। যেমন (১) টক্সিক (Toxic) বা হেমোলাইটিক (Haemolytic) টাইপ, (২) ইনফেকটিভ (Infective) টাইপ, (৩) অবসট্রাকটিভ (Obstructive) টাইপ।

১. টক্সিক টাইপ মানে কোন বিষাক্ত পদার্থ বা ওষুধ দ্বারা রক্তের রক্ত-কণিকাগুলি ভেঙে যায়, বিলিরুবিন বের হয়ে আসে এবং জন্ডিসের সৃষ্টি করে। ওষুধের মধ্যে আর্সেনিক (Arsenic) এবং ক্লোরোফর্ম (Chloroform) জাতীয় ওষুধ দ্বারা এ ধরনের রোগ হতে পারে, যার জন্য আজকাল এগুলির ব্যবহার অনেকটা উঠে গেছে। সাপের কামড় (Snake bite) থেকেও এ ধরনের রোগ হতে পারে। সাপের বিষ দুই রকম, একটা হচ্ছে নিউরোজেনিক (Neurogenic) যা দ্বারা শরীরের নার্ভগুলো অবশ হয়ে যায়, আর অন্যটি হেমোলাইটিক (Heamolytic) যা দ্বারা রক্ত-কণিকাগুলি ভেঙে যায়।

ভেজাল খাদ্য

আজকাল সবচেয়ে বেশী জন্ডিস হচ্ছে ভেজাল খাদ্য খেয়ে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম অগ্নিমূল্য হওয়ায় ভেজাল খাদ্যে বাজার ছেয়ে গেছে এবং সবচেয়ে বেশি ভেজাল মেশানো হচ্ছে ঘি ও তেলজাতীয় খাদ্যে। এক সের খাঁটি ঘিয়ের দাম প্রায় দেড়'শ টাকা। এই টাকা দিয়ে ঘি কিনে খাওয়ার মত ক্ষমতা শতকরা নিরানব্বই জনেরই নেই। সুতরাং অসাধু ব্যবসায়ীরা ঘিয়ের সঙ্গে নানা রকম ভেজাল মিশিয়ে মাত্র ষাট টাকা দরে বিক্রি করছে। আর ক্রেতাগণ সস্তা পেয়ে সেইটাই কিনে খাচ্ছে– তা মোটেই বুঝতে পারছে না। সরিষার তেলে এমন এক ভেজাল মিশানো হচ্ছে, যার কড়া ঝাঁজ, খাঁটি সরিষার ঝাঁজকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর ক্রেতাগণ সেটাকে খাঁটি মনে করে কিনে খাচ্ছে। কিন্তু তারা মোটেই বুঝতে পারছে না যে, যে জিনিস দ্বারা ঐ ঝাঁজ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, সেটাই একটা বিষ। আজকাল শহরবাসীদের প্রধান ভোজ্যতেল হচ্ছে সয়াবিন। আর এই সয়াবিনেও নানাবিধ ভেজাল মেশানো হচ্ছে। যা খেয়ে পেটের নানা প্রকার পীড়া দেখা দিচ্ছে। এসব ভেজাল ঘি, সয়াবিন ও পাম-অয়েলের চেয়ে খাঁটি ভেজিটেবল ঘি বরং অনেক ভাল।

২. দ্বিতীয় প্রকার জণ্ডিস হচ্ছে– ইনফেকটিভ টাইপ (Infective Jaundice) অর্থাৎ রোগ-জীবাণু দ্বারা লিভার-সেল আক্রান্ত হওয়ায় এই রোগের সৃষ্টি হয়। যেসব রোগ-জীবাণু দ্বারা আমাদের শরীর আক্রান্ত হয়, তা দুই ভাগে বিভক্ত। এক গ্রুপ হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া (Bacteria), অন্য গ্রুপ হচ্ছে ভাইরাস (Virus)। ব্যাক্টেরিয়াগুলো

তুলনামূলকভাবে আকারে বড়, যা সাধারণ মাইক্রোস্কোপে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভাইরাসগুলো এত ছোট যে, আল্ট্রা-মাইক্রোস্কোপ ছাড়া এগুলো দেখা যায় না। এই ভাইরাস্ দ্বারা লিভারের এক রকম রোগ হয়, যাকে বলে ইন্‌ফেকটিভ হেপাটাইটিস (Infective Hepatitis) এবং এটাই হচ্ছে জন্ডিস রোগের প্রধান কারণ। অন্য আরো একটি রোগ দ্বারা জন্ডিস হতে পারে, সেটা হচ্ছে অ্যামিবিক হেপাটাইটিস (Amoebic Hepatitis)। আমাদের দেশে আমাশয়ের প্রকোপ অত্যন্ত বেশী এবং এই আমাশয় রোগে দীর্ঘদিন ভুগতে থাকলে তাতে লিভার আক্রান্ত হয় এবং জন্ডিস সৃষ্টি করে। এ ছাড়া অন্যভাবেও এ রোগ বিস্তার লাভ হতে পারে। যেমন– ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জ দ্বারা হাসপাতালে একই সিরিঞ্জ দ্বারা বিভিন্ন রোগীকে ইনজেকশন দেওয়া হয়। নিয়ম হল, এক রোগীকে ইনজেকশন দেওয়ার পর ঐ সিরিঞ্জ ভাল করে পরিষ্কার করে তবে অন্য রোগীকে ইনজেকশন দেওয়া। কিন্তু অনেক নার্সই গাফিলতী করে তা করে না, পরিষ্কার না করেই একাধিক রোগীকে ইনজেকশন দিয়ে ফেলে, তাতে একজনের রোগ অন্যজনের মধ্যে ছড়ায়। এভাবেও জন্ডিস হতে পারে। আরো একভাবে জন্ডিস হতে পারে এবং সেটা হচ্ছে রক্তগ্রহণ বা Blood transfusion দ্বারা। যিনি রক্ত দেন, তার রক্তেও রোগ-জীবাণু থাকতে পারে, যা দ্বারা রক্তগ্রহীতা—এই দুই জনের রক্তের গড়মিল থাক্‌তে পারে। যদি তা থাকে, তাহলে রক্ত-গ্রহীতার রক্ত-কণিকাগুলি সাংঘাতিকভাবে ভেঙে যাবে এবং ফলে ভয়ানক জন্ডিস দেখা দেবে। এই জন্যই রক্ত-গ্রহণের আগে উভয়ের রক্তের গ্রুপ্ ভাল করে পরীক্ষা করে নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

৩. তৃতীয় প্রকার জন্ডিস হচ্ছে অব্‌স্ট্রাক্‌টিভ টাইপ। অর্থাৎ কোনও বাধাজনিত কারণে লিভার সেল থেকে বিলিরুবিন বাইল-ডাক্‌ট (Bile duct) দিয়ে পার হয়ে যেতে পারে না। এই বাধার কারণগুলি হচ্ছে– গল্-ব্লাডার বা পিত্ত-থলিতে পাথর হওয়া, লিভার; পাকস্থলি বা প্যান্‌ক্রিয়াসে ক্যান্সার হওয়া, হাইডোটিড সিস্ট (Hydatid cyst) বলে এক রকম সিস্ট হওয়া, দীর্ঘদিন সিফিলিস্ রোগে ভুগতে ভুগতে লিভারে গামা হওয়া (Gumma of the liver) অথবা হজকিন ডিজিজ (Hodge Kin's disease) থেকে লিম্ফ গ্লান্ড (Lymph gland) বড় হয়ে যাওয়া।

প্রতিকার

এতক্ষণ আমরা জন্ডিসের কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করলাম। এবারে এর প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। উপরে সে সব বড় বড় অসুখের নামোল্লেখ করা হয়েছে, এগুলির চিকিৎসা ডাক্তার ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সুতরাং এসব রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে হবে এবং ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। তবে জন্ডিসের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সর্ব-সাধারণের যেটা করতে হবে সেটা

হচ্ছে ভেজাল খাদ্য পরিত্যাগ করা। এ ব্যাপারে সমাজসেবী বা জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে এবং ভেজাল খাদ্যের বিরুদ্ধে একটা সংঘবদ্ধ জনমত গড়ে তুলতে হবে। সরকারকেও এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকার ও জনসাধারণের যৌথ প্রচেষ্টায়ই ভেজাল খাদ্যের কু-চক্রীদলকে নির্মূল করা সম্ভব। সবাই ওঁৎ পেতে থেকে ভেজালকারীদের ধরার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রকৃত ভেজালকারীকে ধরতে পারলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে, যাতে একজনকে দেখে অন্য দশজন এমনিই ঠিক হয়ে যায়। কেউ কোন ভেজাল মেশানোর আড্ডা খুঁজে পেলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দিতে হবে এবং তাদের ধরিয়ে দিতে হবে। কোন খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন সন্দেহ হলে, স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টরের মারফত ঐ খাদ্য কেমিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে এবং দোকানের ঐ মালকেও আটক করতে হবে। এভাবে দু'একজন দোকানদারকে সাজা দিতে পারলেই বাকীরা আপনা-আপনি সাবধান হয়ে যাবে।

আরো একটি বিরাট কাজ আমাদের করতে হবে এবং সেটা হচ্ছে– আমাদের অভ্যাসের পরিবর্তন সাধন করা। 'সস্তার তিন অবস্থা'– এই মূল্যবান বাক্যটি মনে রেখে সস্তায় জিনিস কেনার অভ্যাস আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। অবশ্য কখনও কখনও ভাল জিনিসও কিছুটা কম দামে পাওয়া যায়, আমি সেটা কিনতে মানা করছি না। তবে সস্তায় পেলেই যে কোন জিনিস কিনতে হবে– এই প্রবৃত্তির অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। ভেজাল ঘি বা ভেজাল তেল এক কেজি খরিদ না করে, খাঁটি তেল আধাকেজি কেনার অভ্যাস গঠন করতে হবে। ভাজিতে একটু তেল কম হলেও সেটার জন্য আপসোস না করে যেটুকু খেলাম খাঁটি জিনিস খেলাম, মনকে এইভাবে প্রবোধ দিতে হবে। মোটকথা ভেজালের প্রতি এবং ভেজালকারীদের প্রতি একটা দারুণ অনীহা, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা জন্মাতে হবে। ভেজালকারীরা অধিক লাভের আশায় খাদ্যে ভেজাল মেশায়। তারা যখন দেখবে যে, তাদের ভেজাল খাদ্য আর কেউ কিনছে না, তখন তারাও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে এবং এই ব্যবসা ছেড়ে দেবে।

জন্ডিস দেখা দিলে ডাক্তারের চিকিৎসা ছাড়াও নিজেদের কিছু করণীয় আছে। চর্বি-জাতীয় খাদ্য যেমন ঘি, তেল, মাখন, ছানা, তেলওয়ালা মাছ ও মাংস একদম বর্জন করতে হবে। শর্করা ও আমিষজাতীয় খাদ্য বেশী করে খেতে হবে। শর্করাজাতীয় খাদ্য হচ্ছে– ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি। আর আমিষজাতীয় খাদ্য হচ্ছে মাছ, মাংস, ডিম ও মুসুরীর ডাল। জন্ডিস রোগীর সবচেয়ে বড় পথ্য হচ্ছে গ্লুকোজ ও ইক্ষু। ইক্ষু যদি বাজারে পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলি কিনে ভাল করে পরিষ্কার করে রস খেতে হবে। ইক্ষুর রস যত বেশী খাওয়া যাবে ততই উপকারী। ইক্ষু না পাওয়া গেলে, ফার্মেসী থেকে প্যাকেটের গ্লুকোজ কিনে খেতে হবে। একান্ত প্রয়োজনে

রোগীকে গ্লুকোজ ইনজেকশন দিতে হবে। এর সঙ্গে যে ওষুধ খাওয়া যায়, তা হচ্ছে– ভিটামিন 'সি' এবং ভিটামিন 'কে'। ভিটামিন 'কে' ইন্‌জেকশন ও ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায় কিন্তু এটার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া ভাল। তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই নির্দ্বিধায় যেটা খাওয়া যায় এবং জন্ডিসের জন্য যেটা অত্যন্ত উপকারী, সেটা হচ্ছে ভিটামিন (C)। লেবু, জাম্বুরা, কামরাঙা, আমরা, আনারস, লিচুতে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়। তাছাড়া ফার্মেসীতে ভিটামিন লজেন্স পাওয়া যায়, যা চুষে খেতে হয়। এটা খেতে বেশ মজা এবং দামেও সস্তা। ৫০-৬০ পয়সা প্রতি লজেন্স এটা দৈনিক ৩-৪ বার খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া ভিটামিন সি ট্যাবলেট ও ইনজেকশন আকারে ফার্মেসীতে পাওয়া যায় ভিটামিন C-কে বলা হয় Cementing Substance of the body. সিমেন্ট দিয়ে যেমন দুটি ইটকে জোড়া দেওয়া হয় এবং মাঝখানের ফাঁককে করা হয়, ভিটামিন C তেমনি শরীরের সেলগুলি (Cell) জোড়া দিয়ে রাখে এবং সেল-এর মাঝখানের ফাঁকগুলিকে বন্ধ করে দেয়, ফলে রোগ-জীবাণু সহজে এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। এভাবে ভিটামিন 'C' রোগ প্রতিরোধ করে, যার জন্য সর্দি, কাশী, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে মানুষ বেশী করে আনারস, আমড়া, কামরাঙা ও লেবু থাকে। ভিটামিন C রক্ত উৎপাদনেও সাহায্য করে, আবার রক্ত-কণিকাগুলি যাতে সহজে ভেঙে না যায় সে ব্যাপারেও সাহায্য করে। জন্ডিস রোগে ভিটামিন C অত্যন্ত উপকারী।

অগ্রপথিক। জুলাই ১৯৮৭

পেঁপে খান ঃ পুষ্টি বাড়ান

কাজী কেয়া

পেঁপে সুস্বাদু ও রসালো ফল। আমরা পেঁপের তেমন কদর করি না কিন্তু এই ফলটি অত্যন্ত উপকারী ফল। সকল মওসুমেই পেঁপে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এদেশীয় ফল-ফলাদির মধ্যে পেঁপে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কাঁচা অবস্থায় এটি যেমন একটি উৎকৃষ্ট সব্‌জি তেমনি পাকা পেঁপেও একটি সুস্বাদু ও উপাদেয় ফল। কাঁচা পেঁপের তরকারী যেমন সহজে হজম হয়, তেমনি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, যেমন গোশ্‌ত সহজে সুসিদ্ধ করতে কাঁচা পেঁপে বা পেঁপের আঠা সাহায্য করে। গোশ্‌ত যখন সহজে সিদ্ধ হতে চায় না তখন ঐ গোশ্‌তের মধ্যে কয়েক টুকরো কাঁচা পেঁপে বা কয়েক ফোটা পেঁপের কষ দিয়ে সেটি রান্না করলে তা সিদ্ধ হয় এবং সুস্বাদু হয়। এটা কেন হয় সেটা আমরা অনেকেই জানি না। কাঁচা পেঁপে বা পেঁপের গাছে বিভিন্ন অংশে এক ধরনের সাদা দুধের মতো রস বের হয়। ঐ রসের মধ্যে (পেপেইন) নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে, ঐ পদার্থের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। এর ফলে গোশ্‌ত সুসিদ্ধ হয়, একে জারক রসও বলে। এই পেপেইন প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে জীর্ণ করার কাজে সহায়তা করে। কাজেই কয়েক টুকরো পেঁপে বা পেঁপের কষ ঐ শক্ত গোশ্‌ত সহজে সিদ্ধ করে দেয় এবং গোশ্‌ত হজমেরও উপযোগী করে তোলে। তাই আমরা যদি কোনও প্রোটিন জাতীয় খাবার যেমন মাছ, ডাল, গোশত, সব্‌জি প্রভৃতি খেয়ে অসুবিধা বোধ করি বা পেট কামড়ানো শুরু হয় তখন হাতের কাছে কাঁচা পেঁপে থাকলে তার কষ বের করে চিনি দিয়ে মিশিয়ে খেয়ে নিলেই উপশম হবে। আরও বেশি উপকার পাওয়া যায় যদি এর সঙ্গে আদার রস মিশিয়ে নেয়া যায়। আমাদের প্রোটিন খাবার হজম করতে যে এনজাইমটি সাহায্য করে সেটি হচ্ছে পেপসিন। তাই পেপেইন এনজাইমটির কাজ করে থাকে। কাঁচা পেঁপের আরো কিছু গুণাগুণ বা উপকারিতার কথা বলবো। আমাদের দেশের কবিরাজরা বলেন, অজীর্ণ ও রক্তশূন্যতায় কাঁচা পেঁপে অত্যন্ত উপকারী ফল বা সব্জি। পেঁপের আঠা কৃমিনাশক ও রক্ত শোধনকারী। অন্যদিকে ফল হিসেবেও অত্যন্ত সুস্বাদু ফল এবং ঠাণ্ডা ফল। পেটের যে কোন অসুবিধা বা পাতলা পায়খানা, পেট গরম, লিভার কমপ্লেক্স প্রভৃতি রোগের উপশম ঘটায়।

তাই আমাদের প্রতিদিনের তরকারির কিছু অংশ পেঁপে বা বিকালের ও সকালের নাস্তার সঙ্গে কিছু পাকা পেঁপে রাখা উচিত।

পাকা পেঁপে আজকাল আর কমদামী ফল নয়। তবে আপেল বা আঙুরের তুলনায় এর দাম অনেক কম। আমরা বাড়ির আশেপাশে যদি কিছু খোলা জায়গাতে কয়েকটি পেঁপে গাছ রোপণ করি তাহলে এক বছরের মধ্যে প্রচুর ফল পাবো। আমাদের জলবায়ু পেঁপে চাষের জন্য অতি উপযোগী। তবে একটা কথা, যেখানে আলো-বাতাস লাগে ঠিক তেমন জায়গায় পেঁপে পাওয়া যাবে। পেঁপে গাছে তেমন পানির প্রয়োজন হয় না। যে মাটি উর্বর অর্থাৎ দো-আঁশ ও পলি মাটি সেখানেই পেঁপে গাছ রোপণ করার নিয়ম। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোনও অবস্থায় গোড়ায় পানি না জমে, তাহলে গাছের গোড়া পচে গাছ মরে যাওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। আমাদের দেশে লম্বা ও খাটো দু'জাতের পেঁপের চাষ হয়। লম্বা জাতের পেঁপের গাছগুলো বেশ লম্বা হয় ও ৫/৭ বছর ফল দেয়। খাটো গাছে ২/৩ বছর ফল হয়ে মারা যায়।

চারা লাগাবার সময়

পেঁপের চারা সারা বছরই লাগানো যায়। তবে বর্ষার সময় লাগালে পানি দেয়ার প্রয়োজন হয় না। পেঁপে গাছে প্রচুর পরিমাণে জৈব সারের প্রয়োজন হয়। তাই চারা লাগানোর আগে গোবর, আবর্জনা পচা সার, খৈল, টিএসপি ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়। পেঁপে ধরা শুরু হলে প্রতি গাছে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ২৫০ গ্রাম টিএসপি সার দেবেন। এক বছরের গাছে ফল ধরা শুরু করে এবং তিন মাসের মধ্যে ফল পেকে যায়।

পেঁপে থেকে বিবিধ খাবার প্রস্তুত করা যায়। সবজি হিসেবে পেঁপে আমাদের প্রতিদিনের চাহিদা মেটাতে পারে। এ ছাড়া মোরব্বা, চাটনি, হালুয়া, মিষ্টি, সেমাই প্রভৃতি মুখরোচক খাবারও তৈরি করা যায়। এক কথায় খাদ্যপুষ্টির জন্য পেঁপে অতুলনীয়। এটি পুষ্টিহীনতা ও অন্ধত্ব রোধ করে। তাই সকলের উচিত পেঁপের তরকারি ও পেঁপে দ্বারা বিভিন্ন খাবার তৈরি করে পুষ্টি বাড়ানো।

পেঁপের সেমাই

পেঁপেকে কুরানী দ্বারা বা মেশিন দ্বারা সরু সরু সেমাইয়ের মতো কুচিয়ে নিন পরে ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরতে দিন। উনুনে কড়াই চাপিয়ে আন্দাজমত পানি দিয়ে চিনি ঢালুন এবং নাড়তে থাকুন, নাড়তে নাড়তে যখন চিনি রস রসগোল্লার রসের মতো হয়ে আসবে, তখন পেঁপে কোঁচানোটা ঢেলে দিন এবং আধা ঘন্টা সিদ্ধ করুন, পরে এলাচ ও গোলাপ জল দিয়ে নারিয়ে নিন। ঠাণ্ডা হলে তা পরিবেশন করুন।

পেঁপের চাটনি

পেঁপেকে সিদ্ধ করে নিন এবং তা ছিলে বেটে নিন। এরপর উনুনে কড়াই চাপিয়ে পরিমাণমতো তেল ঢালুন। কাঁচা পিঁয়াজ কুটা ও কাঁচা মরিচ দু'একটা, সামান্য জিরে বাটা, হলুদ ও আদা বাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। পরে বাটা পেঁপে ঢেলে দিয়ে সামান্য পানি দিন। পরে ভালো করে ফুটে গেলে রসুন কুচা ও লবণ ছড়িয়ে দিন। তারপর নাড়তে নাড়তে ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন ও ধনে গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। এটা খুবই মুখরোচক খাবার।

ভেষজ ঔষধ করলা

মুহাম্মদ ইসমাইল

করলা একটি অতি পরিচিত সবজি। কেবল সবজি হিসেবে নয়, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এর বহুল ব্যবহার হয়। এ জন্য এটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। করলা সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, এটি ভিন্ন ভিন্ন রোগে একক ও মিশ্র উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। এটি ছোট বড় দু'ধরনের হয়ে থাকে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

বিভিন্ন ভাষায় নামে ঃ

বাংলায় ঃ করলা

ইংরেজীতে ঃ Hairy Mordica

আরবীতে ঃ ক্বাছা উলহেমার

উর্দু ও তিব্বিতে ঃ করেলা

বৈজ্ঞানিক ঃ Var এবং Cucurbitaccae পরিবারভুক্ত।

প্রাপ্তিস্থান ঃ পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম-দু' গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ও Momordica গণের অন্তত ২৫টি প্রজাতি (Species) বর্তমান, তার মধ্যে উপমহাদেশে অন্তত ৫/৬টি পাওয়া যায়। আমাদের বাংলাদেশে সর্বত্রই জন্মে। এটি বর্ষজীবী লতা কিন্তু এ লতাগাছ অন্য গাছে, বেড়ায় বা মাচার আশ্রয়ে বড় হয়। এর পাতা হাতের পাঞ্জার মত এবং অমসৃণ খাঁজকাটা, কোনটিতে তিনটি আবার কোনটিতে চারটি খাঁজ থাকে। পাতাটির বোঁটা দেড় ইঞ্চি লম্বা, হলদে রং-এর ফুল এবং এ ফুলের বোঁটাটিও দেড় থেকে দু'ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ ঔষধার্থে করলার লতাপাতা, ফল, মূল ও বীজ ব্যবহৃত হয়। মিযাজ বা প্রকৃতি ঃ হাকীমগণের নিকট এর মিযাজ বা প্রকৃতি তৃতীয় শ্রেণীর উষ্ণ, শুষ্ক, স্বাদ ঃ তিক্ত।

মহান রাব্বুল আলামিন মানুষের মনের রুচি-অরুচির খবর জানেন। তাই তো বৈচিত্র্যপিয়াসী মানুষের জন্য তিনি সাজিয়েছেন দুনিয়াটাকে নানা রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণে। বৈচিত্র্য আছে বলেই তো পৃথিবী এত সুন্দর। বৈচিত্র্যের কারণে করলা মিষ্টি না হয়ে তিক্ত হয়েছে। করলা বা উচ্ছে উভয়ই তিক্ত। তবে আকারে বড় ও ছোট। পার্থক্য কেবল এতটুকুই। বাংলাদেশের সর্বত্রই করলা বা উচ্ছে জন্মে। কৃষি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উচ্ছের তিক্ততা অপেক্ষাকৃত বেশী এবং আর্দ্র পরিবেশে করলার মত ভাল জন্মায় না। কচি করলা

মাছ সহযোগে এবং ভাজি হিসেবে খুব সমাদৃত। কোনও কোনও দেশে করলার পাতাও রান্না করে খাওয়া হয়। করলা শুকিয়ে টিনজাত করে সংরক্ষণও করা যায়। তা ছাড়া রুচিবর্ধক, কৃমিনাশক গুণের অধিকারী করলা ছোট বেলা থেকেই শিশুদের খাওয়ানের অভ্যাস করা উচিত। এক বাটি করলা ভাজি আপনাকে দেবে ৬০ ক্যালোরী। এ ছাড়া আপনার শরীরে লৌহ ও ভিটামিন-সিরে চাহিদা পূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

১০০ গ্রাম করলা আপনাকে দেবে ৯ দশমিক ৪ মিলিগ্রাম লৌহ, ২৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ২ দশমিক ৯ গ্রাম প্রোটিন, ১ গ্রাম ফ্যাট, ৯৮ গ্রাম শর্করা, ৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১৪০ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ২১০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন-এ উপাদান ক্যালোটিন এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স। করলার দু'টি তোলা নাম আছে। একটি কারবেল্লক, অপরটি কঠিল্লক। রুচিকর করলা সবজি হিসেবে যেমন ভাল তেমনি ভেষজ গুণাবলীতেও ভরপুর। কফ, পিত্ত ও জ্বরনাশক করলা লঘু পাক।

বিভিন্ন রোগে করলা ঃ

বাত রক্তে ঃ এ অবস্থায় করলা বা উচ্ছে পাতার রস ৪ চা চামক একটু গরম করে তার সঙ্গে দেড় চামচ গাওয়া ঘি মিশিয়ে ভাতের সঙ্গে অথবা রুটির সঙ্গে খেতে হবে। প্রতিদিন যার এটা করতে অসুবিধা, তার অন্তত ২৫০ গ্রাম ঘি নিয়ে ঘিয়ের চারগুণ উচ্ছে পাতার রস তাতে মিশিয়ে জ্বাল দেবে। পানি যখন নিঃশেষ হয়ে শুধু ঘি থাকবে তখন নামিয়ে ফেলতে হবে। সে ঘি প্রত্যহ ২ চা চামচ করে খেলে বাত রক্তের দোষ উপশম হবে।

গুটি বসন্তে ঃ এর গুটিগুলি একটু গভীরে অবস্থান করে, তাই উঠতে যেমন দেরী হয়, তেমনি তার যন্ত্রণাও খুব বেশী। এ ক্ষেত্রে হলুদের গুঁড়ো আধ গ্রাম থেকে এক গ্রাম এবং উচ্ছে পাতার রস এক চামচ পরিমাণ একটু গরম করে সে রস দিনে ২/৩ বার খেতে দিতে হবে। এর দ্বারা যে গুটিগুলো বেরোয়নি সেগুলো বেরিয়ে পাকবে এবং শুকিয়ে যাবে। এ রোগে অনেক সময় হাত-পা খুব জ্বালা করে। এ ধরনের জ্বালা করলে উচ্ছে পাতার রস হাত ও পায়ের তালুতে লাগালে জ্বালা কমে যায়।

গুঁড়ো কৃমিতে ঃ ঝুরো কৃমি বা গুঁড়ো কৃমিতে করলা বা উচ্ছে পাতার রস বয়স্কদের জন্য এক বা দু'চামচ, আর বাচ্চাদের জন্য আধা চামচ করে সকালে ও বিকেলে একটু পানি মিশিয়ে খেতে হবে। কয়েক দিন এভাবে খেলে কৃমির উপদ্রব চলে যাবে।

পিত্ত-শ্লেষ্মা জ্বরে ঃ অনেক সময় ম্যালেরিয়া জ্বরে ও পিত্তশ্লেষ্মার বিকার ঘটে থাকে, তখন উপসর্গ হিসেবে শরীর কামড়ানি, পিপাসা, বমি ইত্যাদি দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে করলা পাতার রস এক চা চামচ একটু গরম করে অথবা গরম চা-এর সাথে মিশিয়ে দিনে ২/৩বার খেতে হবে। এতে জ্বরের উপসর্গগুলো দূর হবে এবং জ্বরও কমে যাবে।

চুলের পরিচর্যা

ইশরাত জাহান চৌধুরী

প্রথম দর্শনেই ভাল লাগল। আরো একটু মনোযোগী এবং সাথে সাথে আরো বিস্মিত হয়ে উঠল দুচোখ। একগুচ্ছ ঘন, কৃষ্ণবর্ণ এবং দীর্ঘ চুল দুলে দুলে উঠছিল। কোন এক সময় কোন এক স্থানে দেখা মেয়েটিকে আরো অপরূপ করে তুলেছিল তার সেই অনিন্দ্যসুন্দর কেশগুচ্ছ। মনের অনুক্ত ইচ্ছেটা জাগ্রহ হয়ে ওঠে, আহা, যদি আমারও এমন হতো। একটু নির্মম শোনালেও সত্যি যে, সকলেই তেমন সুন্দর চুলের অধিকারী নন, এটা আল্লার দান। তাই বলে হতাশ হবার কিছু নেই, একটু যত্ন নিলে আপনিও বাড়াতে পারেন আপনার চুলের জৌলুস। আপনার অনুকূলে মানসিকতা আপনাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করবে।

আজকাল প্রসাধনী দ্রব্যে বাজার ভরে গিয়েছে, অন্যান্য প্রসাধনী সামগ্রীর মত চুলের পরিচর্যার জন্যও এসেছে বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী। তা সত্ত্বেও চুলের নানা সমস্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস পাচ্ছে না। প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহারের পর সমাধান ও উপকারিতা না পেলে চিন্তিত হওয়াই স্বাভাবিক। কেমিক্যাল ওষুধের ওপরও অনেকে হয়ে পড়ছেন আস্থাহীন। এই সকল অনাস্থা, হতাশা দূর করে আপনাকে বিশ্বস্ত করে তোলা যায় কি করে ? হয়ত প্রাকৃতিক সম্পদের মাঝেই ফিরে পেতে পারেন আপনার বিশ্বাস, নির্ভরতা ও সৌন্দর্য।

চুল পরিচর্যার বিপুল সম্ভার নিহিত রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদে। এর মাঝ থেকে বেছে নিন আপনার উপযোগী উপাদানটি। চুলের যত্ন করবেন কি করে ? চুল যাদের লম্বা বা আগা ফেটে যায়, তারা চুলের আগা মাঝে মাঝে ছেঁটে সমান করে নেবেন। সপ্তাহে দুদিন চুলের গোড়ায় খুব ভালো করে তেল মেসেজ করবেন। রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে ৫০-১০০ বার চুল ব্যাক ব্রাশ করে ভালো করে বাঁধবেন। চুল বেশি করে ব্যাক ব্রাশ করে নিলে চুলের গোড়ায় রক্ত বৃদ্ধি পায় যা চুলের জন্য অত্যন্ত ভালো। যারা তেলতেলে ভাব পছন্দ করেন না তারা তেল দেবার পরদিন বা কয়েক ঘন্টা পরে চুলে শ্যাম্পু করে নিলে চুল ঝরঝরে হয়ে উঠবে।

অনেকেই মাথায় চুলের খুসকি সমস্যায় ভুগছেন। টক দই মাথায় মেখে আধ ঘন্টাখানেক পরে ধুয়ে ফেলুন। উপকার পাবেন এবং চুলও পরিষ্কার হবে। এছাড়া দু'চামচ আদার রসের সংগে দু'চামচ ভিনিগার মিশিয়ে মাথায় ভালো করে মেখে ঘন্টা দুই পরে শ্যাম্পু করুন। এভাবে ৪/৫ দিন করে যান। মশুরের ডাল বেশ কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে বেঁটে মাথায় লাগালেও ভালো ফল পাবেন। এভাবে আরেকটি প্রক্রিয়াতেও আপনি উপকৃত হতে পারেন। খৈল পানিতে ভিজিয়ে নরম করে চুলে দিলেও উপকার পাবেন। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনে শ্যাম্পু করতে পারেন। সপ্তাহে ২/৩ দিন ঈষদুষ্ণ অলিভ ওয়েল চুলের গোড়ায় ঘষে ঘষে লাগাবেন।

চুলকে খুসকিমুক্ত রাখতে খাদ্য তালিকায় ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স, 'সি', 'ই' ও প্রচুর শাকসব্জি এবং প্রোটিন জাতীয় খাদ্য যোগ করুন। উপকৃত হবেন যদি কয়েকটি আমলকি রাতে ভিজিয়ে রাখেন এবং সকালে ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে পান করতে পারেন। এ তো হলো খুসকি সমস্যা। চুল যারা সজীব করে তুলতে চান তারা ১টি ডিম ও ১কাপ টক দই মিশিয়ে চুলে ঘষে ঘষে লাগান। আধ ঘন্টা পর শ্যাম্পু করে ফেলবেন। চুল রুক্ষ হয়ে থাকলে মধু ও পানি পরিমাণমত নিয়ে ফেটিয়ে চুলে লাগান। চুলে মসৃণতা আসবে, আবার শ্যাম্পু করার পর লেবু বা ভিনিগার পানিতে মিশিয়ে চুল ধুয়ে ফেলবেন। কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে এটা করতে পারেন। এতে চুলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া চুল ভালো রাখার কয়েকটি সাধারণ ব্যাপারের উপর আপনার অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে। যে শ্যাম্পুই ব্যবহার করবেন তা যেন ভালো হয়। সাবান দিয়ে কখনই চুল ধোবেন না। চুলের পক্ষে ক্ষতিকর, গোসলের পর অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চুল রোদে শুকানো উচিত নয়। বছরের যে কোন সময়েই হোক, হালকা রোদে বাতাসে চুল শুকিয়ে নেবেন। ঘন ঘন হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকাবেন না। গোসলের কিছুক্ষণ পর চুল আঁচড়ানো ভালো। কারণ ভেজা অবস্থায় চুলের গোড়া নরম থাকে, সে কারণে গোসলের সাথে সাথে চুল আঁচড়ানো উচিত নয়, চুলের চিরুনি ও ব্রাশ যথাসম্ভব পরিষ্কার ও ভিন্ন রাখবেন। মাঝে মাঝে ডেটল পানিতে চুল ধুয়ে রোদে শুকাবেন। এতে খুসকি কম হবে। চুল বেশি তেলহীন রাখবেন না, চুলের আগা এতে ফেটে যাওয়ার আশংকা থাকে। মেয়েরা আজকাল আর আগের মত ঘরে বসে নেই। পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, মেয়েরাও তাই জীবনের তাগিদে সীমাবদ্ধতার গণ্ডী পার হয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পরছেন। কর্মস্থলের নানা জায়গায় ছোটাছুটির সময় সাথের হ্যাণ্ডব্যাগ বা পার্সটিতে একটি চিরুনি ফেলে রাখতে পারেন আনায়াসেই। আপনার চুলের সজ্জা

বিন্যাস করুন আপনার গন্তব্যস্থলের পারিপার্শ্বিকতার ওপর লক্ষ্য রেখে। যে অনুষ্ঠানেই যান, চুলকে সাজাবেন আধুনিকতার ছাঁচে এবং অবশ্যই তা হতে হবে রুচিশীল। আধুনিকতার দোহাই দিয়ে এমন কোনও বিন্যাস কখনই করা উচিত নয় যা আপনার ব্যক্তিত্ব খর্ব করে, আপনার সৌন্দর্যের হানি ঘটায়।

পরিশেষে আবার বলছি ধৈর্যহারা হবেন না। আপনার এই গতিশীল জীবনে বিশ্বাস এবং ধৈর্যের মূল্য অপরিসীম। জীবনটিকে সহজ ও সুন্দরভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস। স্নিগ্ধ ও রুচিশীল সৌন্দর্য আপনার উন্নত মানসিকতা গঠনে অপরিহার্য—যা আপনার আত্মবিশ্বাসকে করবে সুদৃঢ়। ফলস্বরূপ আবার ফিরে পাবেন আপনার হারানো সৌন্দর্য, আরো অপরূপ হয়ে উঠবেন আপনি।

অগ্রপথিক। অক্টোবর ১৯৮৭

ডেঙ্গু ঃ প্রয়োজন সামাজিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ

রশিদ আহাম্মদ

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ ডেঙ্গু জ্বর। বিভিন্ন মিডিয়া ও চিকিৎসক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় এ মওসুমে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। তুলনামূলক হারে শিশুরাই আক্রান্ত হচ্ছে বেশি। সরকারি-বেসরকারি সূত্রগুলি থেকে প্রাপ্ত হিসাব মতে দেখা যায় এ পর্যন্ত (নিবন্ধটি লেখাকালীন সময়ে) সারা দেশে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩ হাজার ৫৬৩ জন। আর মৃতের সংখ্যা ৩৯ জন। মাসাধিককালেরও বেশি সময় ধরে ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ শুরু হয়েছে এবং তা ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। দিন দিন যে হারে এই জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে দেশবাসীর আতঙ্কিত হবারই কথা। তবে জ্বর বলেই 'ডেঙ্গু জ্বর' তা মানতে নারাজ চিকিৎসক মহল। তাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা– এতে আতঙ্কিত হবার কিছু নাই। এবার আবহাওয়ার কারণে অর্থাৎ অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাতের কারণেই ডেঙ্গু জীবাণুবাহী এডিস মশা বৃদ্ধি পেয়ে থাকতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে ডেঙ্গু মশাবাহিত ভাইরাস রোগ। এডিস (Aedes aegypti) প্রজাতির একটি মশার মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। এ মশা নিলাভ কালো দেহে সাদা ডোরাকাটা দাগসম্পন্ন হয়ে থাকে। এ মশা সধারণত দিনের বেলা কামড়ায়। চার ধরনের ভাইরাসে এ রোগ হয়। এক ভাইরাসে আক্রান্ত হলে ওই দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই। পরবর্তী সাত-আট মাস দ্বিতীয় কোনও ভাইরাস আক্রমণ করে না। তবে দ্বিতীয়বার ইনফেকশন হলে সাধারণত মারাত্মক ডেঙ্গু হেমোরেজিক জ্বর হয়। সে জন্যই ডেঙ্গু হেমোরেজি জ্বরের রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে।

লক্ষণসমূহ

তীব্র জ্বর যা ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্তও হয়ে থাকে। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড মাথাব্যথা, সারা শরীর ব্যথা, চোখের পিছনে তীব্র ব্যথা, পিঠ ও হাড়ের মধ্যে ব্যাথা, বমি অথবা বমি বমি ভাব, মাত্রাতিরিক্ত ঘাম নির্গত হওয়া, তীব্র পেট ব্যথা এবং অনেক সময় শরীরের বিভিন্ন জায়গায় র‍্যাশও দেখা যায়। আবার কখনও কখনও

শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন চামড়ার নিচে, দাঁতে, নাকে, চোখে, ঠোঁটে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এই অবস্থায় তাৎক্ষণিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরী।

ব্যবস্থাপনা

১. বিশেষজ্ঞদের মতে যেহেতু জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার ৩/৪ দিনের মধ্যে রক্তে কোন পরিবর্তন হয় না, সেহেতু জ্বরে আক্রান্তকে পর্যাপ্ত পানি পান করাতে হবে, যাতে রোগীর পানিশূন্যতা না দেখা দেয়, এছাড়া উপসর্গ-অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। প্যারাসিটামল দেয়া যেতে পারে। রক্তক্ষরণের প্রবণতা বাড়ায় বলে এসপিরিন দেয়া যাবে না।

২. জ্বর জটিলতার দিকে মোড় নিলে (রক্তবমি, রক্তক্ষরণ) হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। প্রচুর পরিমাণ ফ্লুইড খাওয়া যেতে পারে।

৩. ডেঙ্গু রোগীর প্লাটিলেট কাউন্ট নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। রক্তে প্লাটিলেটের পরিমাণ ১৫ থেকে ২০ হাজারের মধ্যে নেমে গেলে তখনই এটা দেয়া যেতে পারে। অবশ্য রক্তক্ষরণ এবং হেমোরেজিক উপসর্গ দেখা দিলে আগেও এটা দেয়া যাবে আর এই প্লাটিলেট দিতে হবে 'রানিং ফর্মে'। অন্যথায় এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ড্রপ বাই ড্রপ নয়।

৪. এর প্রতিষেধকের ব্যাপারে থাইল্যান্ডের মহিদল ইনিভার্সিটিতে বিশেষজ্ঞরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

৫. ডেঙ্গু জ্বরে স্টেরয়েড এবং এন্টিবায়োটিক ভূমিকা সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানা যায়নি।

প্রতিরোধ

এডিস মশা ডমেস্টিক বা গৃহপালিত। দেয়ালের কোণে, দরজার ফাঁকে ও পর্দার ভাঁজে সেঁটে থাকে এডিস। মশার ডিম পাড়ার বা লার্ভা জন্মাবার জায়গা হলো জলকান্দা, ডিমের খোসা, নারিকেলের খোসা, গাড়ির পরিত্যাক্ত টায়ার ও ফুলের টবে জমা-থাকা পানি এবং বাসার পাশে জমানো আবর্জনা। এ সমস্ত জায়গায় যাতে এডিস মশা ডিম পেরে বংশ বৃদ্ধি না করতে পারে সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিরোধ ও প্রতিকার দুটির জন্যই দরকার গণসচেতনতা।

অগ্রপথিক। সেপ্টেম্বর ২০০২

শীতে ত্বকের পরিচর্যা

নাসরিন চৌধুরী

শীতের দিনগুলো বেশ শুষ্ক। তাই দেহ-ত্বকে নেমে আসে রুক্ষতা। মানবদেহের সৌন্দর্যের হাতিয়ার হচ্ছে মসৃণ ত্বক। প্রসাধনীর বাহুল্য ত্বকে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারে তা সত্য কিন্তু সে সৌন্দর্য সাময়িক। অতিরিক্ত প্রসাধনী ব্যবহার করার ফলে ত্বকের সমূহ ক্ষতি হয়। আমরা শীতের দিনগুলোতে প্রসাধনীর উপর নির্ভর না করেও দেহ ত্বককে সতেজ ও ও মসৃণ রাখতে পারি। তার জন্য চাই কেবল কয়েকটি উপকরণ যা অনায়াসে সংগ্রহ করা যায় অল্প খরচে। আমাদের সৌন্দর্য চর্চার পূর্ব ইতিহাস আলোচনা করলে পাই আগে নারীরা সাজতো ফুলের অলংকার পরে। কালিদাসের কাব্য 'মেঘদূতে' পাই যক্ষ প্রিয়ার ফুলের সাজে সাজবার কথা। রাধিকা সাজে নীলাম্বরী শাড়ি পরে আর সর্ব অঙ্গে ফুলের গয়না পরে। সম্রাজ্ঞী নূরজাহান অত্যন্ত রূপবতী মহিলা ছিলেন। তাঁর ভেতর ছিল সৌন্দর্যকে টিকিয়ে রাখবার দুর্বার সাধনা। তিনি ভালবাসতেন গোলাপ পানিতে দেহ ত্বকে ভিজিয়ে ত্বকের পেলবতা বজায় রাখতে। আমাদের ইসলাম ধর্মে নারীর সাজগোজকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাকে ইসলাম সমর্থন করেছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেহ-মন এবং পোশাক-আশাক হলেই একজন মানুষকে সুন্দর দেখায়।

আজ আমি দেহের ত্বকের যত্ন কিভাবে নিতে হবে তা বলবো। দামী ক্রিম, স্নো, মাখলেই ভাববেন না আপনার ত্বকের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন আছে। আমাদের ত্বকের গোড়ায় ছোট ছোট লোমকূপ আছে, অতিরিক্ত ক্রিম মাখার ফলে সেই লোমকূপগুলোর পথ বন্ধ হয়ে যায়, ফলে মুখে ছোট ছোট গোটা উঠতে দেখা যায়। কখনও বা ব্রন ওঠে। ব্রন অবশ্য বয়ঃসন্ধিকালেই বেশি ওঠে। যাদের তৈলাক্ত ত্বক তাদেরই ব্রন হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিদিন রাতে ঘুমুবার আগে কুসুম গরম পানিতে হাত মুখ ধুয়ে নিন। গ্লিসারিনের সঙ্গে গোলাপ পানি মিশিয়ে আয়নার সামনে বসে তা মুখে মালিশ করুন। হাতে-পায়ে দিন। সকালে ঘুম ভাঙলে মুখ ধুয়ে ফেলুন, এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে। পুরো শীতকালটা আপনি রাতে ঘুমুবার আগে মুখের ত্বকের এই যত্নটুকু নিতে পারেন।

বাজারের দামী ক্রিম মেখেই আপনি হয়ত ভাবছেন এটিই যথেষ্ট, আসলে কিন্তু তা নয়। আপনার শিশুরও শীতে স্বাভাবিক লাবণ্য হারাচ্ছে। পাউডার একদমই এখন শিশুর গায়ে দেবেন না। পাউডারে চামড়া আরো খসখসে হয়ে যায়। গোসলের আগে শিশুর গায়ে অলিভ অয়েল কিংবা সরিষার তেল মেখে নিতে পারেন। কুসুম গরম পানিতে শিশুকে গোসল করাবেন। গোসলের পর শিশুর শরীরে মুখে বেবি লোশন মেখে দিন।

শীতে গৃহিণীদের হাতের ত্বক খসখসে হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। মেয়েদের সৌন্দর্যে হাতের ভূমিকাও রয়েছে। তাই হাতগুলোতে যেন রান্নার মশলার দাগ লেগে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখবেন। নখের যত্ন নিন। সপ্তাহে অন্তত একটি দিন হাতের পরিচর্যা করতে হবে। কাগজি লেবু কেটে হাতে ঘষে নিন, এতে খসখসে চামড়া মসৃণ হবে। কমলালেবুর খোসা মিহি করে বেঁটে দুধের সরের সঙ্গে মিশিয়ে হাত মুখে মেখে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ানো যায়। অল্প সময়ে অল্প খরচে অনায়াসে প্রকৃতির এই জিনিসগুলোর সাহায্যে দেহ-ত্বকের যত্ন নেয়া যায়।

যুগের পরিবর্তনে আমরা আধুনিকতার চরম শীর্ষে পৌঁছে গেছি। নিত্য-নতুন উদ্ভাসিত হচ্ছে সাজ-সরঞ্জাম, প্রাচীনকালে তো এগুলো ছিল না তবুও নারী ছিল সুন্দর সাজে কোমল আকর্ষণীয়া। কিন্তু কেমন করে ? তা হলো প্রকৃতির সাহায্য।

ফুল, ফুলের রেণু সব তারা ব্যবহার করতো। শীতের সকালে ঘাসের বুকে যে শিশির কণা জমে থাকে, তা হাতে নিয়ে চোখের মণিতে লাগান, চোখের জ্যোতি বেড়ে যাবে। আসলে শুধু প্রসাধনীর উপর নির্ভর করলে চলবে না। কাঁচা হলুদ এখন বাজারে প্রচুর পাওয়া যায়। কাঁচা হলুদ বেঁটে ত্বকে দিন, এতে ত্বকে খাজলি, পাঁচড়া হবে না। কাঁচা হলুদের সঙ্গে সামান্য নিমপাতা দিতে পারলে আরো ভাল হয়। নিমপাতায় একটি তেতো স্বাদ আছে তা ত্বকের লোমকূপের তলায় জমে—থাকা ময়লা দূরে করতে সক্ষম। সুন্দর থাকতে চাইলে আপনি যে-কোন সময় প্রকৃতির এই সামান্য জিনিসগুলো ব্যবহার করে সুন্দর থাকতে পারবেন অনায়াসে।

অগ্রপথিক। ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

জলজ বিভীষিকা আর্সেনিক

নিক্সন তালুকদার

অগণিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত এই বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে আর্সেনিক দূষণ সৃষ্টি করেছে ভয়াবহ এক পরিস্থিতি। আমরা জানি, পানির অন্য নাম জীবন। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই পানিই একসময় মরণের কারণ হয়ে যায়। আর্সেনিক দূষিত পানিই তার অন্যতম প্রমাণ। ইদানীং এই আর্সেনিক একটি অন্যতম ভয়াবহ বিভীষিকারূপে আবির্ভূত হয়েছে।

একটা সময় ছিলো যখন এদেশে বিশুদ্ধ পানির অভাবে অনেক পানিবাহিত রোগে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটতো। পরবর্তীকালে এসব রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আমাদের দেশের প্রায় ৯৭% মানুষকে নলকূপের বিশুদ্ধ পানির আওতায় আনা হয়। কিন্তু সেই নিশ্চিত নিরাপত্তার নলকূপই এখন ছড়াচ্ছে এক মরণ-বিষ। নলকূপের পানিকেই আমরা সবাই নিরাপদ ভাবতাম। সময়ের বিবর্তনে বহু ক্ষেত্রে এই নলকূপের পানিই আজ সবচে বেশি অনিরাপদ। সেই নলকূপ আজ আক্রান্ত হয়েছে আর্সেনিক দূষণে– যা থেকে পরিত্রাণের তেমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষেধক আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তবে এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা চলছে এবং এ বিষয়ে সফলও হচ্ছে কমবেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নলকূপের পানিতে ০.০১ থেকে ০.০৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিক মানুষের জন্য সহনীয় বলে ঘোষণা করেছে। তবে ইদানীং এর চেয়ে বেশি যাচ্ছে বলেই গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

আর্সেনিক কি তা আগে জানা দরকার। প্রকৃতিতে আর্সেনিককে মুক্ত-মৌল হিসেবে সাধারণত পাওয়া যায় না। আর্সেনিক একটি সর্বব্যাপ্ত উপাদান, যা প্রকৃতপক্ষে একটি মারাত্মক বিষ। বিষধর সাপের বিষে আর্সেনিকের উপাদান রয়েছে। এ ছাড়াও প্রকৃতির আরো অনেক উৎসের মাঝে আর্সেনিক রয়েছে। আর্সেনিক স্ফটিকের মতো একটি ভঙ্গুর ধাতব মৌল— যা ফিকে, ধূসর ও সাদা বর্ণের হয়ে থাকে। পর্যায় সারণীতে এর অবস্থান ৫নং গ্রুপে। এর আণবিক সংখ্যা ৩৩ এবং আনবিক ওজন ৭৪.৯২। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সক্ষম মৌলিক পদার্থ হিসেবে একটি অন্য পদার্থের সাথে রঞ্জনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। ৭৬ মিলিগ্রামের একটি পুরিয়া (আর্সেনিকের) একটি

মানুষের জীবননাশের জন্য যথেষ্ট। সারা পৃথিবীতে তেরটির মতো আর্সেনিক যৌগের উপস্থিতি বিদ্যমান। তবে মূলত তিনটি খনিজ (Mineral) পদার্থকে আর্সেনিকের আকর (Ore) হিসেবে গণ্য করা হয়। এগুলো অতি সহজলভ্য এবং পরিমাণেও অত্যধিক। এই তিনটি খনিজ হচ্ছে– (১) রিয়ালগার (Realgar) বা আর্সিনিক সালফাইড (২) অরপিমেন্ট বা আর্সেনিক ট্রাই সালফাইড (৩) আনোসোপাইরাইট বা আয়রণ আর্সেনিক সালফাইড। এসব খনিজের গন্ধ কাঁচা রসুনের মত, তবে আর্সেনিকযুক্ত পানিতে এ ধরনের গন্ধ পাওয়া যায় না। তাই এটা ধরা পড়ে না সহজ। আর আর্সেনিকযুক্ত পানিকে আলাদা করারও তাৎক্ষণিক সহজসাধ্য কোনও উপায় নেই। দেশের প্রায় সব অঞ্চলে গভীর নলকূপ থেকে, কোথাও বা অগভীর নলকূপ থেকে আর্সেনিকযুক্ত পানি নির্গত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যায়। দেশের বেশীর ভাগ মানুষ আজ আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি নিয়ে মানবেতর দিনাতিপাত করছে। আর্সেনিক বিষের মাত্রা ১২৫ মিলিগ্রাম। এমনকি পারদের চেয়েও যা ৪গুণ বেশি শক্তিশালী। আর্সেনিক বিক্রিয়ার ফলে যেসব উপসর্গ বা রোগ বালাই দেখা দিতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে– প্রাথমিক পর্যায়ে (ক) চামড়ার রং কালো হয়ে যাওয়া (ছোট ছোট কালো দাগ বা সম্পূর্ণ কালো হয়ে যাওয়া (মেলানোসিস), (খ) চামড়া শক্ত ও খসখসে হয়ে যাওয়া (বিশেষ করে হাত ও পায়ের তালু (কেরাটোসিস), (গ) চোখ লাল হয়ে যাওয়া (কনজাংটিভাইটিস) (ঘ) শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ (ব্রঙ্কাইসিক), (ঙ) বমি বমি ভাব, বমি ও পাতলা পায়খানা (প্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস)। দ্বিতীয় পর্যায়ে (ক) ত্বকের বিভিন্ন স্থানে সাদা-কালো দাগ (লিউকোমেলানোসিস), (খ) হাত পায়ের তালুতে শক্ত গুটি ওঠা (হাইপারকেরাটোসিস) (গ) পা ফুলে যাওয়া (নন্‌পিটিং ইডেমা), (ঘ) প্রান্তীয় স্নায়ুরোগ (পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি), (ঙ) কিডনি ও লিভারের জটিলতা (কার্যক্ষমতা লোপ পাওয়া)। তৃতীয় পর্যায়ে (ক) দেহের প্রান্তদেশীয় অংশের পচন (গ্যাংগ্রিন), (খ) ত্বক, মুত্রথলি ও ফুসফুকের ক্যান্সার ইত্যাদি।

আক্রান্ত ব্যক্তির চুল ও নখ পরীক্ষার মাধ্যমে আর্সেনিকের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। কারণ শরীরস্থ আর্সেনিকের একটা বড় অংশ চুল ও নখে এসে জমা হতে থাকে। তবে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার সাথে সাথেই এর উপসর্গ ধরা পড়বে না। এর উপসর্গগুলো প্রকাশ হতে কখনও বা কারো কারো ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ বছর সময় লাগতে পারে।

আর্সেনিকোসিস নামের এই ভয়াবহ রোগটি সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কিছুটা ধারণা থাকলেও বিস্তরভাবে তা জনগোষ্ঠীকে আক্রান্ত করতে পারে— এমন ধারণা কিছু দিন আগেও কারো ছিল না। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকদূষণ ইতিপূর্বে বিশ্বের কয়েকটি দেশে দেখা দিয়েছিল। যেমন- তাইওয়ান, আর্জেন্টিনা, আলাস্কা, চিলি, মেক্সিকো, ঘানা, হাঙ্গেরীতে। তবে তা আশঙ্কাজনক ব্যাপক আকারে নয়।

ইদানীং বাংলাদেশে আর্সেনিক এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেও জনসাধারণের মধ্যে এ ব্যাপারে তেমন সচেতনতা বিশেষ লক্ষণীয় নয়। শিক্ষার অনগ্রসরতাই এর অন্যতম প্রধান কারণ। এছাড়া সামাজিক কারণে, লোকলজ্জার ভয়েও অনেকে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে মহিলারা অতি গুরুত্ব বিষয়টি যথাসম্ভব চেপে রাখে। দেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্সেনিকআক্রান্ত মেয়েদের পর্দার আড়ালে রাখা হয়। ছোঁয়াচে না হলেও আর্সেনিকআক্রান্ত রোগীর পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনও অনেক ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে পড়ছে। আর্সেনিকের এই বহুমুখী সমস্যাটি নিয়ে দেশের শিক্ষিত সচেতন মানুষ, সমাজবিজ্ঞানী স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা খুবই উদ্বিগ্ন।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে সর্বপ্রথম আর্সেনিকের দূষণ ধরা পড়ে প্রকৃতপক্ষে আজ থেকে ১৮ বছর আগে এদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে। তারপর থেকে দেশের প্রায় ৮ কোটি মানুষ আর্সেনিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে। দেশের প্রায় ১৫টি জেলায় অতি মাত্রায় ও ১৫টি জেলার স্বল্পমাত্রায় আর্সেনিকের প্রভাব রয়েছে। আর বিশেষ খবর এই এ সকল চিহ্নিত এলাকা থেকে এ পর্যন্ত ১০ সহস্রাধিক আর্সেনিক রোগী সনাক্ত করা হয়েছে।

আর্সেনিকবিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী বিষক্রিয়া মারাত্মক হবার অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রায় ৮২ লাখ হেক্টর আবাদযোগ্য জমির প্রায় ৪০ শতাংশই সেচ ব্যবস্থার অধীন। সেচের কাজে ব্যবহার করা হয় ৭০ শতাংশ ভূগর্ভস্থ ও ৩০ শতাংশ ভূপৃষ্ঠের পানি। ভূগর্ভস্থ পানিতে সেচ কাজের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে খাবার পানি ও গৃহস্থালীর কাজে দেশে প্রায় ২৫ লক্ষ টিউবয়েল ও ৫ লক্ষাধিক বিভিন্ন ধরনের গভীর-অগভীর নলকূপে পানি উত্তোলন করা হয়। সর্বনাশা ফারাক্কার কারণে শুষ্ক মৌসুমে আবাদী জমির সেচ ব্যবস্থা নির্ভর করে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ভূগর্ভস্থ পানি এই অতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে এর আর্সেনোপাইরাইট খনিজ পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বিষক্রিয়া ঘটাচ্ছে। এ কারণে বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীরা আর্সেনিক বিষক্রিয়া প্রতিশোধনের পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার, বণ্টন, সংরক্ষণ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত নীতি প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে সরকার এ ব্যাপারে কার্যকর তেমন কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। যার ফলে দেশজুড়ে আর্সেনিকের ব্যাপকতা বেড়েই চলেছে। আর্সেনিকআক্রান্ত রোগী এবং মৃত্যুর সংখ্যাও সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে যথাসময়ে পাওয়া যাচ্ছে না। নিঃশব্দ ঘাতক এই আর্সেনিক নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে অনেক দিন থেকেই অথচ এর প্রতিরোধ ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ রয়েছে কেবল দায়সারা গোছের পানি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সাড়ম্বর জরিপ কর্মসূচির মধ্যে।

সরকার করার মধ্যে করেছে ভিটামিন এ. ই. সি. ট্যাবলেট, ক্লোট্রিমাজল ক্রিম ও আর্সেনিকমুক্তকরণ কেমিক্যাল ও প্রচারপত্র বিতরণ ও গণমাধ্যমে অবহিতকরণ। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীকে ট্রেনিংও দিয়েছে সরকার এই কাজে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে আর্সেনিকের ব্যাপকতা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত বেশি। বৃহত্তর রাজশাহী, ফরিদপুর, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিদেশী সংস্থার বিশেষ প্রতিনিধি দল এসব আর্সেনিক-উপদ্রুত এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনও করেছেন। সঙ্গে ছিলেন দেশের উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ব্যক্তি। তাদের সমন্বিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দেশের কটি অঞ্চলে আর্সেনিক রিম্যুভার মুভম্যান্ট প্লান্ট স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে না। নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় মেহেরপুরে ১৮-শহর বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্পটির অবস্থা এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

বাংলাদেশের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করার জন্য 'আর্সেনেটর' নামে নতুন উদ্ভাবিত একটি যন্ত্র ব্যবহারের কথা বলেছে UNICEF. অস্ট্রিয়ার রসায়নবিদ ড. কসমাস এই যন্ত্রটির উদ্ভাবক। প্রায় ৩ হাজার ডলার মূল্যের এই যন্ত্রটির সাহায্যে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা নির্ভুলভাবে পরিমাণ করা সম্ভব বলে জানানো হয়। ব্যাটারী-চালিত এই যন্ত্রের সাহায্যে ০.৫ পিপিবি (পার্টস পার বিলিয়ন) পর্যন্ত আর্সেনিক পরিমাপ করা যায়। তবে দেশের মোট কত শতাংশ নলকূপ থেকে আর্সেনিক নির্গত হয়, তার যথার্থ পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতি যে ভয়াবহ এবং বিপজ্জনক সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষজ্ঞদের অভিমত এবং সাম্প্রতিক জাপানভিত্তিক এশিয়া নেটওয়ার্ক-এর জরিপ এবং বৃটিশ দাতা সংস্থা অক্সফার্মের রিপোর্টে এমন আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে ভয়াবহ আর্সেনিক দূষণ ঘটনাটি স্বভাবতই আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোকেও আকৃষ্ট করেছে। বিভিন্ন টি. ভি স্যাটেলাইট চ্যানেল ছাড়াও ওভারসীজ প্রিন্ট মিডিয়ায় এ নিয়ে অনেক প্রচার ও লেখালেখি হয়েছে ও হচ্ছে। নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় এ নিয়ে '৯৮ সালে একটি বিশেষ রির্পোট প্রকাশ পেয়েছে। যাতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্সেনিক দূষণের ভয়াবহ পরিস্থিতি বিস্তারিত ও বিশ্লেষণাত্মকভাবে ফুটে উঠেছে। (Barry Bearak লিখিত (Death by Arsenic : Natural poison in water spreads disaster in Bangladesh শীর্ষক এই রিপোর্টে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আর্সেনিক দূষণকে ইতিহাসের সবচে' বড় 'গণ বিষক্রিয়া' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মন্তব্য করা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত উদ্ধৃত করে।

সাংবাদিক Barry Bearak বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্সেনিক-উপদ্রুত অঞ্চলে সরেজমিন সফর শেষে এই রিপোর্টটি তৈরি করেছেন। প্রত্যন্ত এলাকা পরিদর্শনকালে তিনি অসংখ্য আর্সেনিকআক্রান্ত মানুষের সাথে কথা বলেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের বিশেষ ফোস্কা পড়া এবং ঘা ও কালো দাগ-সম্বলিত হাত-পা, যা তার কাছে একটি ভয়াবহ ও মর্মন্তুদ দৃশ্য বলে মনে হয়েছে। খাবার পানিতে আর্সেনিক দূষণে সর্বোচ্চ ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে – বলেছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিডিমিউলজিস্ট (ত্বক বিশেষজ্ঞ) ড. এ্যাল্যান এইচ স্মিথ – যিনি ১৯৯৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য বাংলাদেশের ওপর তিনটি গবেষণা তৈরি করেছেন। বিশ্ব ব্যাংকের হাইড্রোলজিস্ট বাবর এন কবির এক সমীক্ষায় দেখেছেন যে, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৪৯টিতে ২৫ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় গুরুতর আক্রান্ত। এটা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হতো তাহলে সেখানে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেকের জন্য বোতলজাত পানি সরবরাহ করা হতো। বাংলাদেশ অত্যন্ত গরীব দেখে বাংলাদেশের সে সামর্থ্য নেই।

এদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র-সীমার নিচে বাস করে এবং এখানকার ৯০ শতাংশ মানুষ কৃষক, ৬০ শতাংশেরও বেশি মানুষ অশিক্ষিত এবং সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার চিত্রও অত্যন্ত করুণ! বাংলাদেশের পল্লী এলাকায় চিকিৎসা কাজে নিয়োজিত ডাঃ কাজী কামরুজ্জামান এবং মাহ্মুদুর রহমানও জানালেন সে কথা। তারা দেখেছেন যে, কেবল শারীরিক সমস্যাই নয় নানাবিধ পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়ও দেখা দিয়েছে আর্সেনিকের কারণে। আর্সেনিকআক্রান্ত লোকজন একঘরে হয়ে যাচ্ছে। অনেক দম্পতি হয়ে যাচ্ছে বিচ্ছিন্ন। কুমারীদের হচ্ছে না বিয়ে। একটা বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া এসেছে কাজী মতিন আহমেদ নামে একজন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে – যিনি বৃটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভের পক্ষে গবেষণা কর্ম করছেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নলকূপের পানিকে দূষণমুক্ত করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন তিনি। কেননা, প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর্সেনিকআক্রান্তরা অভিযোগ করে যে, ঢাকা থেকে অনেকেই আসে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরে আর কোনও খবর রাখে না। সরকারি মহলও না, এনজিও রাও না। অথচ বর্তমানে দেশে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, নিপসম, এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক, ঢাকা কমিউনিটি এবং বেশ কটি বেসরকারি সংস্থা এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রমী ও কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছিল ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল। এর মধ্যে একটি হচ্ছে নিয়মতি ভিটামিন 'এ' ও 'সি' সেবন। এ দুটি ভিটামিনের অভাব হলে আর্সেনিকআক্রান্তদের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে যে, কেবল গ্রামাঞ্চল বা প্রত্যন্ত এলাকার লোকজনই এই আর্সেনিকের শিকার নয় নগর এলাকায় বসবাসকারী অভিজাত ব্যক্তিরাও আর্সেনিকের আক্রমণের বাইরে নয়, সম্প্রতি মালয়েশিয়ার সাবেক উপপ্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীম-এর শরীরেও আর্সেনিকের দূষণ পাওয়া গেছে।

সম্পূর্ণ দেশজ প্রযুক্তিতে নামমাত্র খরচে আর্সেনিক দূষিত পানিকে বিশুদ্ধ করার একটি পদ্ধতি অতি সম্প্রতি বাংলাদেশে উদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছেন বেসরকারি গংগঠন এলাজিং অ্যাজমা এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ এনড্স্কিন কেয়ার ইনস্টিটিউট-এর প্রেসিডেন্ট ডাঃ এম. এ. হাসান। এতে পানি আর্সেনিক দূষণমুক্ত করতে দরকার শুধু ধানের তুষ বা নারকেলের মালা (খোল) কিংবা ছোবড়া পোড়ানো ছাই। এ পদ্ধতি অনুযায়ী নারিকেলের ছোবড়া, মালা বা ধানের তুষের যে কোনও একটি পুড়িয়ে ছাই করতে হবে। এই ছাই চালনিতে ঢেলে সংরক্ষণ করতে হবে শুকনো পাত্রে। একমুঠো ছাইয়ের মধ্যে আধমুঠো পরিমাণ ফিটকিরি আর্সেনিকযুক্ত ৪লিটার পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে ১২ ঘন্টা রেখে দিলেই পানির আর্সেনিক আলাদা হয়ে যাবে। তবে ১২ ঘন্টা না রেখে এরচেয়ে অল্প সময় আর্সেনিক বিযুক্ত করার একটি প্রক্রিয়াও ডাঃ হাসান উদ্ভাবন করেছেন। ছাই ও ফিটকিরিমিশ্রিত পানি ১০ মিনিট ফুটিয়ে ফিল্টারে ছেকে নিলেও পানি আর্সেনিকমুক্ত হবে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী পানি ফিল্টার করার জন্য ৩টি পাত্র দরকার হবে। প্রথম পাত্রের তলায় পরিষ্কার কাপড়, মাপের ও দু'ইঞ্চি পুরো করে বালি দিয়ে ফিল্টার তৈরি করতে হবে। দ্বিতীয় পাত্রে ফিল্টার বানাতে হবে কাপড়ের ওপর ৩ইঞ্চি পুরো করে বালি দিয়ে। এ দুটি পাত্রের তলাতেই ছিদ্র থাকবে– যাতে পানি নিচে নামতে পারে। সবচেয়ে নিচে থাকবে বিশুদ্ধ পানি ধারণ করার পাত্র। প্রথম পাত্রে ছাই ও ফিটকিরি দিয়ে ফোটানো বা থিতানো পানি ঢাললে ধীরে ধীরে তা সংক্রমণমুক্ত হয়ে তৃতীয় পাত্রে জমা হবে।

এদিকে ডাঃ হাসান ১৯৯৯ সনের ২৩ শে সেপ্টেম্বর ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে তার এই প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করার এক পর্যায়ে এই কার্যক্রমে সরকারি সহায়তা না পাওয়ার সমালোচনা করে বলেন– বিদেশী প্রতিষ্ঠান এমনকি জাতিসংঘ পর্যন্ত পরামর্শ চাইলে এগিয়ে আসে। আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে সরকারকে আন্তরিক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি বলেন– তার উদ্ভাবিত এই পদ্ধতির সাফল্য পরীক্ষাগারের বাইরেও সুন্দর প্রমাণিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় সহায়তা পেলে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখাবেন। এই প্রযুক্তিকে অভূতপূর্ব আখ্যা দিয়ে তিনি আরো জানান যে, তার এই প্রক্রিয়ায় কেবল

আর্সেনিকই নয়, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, সায়ানইড, আয়রনসহ পানিতে বিদ্যমান সব ধরনের ধাতব দূষণই দূর হয়।

এদিকে ভূগর্ভস্থ পানিকে আর্সেনিকমুক্ত করার ক্ষেত্রে শতভাগ সাফল্য অর্জনের দাবি করেছে সিডকো লিমিটেড নামে একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। জার্মান হারবাউয়ার প্রতিষ্ঠানের কারিগরি সহায়তায় দেশীয় সংস্থাটি ১৯৯৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর যশোরের জাফর নগরে আর্সেনিক দূরীকরণ প্লান্ট স্থাপন করেও এ সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে।

আমরা আশায় বুক বেঁধে আছি। কারণ মানুষ আশার ওপরই বেঁচে থাকে। সরকারের সাদিচ্ছা, সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আর্সেনিক সমস্যার সঠিক সমাধান হবে, জলজ বিভীষিকা থেকে রেহাই পাবে এদেশের আতঙ্কিত জনপদ।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Natural Institute of Preventive and Social Medicine. (NIPSOM)

অগ্রপথিক। মে ২০০০

আয়োডিন ঘাটতি ঃ সমস্যা ও প্রতিকার

দলিল উদ্দিন আহমদ

আয়োডিন মূলত একটি রাসায়নিক উপাদান। শরীরে থাইরয়েড হরমোন তৈরির জন্য এর আবশ্যক হয়। গলার সামনের দিকে অবস্থিত থাইরয়েড গ্লাণ্ডের মাধ্যমে এই থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়। থাইরয়েড হরমোন রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে চলাচল করে। মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ ও সক্রিয় রাখা এবং শরীরের তাপ সংরক্ষণে আয়োডিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মানবদেহে যখন প্রয়োজনীয় আয়োডিন থাকে না, তখন দেহ চাহিদামাফিক থাইরয়েড হরমোন তৈরি করতে অসমর্থ হয়। ফলে দেহ আয়োডিনের অভাবজনিত নানা রকম রোগের কবলে পড়ে।

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ আয়োডিনের অভাবে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতায় ভুগছে। আয়োডিন ঘাটতির অন্যতম প্রধান লক্ষণ হলো গলগণ্ড। গলগণ্ড রোগটি এ দেশের মানুষের কাছে ঘ্যাগ নামে বহুল পরিচিত। সাম্প্রতিক এ জরিপ থেকে জানা যায়, দেশে পাঁচ লাখেরও বেশি লোক গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগে আক্রান্ত। গলগণ্ড বা ঘ্যাগ হলে থাইরয়েড গ্লাণ্ডটি স্বাভাবিক আকারের চেয়েও অনেক বড় হয়ে যায়। আগেই উল্লেখ করেছি আয়োডিনের ঘাটতি থাকলে শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হতে পারে না। থাইরয়েড হরমোনের এই অভাব পূরণের জন্য থাইরয়েড গ্লাণ্ডকে অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। ফলে এই গ্লাণ্ডটি ক্রমান্বয়ে আকারে বড়ো হয়ে যায়।

গলগণ্ড ছাড়াও আয়োডিনের অভাবে এ দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের শিকার হচ্ছে। প্রয়োজনীয় আয়োডিনের অভাবে শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শিশু বিকলাঙ্গ ও মানসিক জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর অভাবে মহিলাদের গর্ভপাত হয়ে থাকে। গর্ভবতী মায়ের শরীরে আয়োডিনের অভাব থাকলে তার গর্ভস্থ সন্তানও আয়োডিনের অভাবজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হবে। আয়োডিন ঘাটতিজনিত মানসিক প্রতিবন্ধকতা অনেক জটিল আকার ধারণ করে। একটি শিশু দেখতে সুস্থ হলেও লেখাপাড়া বা কাজকর্মে মনঃসংযোগ করতে পারে না। পারিণামে তাকে দুঃসহ

ব্যর্থতা ও গ্লানিময় জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। আয়োডিনের অভাবজনিত কারণেই এ রকম হয়ে থাকে। একজন মারাত্মক আয়োডিন সংকটগ্রস্ত গর্ভবতী মা হাবাগোবা বোবা-কালা এবং বামন সন্তানের জন্ম দেন। এই প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের আজীবন যন্ত্রণাবিদ্ধ কাল কাটাতে হয়। সমাজে আবর্জনা ও উচ্ছিষ্টের মতো বেঁচে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনও গত্যন্তর থাকে না। আয়োডিনের অভাবগ্রস্ত শিশুরা নিদারুণ অপুষ্টিতে ভোগে এবং তাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কম থাকে।

আয়োডিন ঘাটতিজনিত ভয়াবহ আরেকটি রোগের নাম হাইপোথায়রডিজম। দেহে থাইরয়েড হরমোনের অভাব হলেই এ রোগটি দেখা দেয়। ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পারা, নিদ্রাহীনতা, আলসেমী, চামড়া শুকিয়ে যাওয়া এ রোগের বিশেষ লক্ষণ। অল্পবয়সী শিশুরা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্রমশ মানসিক প্রতিবন্ধীতে পরিণত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক জরিপ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের শতকরা সত্তর জন মানুষের দেহে আয়োডিনের অভাব রয়েছে এবং এ ধরনের লোকের সংখ্যা প্রায় ৮কোটি। এক কোটি মানুষ দৃশ্যমান ও চার কোটি মানুষ অদৃশ্যমান গলগণ্ড বা ঘ্যাগের শিকার। উপরন্তু পাঁচ লক্ষ লোক মারাত্মকভাবে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হিসাবে সমাজের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে আছে। এ ছাড়া আয়োডিনের অভাবে গর্ভাবস্থায় শিশু মৃত্যুর হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বামনত্ব, বধিরত্ব, টেরা চোখ ইত্যাদি সমস্যা দিন দিন প্রলম্বিত হচ্ছে; শিশুদের চিন্তাশক্তি ও মেধার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে পারছে না।

বাংলাদেশের সর্বত্রই খাদ্যে আয়োডিনের কমবেশি ঘাটতি রয়েছে। তাই আমরা মোটেই বিপদমুক্ত নই বরং বড়ো রকমের ঝুঁকির সম্মুখীন। আয়োডিন প্রাকৃতিকভাবে মাটি ও পানিতে পাওয়া যায়। যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদ এই মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে, তাদের মাধ্যমেও আয়োডিন পাওয়া যেতে পারে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রচুর বৃষ্টিপাত ও ঘন ঘন বন্যার ফলে মাটি হতে এই আয়োডিন ধুয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে আয়েডিনের এই অনাকাঙ্ক্ষিত সংকট দেখা দিয়েছে।

আয়োডিন ঘাটতিজনিত সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের খাদ্যে অবশ্যই বাড়তি আয়োডিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। আর তা সম্ভব হবে প্রতিদিনের খাবারে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের মাধ্যমে।

এ ছাড়া সামুদ্রিক মাছেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন। বাজারে সারা বছরই কমবেশি সামুদ্রিক মাছ দেখা যায়। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে বাজারে সামুদ্রিক মাছের সরবারাহ আরও বাড়ানো সম্ভব। আমাদের প্রাত্যহিক আয়োডিনঘাটতি পূরণে সামুদ্রিক মাছ হতে পারে অনিবার্য সহায়ক।

আয়োডিনের অভাবজানিত কারণে আমাদের জনগণের এক বিরাট অংশ শারীরিক ও মানসিকভাবে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচিতে অবদান রাখতে পারছে না।

আমরা যদি আমাদের নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় আয়োডিনযুক্ত লবণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সামুদ্রিক মাছকে ও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, তবে এদেশের বিপুল জনশক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের সন্ধান পাবে, দেশের মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে মেধা ও চিন্তাশক্তির স্ফুরণ হবে। জাতীয় অর্থনীতিতে আমরা রাখতে পারবো গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর।

অগ্রপথিক। নভেম্বর ১৯৯৭

স্যানিটেশনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আ.ন.ম. আবদুর রাজ্জাক

স্যানিটেশন বলতে কি বোঝায়

সুস্থ, সুন্দর ও রোগমুক্ত থাকার জন্য যে স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস অনুশীলন করতে হয় তাই স্যানিটেশন। আমাদের সামাজিক জীবনে স্যানিটেশনের যে কত গুরুত্ব রয়েছে তা বিস্তারিত আলোচনা না করলে বোঝা কঠিন। মূলত সৃষ্ট স্যানিটেশন ব্যবস্থা আমাদের অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত রোগ বালাই থেকে মুক্ত রাখতে পারে, কায়েম হতে পারে একটি সুস্থ সুন্দর ও রোগমুক্ত সামাজিক ব্যবস্থা। আসুন এ বিষয়ে একটু ধারণা নেয়ার চেষ্টা করি।

যেমন ঃ

ক. সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার।

খ. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার।

গ. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা।

ঘ. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

ক. সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার ঃ মানব দেহের ৬৫% পানি, পানির অপর নাম জীবন। এখন কিন্তু তা মরণ হিসেবেও দেখা যায়। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ খাবার পানি হিসাবে নিরাপদ পানির ব্যবহার করলেও অজু, গোসল, থালা-বাসন, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ডোবা, খাল-বিল ও পুকুরের ময়লা পানি ব্যবহার করে থাকে। দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে পানি ও মলবাহিত রোগ ছড়ায়। প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক পুকুরের পানি কিভাবে দূষিত হয়। অনেকেই যত্রতত্র মল ত্যাগ করে, পুকুরের পাড়ে খোলা বা ঝুলন্ত পায়খানা, বাড়ির উঠানে বাচ্চাদের মলত্যাগ ইত্যাদি বৃষ্টিতে বা বাতাসের সাথে পুকুরের পানিতে মেশে, তাছাড়া পুকুরে গরু-ছাগল গোসল করান, কাপড় কাচা ইত্যাদি করার ফলে পানি দূষিত হয়। এক জরিপে দেখা গেছে বাংলাদেশের ৬৫% মানুষ খোলা আকাশের নিচে যত্রতত্র মল ত্যাগ করে। হিসেব অনুযায়ী দৈনিক ২০-২৫ হাজার মেট্রিক টন মল খোলা আকাশের নিচে ত্যাগ করে থাকে সেই মল যায় কোথায় ? ঐ একই জরিপে

দেখা গেছে বাংলাদেশের মানুষ জনপ্রতি প্রতিদিন ৫-১০ গ্রাম পায়খানা বিভিন্ন উপায়ে তথা পানি ও খাবারের মাধ্যমে খেয়ে থাকে। নিরাপদ পানি ব্যবহার না করায় পানি ও মলবাহিত বিভিন্ন রোগ ছড়ায় কেবল খাবার নয় রান্না বান্নাসহ গৃহস্থালীর সকল কাজে নিরাপদ পানির ব্যবহার করলে আমরা ৮০% ভাগ পানিবাহিত রোগ প্রতিরোধ করতে পারি। নিরাপদ পানি অর্থ হলো – রোগ জীবাণুমুক্ত পানি। তা-ই ব্যবহার করা দরকার।

নিরাপদ পানি পাবো কোথায়

- ০ নলকূপের পানি।
- ০ ফুটানো পানি।
- ০ পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি দিয়ে বিশুদ্ধ করে।
- ০ ফিটকারী দিয়ে বিশুদ্ধ করে।

মনে রাখতে হবে সকল নলকূপের পানিই নিরাপদ নয়। এ ক্ষেত্রে নলকূপ থেকে পায়খানার দূরত্ব কমপক্ষে ৩০ ফুট হতে হবে, নলকূপের গোড়া পাকা থাকা এবং নলকূপের ভিতরে যেন পুকুরের পানি না ঢুকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। ফুটানো পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০ মিনিট ধরে পানি ফুটাতে হবে, তা না হলে সব ধরনের জীবাণুমুক্ত হবে না। বন্যাকবলিত এলাকায় পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি দিয়েই বিশুদ্ধ করতে হয়।

খ. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ঃ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বলতে বুঝি

১. যে পায়খানার মল দেখা যাবে না।
২. যার মধ্যে মশা, মাছি কটিপতংগ ঢুকতে পারবে না।
৩. যে পায়খানা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াবে না।
৪. যে পায়খানা কোন পানির উৎসকে দূষিত করবে না।
৫. যে পায়খানা পরিবেশ দূষিত করবে না।
৬. যে পায়খানা পরিবেশ, মাটি/ভূমি দূষিত করবে না।

গ. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ঃ নিজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। নখ ছোট রাখা, নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার করা। খাওয়ার আগে এবং পায়খানার পরে হাত সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে ধোয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে কেবল নিজে স্বাস্থ্য পরিচর্যা করলেই হবে না, পরিবারের সবাইকেই স্বাস্থ্যসচেতন করে তুলতে হবে।

ঘ. পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা ঃ কোনভাবেই যেন পরিবেশ দূষিত না হতে পারে সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে নিজে সচেতন থাকতে হবে, সমাজকে সচেতন করতে হবে। নিজে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করলেই হবে না, প্রতিবেশীকেও এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। তা না হলে প্রতিবেশীর খোলা পায়খানা থেকে রোগ জীবাণু এসে আপনাকে আক্রান্ত করে তুলতে পারে।

সুষ্ঠু স্যানিটেশনের অভাবে সাধারণত যেসব রোগ হয়

১. ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়, যকৃতের প্রদাহ সহ বিভিন্ন প্রকার পেটের পীড়া ও পলিও রোগ।

২. টাইফয়েড, প্যারা টাইফয়েড।

৩. জনডিস।

৪. খুজলী, পাঁচড়া, চুলকানীসহ বিভিন্ন চর্মরোগ।

৫. কৃমিরোগ। (বিভিন্ন প্রকার কৃমি)

যেখানে-সেখানে মল ত্যাগ করলে কি হয়

১. বাতাস দূষিত হয়, ফলে বায়ূবাহিত রোগ হয়।

২. পানি দূষিত হয়, এর দ্বারা পানিবাহিত রোগ হয়।

৩. মাটি দূষিত হওয়ার ফলে মাটিবাহিত রোগ হয়।

৪. খাদ্য দূষিত হয়ে খাদ্যবাহিত রোগ হয়।

৫. মাছির জন্ম হয় এবং মাছিবাহিত রোগ হয়।

৬. দুর্গন্ধ ছড়ায় ও পরিবেশ নষ্ট করে।

৭. রোগ জীবাণু ছড়ায়।

স্যানিটারী ল্যাট্রিন পাবো কোথায়

সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন এবং জলাবদ্ধ পায়খানার কোন বিকল্প নেই। এ ব্যবস্থা করার জন্য খুব দূরে যেতে হবে না, খুব টাকা-পায়সাও ব্যয় করতে হয় না, কেবল ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী নিম্নের যে পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. শক্ত মাটিতে গর্ত করে তার উপর বাঁশ দিয়ে ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা করা যায়।

২. মটকা বা এ জাতীয় কোন কিছু দ্বারা ৩. রিং স্লাভ দেয়া ল্যাট্রিন যা থানা পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক বাজারজাত করা হয়। ৪. পাকা ল্যাট্রিন তৈরি করে।

সুষ্ঠু স্যানিটেশনের অভাবে কি কি প্রভাব পড়তে পারে

- অসুখ বাড়ায়।
- মৃত্যু বাড়ায়।
- আয়ু কমায়।
- অর্থনৈতিক অবনতি হয়।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত করে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- শ্রমশক্তি কমে যায়।
- সামাজিক বিপর্যয় ঘটতে পারে।

নিম্নমানের স্যানিটেশন ও পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের উপর কিরূপ প্রভাব ফেলে

০ রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মৃত্যুহার বাড়ায়।

০ রোগ বিস্তার লাভ করে।

০ পরিবেশ দূষিত হয়।

০ পানি দূষিত হয়।

০ পানি ও মলবাহিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

০ মহামারী দেখা দেয়।

০ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়।

০ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

০ প্রতি বৎসর ডায়রিয়ার মারা যায় (০-৫ বৎসরের) প্রায় দেড় লক্ষ শিশু।

০ প্রতি বৎসর ৩ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু কৃমি রোগে আক্রান্ত হয়।

০ কৃমি রোগ প্রতি দিন ১৪ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার খাবার নষ্ট করে।

০ প্রতি বৎসর কৃমি ও ডায়রিয়া রোগের প্রতিরোধের জন্য প্রায় ৭৯০৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

এ সব প্রতিরোধের উপায়

০ রোগের বিস্তার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা।

০ সুষ্ঠু স্যানিটেশন ব্যবস্থা জোরদার করা।

০ সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।

০ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানায় মল ত্যাগ করা।

০ মলত্যাগের পর সাবান বা ছাই দিয়ে ভাল করে হাত ধোয়া।

০ খাওয়ার আগে সব সময় সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ।

০ নখ ছোট রাখা।

০ রান্নার আগে শাক-সবজি ভালভাবে ধুয়ে নেয়া।

০ কাঁচা ফল-মূল ধুয়ে খাওয়া।

০ খাবার ঢেকে রাখা। মশা, মাছিপড়া খাবার না খাওয়া। হোটেলের রান্নাঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখা।

০ কেবল নিজে এ সকল বিধিবিধান মানলে চলবে না, প্রতিবেশীকেও এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে, তাহলেই পানি ও মলবাহিত রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যাবে।

স্যানিটেশন কার্যক্রমে ইমামদের ভূমিকা

কেবল স্যানিটেশন নয় সামাজিক সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ইমামগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। সমাজে নেতা হিসাবে ইমামের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। তিনি যা বলেন তাঁর মুসল্লীগণ তা করতে সচেষ্ট হন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে

জনগণকে কোনও কথা জানাতে সরকারের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং সময়ও লাগে অনেক। তাতেও সকল জনগণকে জানানো সম্ভব হয় না, কেননা এ দেশের মানুষ দরিদ্র এবং অশিক্ষিত, অথচ এই সংবাদ ইমামগণের মাধ্যমে অতি স্বল্প সময়ে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠিকে অবহিত করা সহজ। কারণ ইমাদের রয়েছে ফ্রি প্লাটফর্ম, যেখানে প্রতি শুক্রবার তাঁরা কথা বলে থাকেন। খুৎবার পূর্বে ইমাম সাহেবগণ এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারেন। তাহলে ব্যক্তি সমাজ ও জাতি উপকৃত হবে, আমাদের মসজিদগুলো আবার মসজিদে নববীর মত কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে, যার ফলে মসজিদকেন্দ্রিক সমাজ গঠিত হবে, ইমামদের মর্যাদা তথা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমরা আশা করি "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ' মহানবী (সা) -এর এ বাণী সকলের ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার জন্য সম্মানিত ইমামগণ সচেষ্ট হবেন তা হলেই স্যানিটেশন কার্যক্রম জোরদার হবে। ঈমানের অঙ্গ 'পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা' আর স্যানিটেশন একই সূত্রে গ্রথিত দু'টি শাখা। এ বিষয়ে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে সচেতনতা জাগ্রত হোক, দেশের সকল খোলা পায়খানায় এবং যত্রতত্র মল ত্যাগ বন্ধ হোক, বিদেশীরা যেন আর বলতে না পারে, "বাংলাদেশটাই কোটি খোলা পায়খানা"।

অগ্রপথিক। জুন ১৯৯৭

স্বাস্থ্য সংরক্ষণে প্রিয়নবী (সা)-এর নির্দেশনা

মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ শরীয়তপুরী

প্রিয়নবী (সা) মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় ও প্রতিটি ক্ষেত্রের উপর মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা নিয়েই ধরায় আগমন করেছিলেন। আর তাই তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ণতা ও দক্ষতার স্বাক্ষরও রেখে গেছেন। রাসূলে পাক (সা)-এর দেয়া দিকনির্দেশনা যেমন পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টি তেমনি ইহকালীন বিষয়াবলীতেও তাঁর (সা) দেয়া নীতিমালাই একমাত্র শান্তি ও স্থিতিশীলতার নিশ্চয়তা।

একজন আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক, একজন আদর্শ সমাজ সংস্কারক, একজন আদর্শ সমরবিদ, একজন আদর্শ আইনবিদ হওয়ার পাশাপাশি প্রিয়নবী (সা) ছিলেন একজন আদর্শ স্বাস্থ্যবিদ। সুস্বাস্থ্য গঠন ও তা সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রিয়নবী (সা)-এর দেয়া স্বাস্থ্য-নীতিই মানব দেহ ও মানব স্বাস্থ্যের যথার্থ গঠন, সংরক্ষণ ও তার অগ্রগতি সাধন করতে পারে।

এ যাবৎ স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীরা যেসব স্বাস্থ্যবিধি প্রণয়ন করেছেন তার কোনটাই প্রিয়নবী (সা)-এর দেয়া স্বাস্থ্যবিধানের সাথে বিরোধপূর্ণ নয় বরং তারই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এরপরও বিরোধপূর্ণ কিছু থেকে থাকলে আমরা বলবো তা যথার্থ স্বাস্থ্যনীতি নয় বরং তাতে ভ্রান্তি ও গলদ রয়েছে।

মানবদেহ সৃষ্টির উপাদানসমূহের মধ্যে প্রধানত যেসব উপাদানের আলোচনা করা যায় তা হলো পানি, মাটি, বায়ু এবং অগ্নি। এগুলোকে বিশ্লেষণ করলে এর প্রতিটির মাঝেই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের উপাদান পাওয়া যায়, যেমন পানির মধ্যে রয়েছে 'হাইড্রোজেন' ও 'অক্সিজেন'। হাইড্রোজেন কার্বন জাতীয় উপাদানের সাথে মিলে কার্বো হাইড্রেটের সৃষ্টি করে, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিঃশ্বাসের সাথে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকি, এ অক্সিজেন রক্তকে শোধন করে এবং বিশুদ্ধ রক্ত শরীরে প্রবাহিত করে মানবদেহের কার্যক্ষমতা এনে দেয়।

মানবদেহের চারটি উপাদানের মধ্যে মাটিই হচ্ছে সর্বপ্রধান। মাটি থেকেই মূলত এ মানব দেহের সৃষ্টি। এ ব্যাপারে প্রিয়নবী (সা)-এর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

'সমস্ত মানুষ আদম সন্তান, আর হযরত আদম (আ) মাটি থেকেই সৃষ্ট। (সগীর)

প্রিয়নবী (সা)-এর এ বাণী বর্তমান বিজ্ঞানীদের বক্তব্য দ্বারাও স্বীকৃত, যেমন বিজ্ঞানের গবেষণামতে মাটির মধ্যে যেসব উপাদান রয়েছে তা হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল, ফসফরাস প্রভৃতি। শরীর বিজ্ঞানীরা মানব দেহ বিশ্লেষণ করে যেসব উপাদন খুঁজে বের করেছেন তা অবিকল মাটিরই উপাদান। অর্থাৎ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল, ফসফরাস।

আজ থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে প্রিয়নবী (সা) মানব দেহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে তথ্য দিয়ে গেছেন, বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তা বাস্তব প্রমাণিত হওয়ায় বিজ্ঞানীদের অনেকে হয়েছেন বিস্মিত, আবার অনেকে হতভম্ব। বিস্ময়পূর্ণ এসব তথ্য প্রদানের কারণে দেহবিজ্ঞানীরা প্রিয়নবী (সা)-কে একজন সেরা স্বাস্থ্যবিদ ও শরীরবিজ্ঞানী রূপে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এটাই তো স্বাভাবিক, কারণ মানবদেহের স্রষ্টা মহান আল্লাহ। তাই স্রষ্টাই সৃষ্টির উপকরণ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। আর মহানবী (সা) হলেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত শ্রেষ্ঠ রাসূল যার নিকট মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, যিনি মি'রাজ রজনীতে মহান আল্লাহর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেছেন। সুতরাং মানব দেহ ও তার আনুসঙ্গিক যে কোনও ব্যাপারে মহানবী (সা)-এর দেয়া নীতিমালাই একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল নীতিমালা।

স্বাস্থ্য গঠন

স্বাস্থ্যকে সুস্থ সুঠাম করে গঠনের জন্য প্রিয়নবী (সা) যেসব নীতিমালা ও বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন তার মধ্যে একটি হলো অধিক ভোজন থেকে বিরত থাকা। অধিক ভোজন শুধু স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরই নয় বরং ডাক্তারী মতে অধিক ভোজনের কারণে অন্তত ৬/৭ ধরনের রোগ জন্ম নিয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সতর্ক করা হয়েছে এভাবে ঃ "তোমরা খাও এবং পান কর, তবে অপব্যয় (প্রয়োজনের অধিক প্রয়োগ) করো না (সূরা আরাফ ঃ ৩১)।

হাদীস শরীফের একটি বর্ণনা রাসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

'তোমরা অধিক ভোজন থেকে মহান আল্লাহর দরবারে পানাহ চাও (কামেল লি ইবনে আদী)।

হাদীসে অপর এক বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

"তোমরা উদর পূর্তি করে ভোজন করো না, কেননা তাতে তোমাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। (বুখারী)

অনুরূপভাবে বায়হাকীর এক বর্ণনায় অধিক ভোজন থেকে বারণ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ "অতিরিক্ত ভোজন দুর্ভাগ্যজনক। (বায়হাকী)

একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, দেহের ক্ষয় পূরণের জন্য ও তার উন্নতির জন্যই আমরা আহার করে থাকি। তবে এ আহার করারও একটি স্বাস্থ্যসম্মত নীতি রয়েছে। যে নীতিমালা লঙ্ঘিত হলে সে আহারই শরীরের ক্ষয় পূরণের পরিবর্তে তাতে বরং ঘাটতি এনে দেবে। শরীরে জন্ম নেবে নানা রোগের উপকরণ।

প্রিয়নবী (সা)-এর এ অমূল্য বাণী আধুনিক বিজ্ঞানীরাও যথার্থ বলে স্বীকার করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীদের বক্তব্য হচ্ছে, অধিক ভোজনের ফলে অগ্নিমান্দ্য, পেট ফাঁপা, বদ হজম, ডাইরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা বহু পূর্বে প্রদত্ত রাসূলে পাক (সা)-এর স্বাস্থ্যবিধির সাথে একাত্মতা প্রদর্শন করেছেন মাত্র। সুস্থতা রক্ষা ও সুস্থ স্বাস্থ্য গঠনে নবীজী (সা)-এর এ বিধান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা এখন আর বুঝতে কারো বাকি নেই।

স্বাস্থ্যকে সুঠাম ও সুস্থভাবে গঠন ও তার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 'পানি' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পানিকে জীবের প্রাণ (পানির অপর নাম জীবন) বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কেননা মানবদেহের শতকরা নব্বই ভাগই হচ্ছে পানি। পানি একটি অতি মূল্যবান খাদ্য উপাদান, যার মাধ্যমে খাদ্যবস্তু তরল এবং তাঁর পরিপাক ক্রিয়ার জন্য তা সহায়ক হয়। এ ছাড়া দূষিত দ্রব্য নির্গমন ও রক্ত প্রবাহের ক্ষেত্রেও পানি খুব গ্রহণযোগ্যভাবেই কার্যকর, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রিয়নবী (সা) পানি পান করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। সাথে সাথে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দান করতেও তিনি ভোলেননি।

হাদীস শরীফের একটি বর্ণনা বিবৃত হয়েছে, ঠাণ্ডা ও সুমিষ্ট পানি হযরত (সা)-এর কাছে ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় (তিরমিযী)।

মহানবী (সা) পানির বিশুদ্ধতা ও পানি ব্যবহারের ব্যাপারে যে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দান করছেন তা বর্তমান বিজ্ঞানীদেরকেও বিস্মিত করে দিয়েছে। হযরত (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 'যে পানির রঙ, গন্ধ ও স্বাদ তিনটিই বিকৃত হয়ে গেছে, সে পানি দ্বারা কোন কাজ করা বা করতে দেয়া উচিত নয় (আবু দাউদ)।

প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ব্যক্ত করা রাসূলে পাক (সা)-এর এ বাণীর সাথে একাত্মতা পোষণ করে দেহ বিজ্ঞানীরাও একই মত পোষণ করেছেন। তাঁরা বিশুদ্ধ পানির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে 'স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন এমন পানি যার মাঝে কোন ভাসমান জৈব অথবা অজৈব পদার্থ থাকে না এবং যাতে কোন রোগ-জীবাণু নেই এরূপ প্রকৃতির পানিকেই Hyginically Pure Water বা স্বাস্থ্যসম্মত বিশুদ্ধ পানি বলা হয়। (বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সা) পৃ. ২০৬)

যে পাত্রে পানি রাখা থাকে পানি পান করার সময় তার মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতেও নিষেধ করেছেন প্রিয়নবী (সা)। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"প্রিয়নবী (সা) পানির মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন (মুস্তাদরাকে হাকিম)।

স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রিয়নবী (সা)-এর বাণী একটি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা। এ ক্ষেত্রে বর্তমান বিজ্ঞানীরা তাঁদের দীর্ঘ গবেষণার ফসল হিসেবে যা বর্ণনা করেছেন তা প্রিয়নবী (সা)-এর উপরোক্ত বাণীর ব্যাখ্যামাত্র। পানি বিশেষজ্ঞ বা পানি বিজ্ঞানীদের মতে প্রাণীর নিঃশ্বাস ও ফুঁকের সাথে কার্বনডাই অক্সাইড বের হয় আর এ কার্বনডাই অক্সাইড যখন পানির সাথে গিয়ে মিশ্রিত হয় তখন তা থেকে কার্বলিক এসিড তৈরি হয়। আজ থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে নবীজীর (সা) এ জাতীয় রাসায়নিক তথ্যাদি আজকের রসায়নবিদদেরও যে হতভম্ব করে।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দুধ একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। অন্যান্য পানীয় দ্রব্যের চাইতে প্রিয়নবী (সা) দুধের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দুধ এমন এক স্বাস্থ্যকর পানীয় যার মাঝে শরীর ও স্বাস্থ্য গঠনের সব রকম উপাদান বিদ্যমান। দুধ পানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেন–

"তোমাদের মধ্য হতে কেউ যখন দুধ পান করবে তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং এর চেয়ে আরো বৃদ্ধি করে দাও। কারণ দুধ ছাড়া অন্য কিছুই আহার ও পানীয়ের ক্ষতি পূরণ করতে পারে না।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

হাদীস শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী (সা) বলেছেন ঃ

"উত্তম দান হলো একটি দুধের উটনী বা একটি দুধের বকরী যা সকালে এক পাত্র দুধ দেয় আবার সন্ধ্যায় আরেক পাত্র দুধ দেয়।" (বুখারী শরীফ)

প্রিয়নবী (সা)-এর উপরোক্ত বক্তব্যসমূহ থেকে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি উম্মতদের দুধ পানের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন এবং শরীর ও স্বাস্থ্যের জন্য দুধ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাও এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।

এবার আমরা দেখতে চাই দুধ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানী ও স্বাস্থ্যবিদদের বক্তব্য কি ? আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরা দুধ নিয়ে গবেষণা করে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নরূপ–

শরীর গঠনের জন্য যত প্রকার উপাদান প্রয়োজন তার সবটাই দুধের মধ্যে বিদ্যমান। এতে আমিষ (Protein), শর্করা (Sugar), স্নেহ জাতীয় পদার্থ (Fat), ভিটামিন (Vitamin), ধাতব লবণ (Mineral salts) ও পানি (Water) ইত্যাদি সহ আরো ছয় ধরনের উপাদান রয়েছে। এ কারণেই সুস্থ-অসুস্থ, যুবক-বৃদ্ধ-শিশু, সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রযোজ্য দুধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও ফসফরাস রয়েছে। এ কারণেই দুধের নাম দেয়া হয় আদর্শ খাদ্য। [বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সা) ১/২০৮]

বিজ্ঞানের এ গবেষণা মহান আল্লাহ ও প্রিয়নবী (সা)-এর দেয়া তথ্য অতিক্রম করে নতুন কিছু দিতে পারেনি বরং বলা যায় যে তাদের বক্তব্য কুরআন হাদীসের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করেছে মাত্র, পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে ঃ

"তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রাণীর মাঝে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, আমি তোমাদের পান করিয়ে থাকি তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মাঝে গোবর ও শোনিতের মধ্য হতে বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।" (সূরা নাহাল ঃ ৬৬)

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রিয়নবী (সা) আরো যেসব নির্দেশনা দান করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো তিনি মদ বা মাদক দ্রব্য সেবন করতে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। প্রিয়নবী (সা)-ইরশাদ করেন ঃ "মদ (মাদক দ্রব্য) হলো একত্রে অনেক গুনাহ বা অপরাধের সমন্বয় সাধনকারী।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

মদ বা মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে নবীজী (সা) আমাদের পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর যে বাণী শুনিয়েছেন তা হলো মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "(হে নবী!) লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য (সাময়িক ফুর্তি উপভোগের) কিছু ফায়দা রয়েছে, তবে এসবের পাপ ও ক্ষতি এর ফায়দা অপেক্ষা অনেক গুণ বড়।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৯)

উপরোক্ত বিধানের আলোকে প্রিয়নবী (সা) মদ পানকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আমরা দেখতে পাই, মদ্য পানকারী যে শুধু সমাজকেই কলুষিত করে তাই নয় বরং মদ পান মানবদেহের অপূরণীয় ক্ষতিও সাধন করে থাকে। এটি সাময়িকভাবে কিছু আনন্দ- ফুর্তি উপভোগের উপকরণ হলেও এর দ্বারা মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলো একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে মদ্যপানকারী তার দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, কুকর্মের নেশায় সে পাগল হয়ে যায়, মা, ভাই, বোন, বন্ধু-বান্ধবের কোনও ভেদাভেদ তার কাছে থাকে না, যার তার সর্বনাশ ঘটাতে সে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করে না। এ কারণেই প্রিয়নবী (সা) মদ্যপানকে অনেক প্রকার পাপ বা গুনাহের সমষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মানবদেহ সংরক্ষণে এবং সুস্থ-স্বাস্থ্য গঠনে পোশাক-নীতির অনুসরণের গুরুত্বও অপরিসীম। যাতে শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি, উষ্ণতা-আর্দ্রতা দেহের ক্ষতি সাধন করতে না পারে এ জন্য পরিমার্জিত ও যুগোপযোগী পোশাকের ব্যবহার প্রয়োজন।

আজ থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে প্রিয়নবী (সা) তদানীন্তন নগ্ন, অসভ্য ও বর্বর জাতিকে পোশাক-পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হওয়ার শিক্ষাদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত পোশাক-পরিধানের প্রতিও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। নবীজী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "টাখনুর যে অংশ পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত থাকবে তা জাহান্নামে যাবে।" (বুখারী শরীফ)

হাদীসের মর্ম হচ্ছে, পরিধেয় বস্ত্র টাখ্নুর উপরে রাখতে হবে। টাখ্নুর নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে বস্ত্র পরিধান করা হলে তা হারাম এবং তার পরিণতিতে পরিধানকারীকে পরকালে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

উপরোক্ত হাদীসে পায়ের টাখ্নুর নিচে কাপড় পরিধান করতে বারণ করা হয়েছে, কেননা পায়ের টাখ্নুর নিচে কাপড় ঝুলে থাকলে রাস্তার ধূলোবালি, ময়লা আবর্জনা, মল-মূত্র ইত্যাদি কাপড়ে লেগে যাওয়ার আশংকা থাকে। আর এসব ময়লা-আবর্জনার সাথে নানা রোগের জীবাণু মিশে থাকে। এ রোগ জীবাণু ও ময়লা পদার্থ কাপড়ের সঙ্গে মিশে হাত পায়ের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে, এমনকী পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ারও সুযোগ পায়। এ রোগ-জীবাণু পেটে ঢুকে পড়লে বা শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লে কি ক্ষতি হয় তা আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলা লাগে না।

প্রিয়নবী (সা) দাড়িকে লম্বা করে রাখতে বলেছেন এবং তা কাটতে বারণ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে গোঁফকে তিনি খাটো করে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। নবীজী (সা)-এর নির্দেশ নিম্নরূপ ঃ "তোমরা (তোমাদের ইচ্ছাধীন বিষয়গুলোতে) মুশরিকদের ব্যতিক্রম কর, তোমরা দাড়িকে লম্বা করে রাখ আর গোঁফকে খাটো কর।" (বুখারী-মুসলিম)

রাসূলে আকরাম (সা)-এর এ অমূল্য বাণী একদিকে যেমন ধর্মীয় বিধান, অপরদিকে তা স্বাস্থ্য গঠন ও সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, যা বর্তমান স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, কেননা দাড়ি না রেখে যদি বারবার রেজার-ব্লেডের মাধ্যমে তা শেভ করে ফেলা হয় তবে তার ফলে স্নায়ুমণ্ডলী আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে, চেখের জ্যোতি কমে যায় এবং চেহারা ও মুখাবয়ব নষ্ট হয়। এ ছাড়া দাড়ি লম্বা রাখার ফলে বায়ু সরাসরি ফুসফুসে আঘাত করতে পারে না বরং দাড়ির ফলে বায়ু বাধাগ্রস্ত হয়ে ধীর গতিতে তার সুফল ফুসফুসে পৌঁছাতে পারে, এর দ্বারা ফুসফুস সুরক্ষিত থাকে।

অপর দিকে গোঁফ খাটো করে রাখতে বলা হয়েছে। কেননা গোঁফ লম্বা থাকলে তাতে ধূলা-বালি, ঘাম ও দূষিত রোগজীবাণু লেগে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক, যা মুখের খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে পানীয় পদার্থের সাথে খুব সহজেই পাকস্থলিতে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যের সমূহ ক্ষতি সাধন করতে পারে। এ ছাড়া নাকের ছিদ্রপথে শরীরের অভ্যন্তর হতে কার্বনডাই অক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস ইত্যাদি নির্গত হয়ে থাকে, যা গোঁফ বড় থাকলে তাতে আটকে থাকা ধূলাবালি ও ঘামের সাথে মিশে বিষাক্ত জীবাণুতে পরিণত হয়। এসব জীবাণু পানি কিংবা অন্য কোনও তরল পদার্থ বা পানীয় পান করার সময় তার সাথে মিশে পাকস্থলিতে প্রবেশ করে মারাত্মক রসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত করে থাকে, গোঁফ সংক্রান্ত উপরোক্ত নির্দেশ নবীজী (সা)-এর স্বাস্থ্য সচেতনতা ও এ ব্যাপারে বিশেষ পাণ্ডিত্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বাস্থ্য সুগঠন ও সংরক্ষণের জন্য একদিকে যেমন শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন অপরদিকে প্রয়োজন পরিমাণে বিশ্রাম গ্রহণও অপরিহার্য। কেননা শারীরিক শ্রম না করা হলে শরীরের চর্চা হয় না, ফলে তা সুস্থ ও সবল হতে পারে না বিধায় শরীর চর্চার জন্য শারীরিক শ্রম অপরিহার্য। আবার প্রয়োজনীয় বিশ্রাম গ্রহণ না করে শুধু শ্রম দিতে থাকলে একটানা শ্রমের ধকল সইতে না পেরে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। অনেকে বিশ্রামের ব্যাপারে চরম উদাসীনতাও প্রদর্শন করে থাকে, সেদিকে ইঙ্গিত করেই প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "দুটি সম্পদ সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই অমনোযোগী। একটি হলো স্বাস্থ্য আর অপরটি হচ্ছে বিশ্রাম।" (বুখারী শরীফ)

রাসূলে আকরাম (সা)-এর এ মহান বাণীর আলোকে আমরা যদি শারীরিক শ্রম ও পরিমিত বিশ্রামসহ স্বাস্থ্য সচেতন হই তবে আমাদের জীবন হতে পারে সুখী ও শান্তিময়। শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে হাজারো ধন-সম্পদ আর বিলাসবহুল, গাড়ি-বাড়ি মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। পক্ষান্তরে দুটো শুকনো রুটি অথবা দুমুঠো ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে সুস্থ শরীর নিয়ে স্ত্রী-পুত্রসহ যে ঝুপড়ির মধ্যেও রাত কাটায় তাকেই বরং প্রকৃত সুখী বলা যেতে পারে।

বিশ্রামের ক্ষেত্রে আরো স্বাস্থ্যতথ্য হলো, রীতিমত বিশ্রাম না নিলে মানবদেহ স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বার্ধক্য আসার পূর্বেই বার্ধক্যের কোলে ঢলে পড়তে হয় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়।

মানবদেহ একটি ইঞ্জিন বা যন্ত্রের মতো। একটানা কোনও ইঞ্জিন চলতে থাকলে সেটা যেমন খুব দ্রুত অকার্যকর হয়ে পড়ে, তেমনি মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্রাম না হলে তাও তদ্রূপ দ্রুত অকর্মণ্য হয়ে যায়। বিশ্রাম বলতে পরিশ্রমমুক্ত ও নিদ্রা গ্রহণকে বোঝায়। তিন-চার ঘন্টা একটানা শারীরিক পরিশ্রমের পর অন্তত এক ঘন্টা বিশ্রাম গ্রহণ করা প্রয়োজন। মস্তিষ্কের ক্ষয় পূরণের জন্য দৈনিক অন্তত চার থেকে ছয় ঘন্টা ঘুমানো প্রয়োজন, সুনিদ্রা একদিকে যেমন মস্তিষ্ক সবল করে অপরদিকে তা শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গমনেও সহায়তা করে। এ ছাড়া কিভাবে শয়ন করা বা শয্যা গ্রহণ করা স্বাস্থ্যসম্মত সে ব্যাপারেও প্রিয়নবী (সা) আমাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করেছেন। শয্যা গ্রহণের পদ্ধতি নির্দেশ করে রাসূলে আকরাম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "যখন তোমরা (শয্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে) নিজেদের শয়নকক্ষে গমনের ইচ্ছা কর তখন প্রথমে ওযু করে নাও, যেমন তোমরা নামাযের জন্য ওযু করে থাক। অতঃপর ডান কাতে শুয়ে পড়।" (বুখারী শরীফ)

প্রিয়নবী (সা)-এর এ নির্দেশ খুবই স্বাস্থ্যসম্মত মানুষের শরীরে হৃদযন্ত্র (Heart) বামপার্শ্বে অবস্থিত। এ ক্ষেত্রে কেউ বাম কাতে শয়ন করলে স্বভাবতই তার উপর চাপ পড়ে থাকে। এর ফলে শরীরের স্বাভাবিক রক্ত চলাচল বিঘ্নিত হয়। আর রক্ত তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে বাধাগ্রস্ত হলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে।

প্রিয়নবী (সা)-এর ব্যক্তি ও সমাজের স্বাস্থ্য গঠন ও তা সুরক্ষার অগণিত বাণী ও বিষয়সমূহ হতে এখানে মাত্র কয়েকটি বিষয় নিয়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

অবশেষে একথা অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা যায় যে, আমাদের প্রিয়নবী (সা) একমাত্র নবী, যিনি ইবাদতের পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ মানবদেহ ও মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ের উপরই অত্যন্ত যৌক্তিক আলোচনা করেছেন এবং তিনি ইবাদত ও স্বাস্থ্য রক্ষার মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। এবারে আমরা রোগ প্রতিকার ও রোগমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে মহানবী (সা)-এর নির্দেশনার উপর সামান্য আলোকপাত করব।

রোগ ও তার প্রতিকার

সৃষ্ট জীবমাত্রই অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হতে পারে। মানুষও এ সাধারণ নিয়মের বাইরে নয়। মানুষেরও রোগব্যাধি হয়ে থাকে, তাদেরকেও তার প্রতিকার বা প্রতিষেধক তালাশ করতে হয়।

রোগ বা ব্যাধি ঠিক কত প্রকার ও কি কি, তা কোনও মানুষই অবগত নয়। কোনও দেহবিজ্ঞানীই আজ পর্যন্ত এর সঠিক সংখ্যা খুঁজে বের করতে সক্ষম হননি। তার সঠিক পরিসংখ্যান একমাত্র আল্লাহ পাকই ভাল জানেন, তবে শরীরবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে আনুমানিক যে মন্তব্য করেছেন তা হলো, যেসব রোগ মানবদেহে আক্রমণ করে থাকে, তার সংখ্যা মোটামুটি দু'লক্ষাধিক। (বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ (সা), পৃ. ২৩৪)

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অধিকাংশ রোগের চিকিৎসা বা নিরাময় ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেও এমন কিছু রোগও তারা নির্ণয় করতে পেরেছেন যার সুষ্ঠু কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি বা প্রতিষেধক তারা আজো আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। যেমন ক্যান্সার, এইডস ইত্যাদি রোগের ব্যাপারে কোনও কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি আজো বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। তবে আমরা এ ব্যাপারে প্রিয়নবী (সা)-এর বাণীর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখি তিনি সকল রোগেরই চিকিৎসা তথা প্রতিষেধক রয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন ঃ "মহান আল্লাহ এমন কোনও রোগ পৃথিবীতে প্রেরণ করেননি, যার জন্য তিনি কোনও ঔষধ বা প্রতিষেধক দান করেননি।" (বুখারী)

হাদীসে বর্ণিত বক্তব্যের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, প্রতিটি রোগের জন্যই আল্লাহ পাক প্রতিষেধক তথা প্রতিকার ব্যবস্থা রেখেছেন।

হাদীস শরীফের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ

"তোমাদের কারো (তরল) খাদ্য পাত্রে মশা-মাছি পড়লে তাকে প্রথমে ঐ খাদ্যের মাঝে ডুবিয়ে দাও। অতঃপর সেটা বের করে ফেলে দাও। কেননা তার এক পাখায়

রোগজীবাণু থাকে এবং অপর পাখায় সে রোগের প্রতিষেধক থাকে, আর সে রোগযুক্ত পাখাটিকেই প্রথমে নিক্ষেপ করে থাকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে এ কথাই পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ প্রত্যেক রোগের খুব কাছাকাছিই তার প্রতিষেধক বা ঔষধ রেখে দিয়েছেন।

রোগ-ব্যাধি মহান আল্লাহই দিয়ে থাকেন। এর অর্থ এই নয় যে, রোগ হলে তা নিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। প্রিয়নবী (সা) কেউ রোগাক্রান্ত হলে কস্মিন-কালেও তাকে চিকিৎসা গ্রহণ না করে হাত-পা গুটিয়ে শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকতে বলেননি। তবে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রকৃত আরোগ্য ও সুস্থতা মহান আল্লাহই দিতে পারেন। কিছু উপায়-উপকরণ গ্রহণ করে সুস্থতার জন্য কিছু বাহ্যিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই শুধু আমাদের দায়িত্ব। রাসূল (সা) সর্বদা মহান আল্লাহর দরবারে এই বলে ফরিয়াদ করতেন ঃ

"হে আল্লাহ! আমাকে অপ্রিয় ব্যবহার, কার্য ও বাসনা এবং অনিষ্টকর রোগ হতে রক্ষা কর।" (তিরমিযী)

এ তো ছিলো রোগমুক্ত থাকার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ; রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে সে ক্ষেত্রে তা নিরাময়ের জন্য রাসূল (সা) আমাদের প্রতি কি নির্দেশনা দিয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হচ্ছে।

হযরত রাসূল (সা) ইরশাদ করেন ঃ "জ্বর মূলত দোযখের উত্তাপ থেকে সৃষ্ট, অতঃপর তোমরা তা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।" (মিশকাত)

জ্বর এমন একটি ব্যাধি যাতে দু চার দশবার আক্রান্ত হয়নি এমন লোক হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ জ্বর আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানে প্রধানত জ্বরের যে কারণ বর্ণনা করা হয়ে থাকে তা হলো, শরীরে রোগজীবাণু প্রবেশ করায় তার সাথে রক্তের শ্বেত কণিকার সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, ফলে স্নায়ুমণ্ডলীতে বড় ধরনের আঘাত লাগে এবং তা থেকে এক ধরনের উত্তাপের সৃষ্টি হয়। আর এ উত্তাপকেই বলা হয় জ্বর। পানিই হচ্ছে এর প্রধান ঔষধ বা প্রতিষেধক, কেননা কেউ যখন জ্বরে উত্তাপে ছটফট করতে থাকে, কোন ঔষধেই যখন তার কোনও কাজ হয় না তখন পানিই একমাত্র উপাদান যা অসহ্য যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়ে থাকে।

দীর্ঘ চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে প্রিয়নবী (সা)-এর শেখানো পানি দ্বারা জ্বরের চিকিৎসার বিষয়টিকেই অকপটে মেনে নিলেন বর্তমান বিজ্ঞানীরা। জ্বরের জন্য তাঁরা যে সব ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন তার মধ্যে পানিই হচ্ছে প্রধান।

রাসূলে আকরাম (সা) রোগের প্রতিষেধক হিসেবে মধুর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, মধু ছিল হযরত (সা)-এর প্রিয় খাবার। বুখারী শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত (সা)

ইরশাদ করেছেন, "মধুর শরবত রোগমুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।" এ ছাড়াও মধু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে একটি দীর্ঘ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

"(হে নবী!) আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন, পর্বত গাত্রে, বৃক্ষ ও সকল উঁচু স্থানে মৌচাক নির্মাণ করো। এরপর সবরকম ফল ফুল থেকে (মধু) ভক্ষণ করো (মধু সংগ্রহ কর) এবং আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। (মধু মক্ষিকা এমন প্রাণী) যার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা নাহল ঃ ৬৮-৬০)

পবিত্র কুরআনেব দেয়া এ তথ্যের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে একমাত্র মধুর ব্যবহারেই হাজারো রকমের কঠিন জটিল রোগ থেকে অতি অল্প সময়েই আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ মধু কাশি, শ্বাস, জ্বর, অতিসার, বমি, কৃমি ও বিষদোষ নাশের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। এ ছাড়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে মধু সাধারণত রস, রক্ত, গোশত, মেদ, অস্থিমজ্জা, শুক্র, স্তন, কেশ, বল, বর্ণ ও দৃষ্টিশক্তি বর্ধনে। মধু বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মানবদেহের সুস্থতার জন্য যত প্রকার ভিটামিন আবশ্যক তার শতকরা ৭৫ ভাগই মধুর মধ্যে বিদ্যমান। চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে মধু অপেক্ষা শক্তিশালী ভিটামিনযুক্ত আর কোনও পদার্থ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। (কুরআন না বিজ্ঞান, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম, মানবদেহের উপকারিতা ও তার কার্যকারিতার উপাদান মধুর মাঝে কত দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান। সুতরাং প্রিয়নবী (সা)-এর মধু সেবন ও অন্যদের তা সেবন করতে উৎসাহিতকরণ হযরত (সা)-এর রোগ-ব্যাধি ও তা থেকে আরোগ্য সম্পর্কে সর্বাধিক সচেতনতার প্রমাণ।

অগ্রপথিক। মে ২০০২

মানসিক রোগ চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি

ডা. আ ন ম বদরউদ্দিন

মানুষের আবির্ভাবের শুরু হতে মনোবিকারের শুরু বলা যায়। আল্লাহ পাক কুরআনে ইরশাদ করেছেন, হযরত আদম ও মা হাওয়া (আ) হলেন দুনিয়ার প্রথম মানুষ। আল্লাহ পাক তাদের সৃষ্টি করে নিষেধ করলেন গন্দম গাছের নিকট যেতে এবং ঐ গাছের ফল না খেতে। তাঁরা কিছুদিন পর শয়তানের ফাঁদে পা দিলেন। বন্ধুর বেশে শয়তান বলল সেই গাছের ফল খেতে। কৌতূহলী মন আর ধৈর্য ধরল না। তাঁরা খেয়ে নিলেন সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল। তাই রাব্বুল আলামীন অসন্তুষ্ট হলেন। তারপর জান্নাত থেকে তাঁদের দুনিয়ায় পাঠানো হল। প্রথম মানুষের পা পড়ল দুনিয়ায়। বর্তমানে প্রায় ছয় শ কোটি মানুষ আমরা তাঁদেরই বংশধর।

সেই প্রভাব বংশগতভাবে ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। বংশগত প্রভাবকে সারানো যায় না বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। তাই কম-বেশি আমরা সবাই মনের রোগী বললে ভুল কিছু হবে না। আমাদের আশেপাশে দেখা যায় – একজন স্বাভাবিক অপরজন অস্বাভাবিক। মানুষের অস্বাভাবিক আচরণকে মানসিক প্রতিফলন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সচরাচর সমাজে মানুষের এই অস্বাভাবিক ব্যবহার ও আচরণকে মানসিক ব্যাধি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই সকল ব্যক্তির যে চিকিৎসা প্রয়োজন তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করতে পারে না, যার জন্য কোনও মানসিক রোগীর যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছে না।

দেহকে আমরা দেখতে পাই, মনকে দেখতে পাই না। দেহের সুনির্দিষ্ট অবয়ব আছে। কিন্তু মনের কোন অবয়ব নেই। তবে মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মনের অবয়ব হলো ক্রিয়াগত। আমরা মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি শুধু মনের ত্রিবিধ ক্রিয়ার অস্তিত্ব জানার মাধ্যমে। চিন্তার ক্রিয়া, ইচ্ছা ক্রিয়া ও অনুভূতি ক্রিয়া মনের তিনটি মৌলিক ক্রিয়া। মানসিক রোগে এই তিনটি ক্রিয়ার স্বাভাবিকতা নষ্ট করে অস্বাভাবিকতা আনয়ন করে।

দেহ অসুস্থ হয় ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ব্যাহ্যিক ইরিটেশন ও অভ্যন্তরীণ ডিফিসিয়েনসি দ্বারা, কিন্তু মন কিভাবে আক্রান্ত হয় তা অনেকের কাছে পরিষ্কার নয়।

হ্যানিম্যান বলেছেন, মন আর দেহ বিচ্ছিন্ন নয়। একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেক রোগ সৃষ্টির মূলে রয়েছে মনের বিশৃঙ্খলা। মন বিশৃঙ্খল না হলে দেহের কোনও রোগ হতে পারে না। যে কোন ব্যাধিতে প্রথমে মনকে আক্রমণ করে, পরে দেহকে আক্রমণ করে।

মনের কাঠামোগত অস্তিত্ব খুঁজে না পেলেও একথা সত্য যে, মন বাহ্যিক ইরিটেশান দ্বারা আক্রান্ত হয়। শব্দগত ইরিটেশান, রোগগত ইরিটেশন, গন্ধগত ইরিটেশান ও ভাবগত ইরিটেশান (ধর্মীয়, আত্মসম্মান, মানসম্মান, স্নেহ মায়ামমতা, ভালোবাসা ও আকাঙ্ক্ষাবোধ) দ্বারা মন প্রতিনিয়ত পীড়িত হয়। মনোরোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই চতুর্বিধ কারণের মূল্যায়ন অতীব প্রয়োজন। তবে সচরাচর আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় মানসিক রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে এগুলোর মূল্যায়ন হয় না।

দৈহিক রোগী সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে দুই ধরনের পরিণতি আসে। ১. রোগী এককভাবে রোগ ভোগ করে মারা যায়। ২. রোগী রোগ ভোগ করে আশেপাশের সুস্থ ব্যক্তিতে রোগ ছড়ায়। মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে উপরোক্ত দুই ধরনের পরিণতি ছাড়া আরো একটি পরিণতি আসে। রোগীর সব আচরণ বা কাজকর্ম সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ধ্বংস করে। দৈহিক রোগীর ক্ষতির চেয়ে মানসিক রোগীর দ্বারা সমাজে অধিক ক্ষতি হয়। মানসিক রোগীর সঠিক চিকিৎসা ছাড়া সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব নয়। ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, আত্মসাৎ, বিকৃত রুচি, ঝগড়া-বিবাদ, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও সহনশীলতার অভাব মনোরোগজনিত বিকৃতি।

আমাদের দেশে মানসিক রোগীর জন্য একটিমাত্র হাসপাতাল রয়েছে। পাবনার মানসিক হাসপাতাল ছাড়া মানসিক রোগীর চিকিৎসার কোনও সুব্যবস্থা নেই বললে চলে। আর এ হাসপাতালটির ব্যবস্থাপনা ও রোগী চিকিৎসার যে চিত্র পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় তা খুব করুণ–ভয়াবহ। সেই হাসপাতালে রোগী চিকিৎসার নামে মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়, যা রোগীর আরোগ্য দূরের কথা, রোগীকে আজীবনের জন্য অকেজো করা হয়। অমানবিক ও পাশবিক নির্যাতনই মানসিক রোগী চিকিৎসায় হাতিয়ার বা পথ নয়। মানসিক রোগ কুমতলব বা স্নায়বিক উত্তেজনা নয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হ্যানিম্যান অমানবিক পাশবিক বর্বর চিকিৎসার পায়ে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি ক্ষতিকারক চিকিৎসার পাশাপাশি হিতকারক চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক প্রতিস্থাপন করেন। তিনি প্রথমেই সকল অজ্ঞতার ভাণ্ডারে আলো জ্বালিয়ে চিকিৎসকদের দেখিয়েছেন মানসিক রোগ কিভাবে সৃষ্টি হয় আর মানসিক

রোগী কিভাবে আরোগ্য হয়। তিনি সুস্থ শরীরের ঔষধ পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন ঔষুধ বস্তুর অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে মানসিক রোগ সৃষ্টি করার ও আরোগ্য করার। হোমিওপ্যাথিই পারে মানসিক রোগীকে সহজেই আরোগ্য করতে। মানসিক রোগীর চিকিৎসা দৈহিক রোগীর চিকিৎসা থেকে ভিন্নতর। দৈহিক রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসার যান্ত্রিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্য নিতে পারে কিন্তু মানসিক রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে তা পারা যায় না। প্যাথলজিক্যাল কোনও রিপোর্ট দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায় না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা কারণভিত্তিক। আর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লক্ষণভিত্তিক। মানসিক রোগের প্যাথলজিক্যাল কোন কারণ নেই। তবে মানসিক রোগীতে বহু কারণ রয়েছে। তাই হোমিওপ্যাথিতে মানসিক রোগ চিকিৎসা সহজতর।

এক ব্যক্তি সব সময় উদাসীন। কোন কিছুতে মায়ামমতা নেই। সে একা থাকতে চায়। নির্জন স্থানে একা একা বসে থাকে। শোকজনিত কারণে তার এ অবস্থা। এটা একটা মানসিক রোগ। এলোপ্যাথি বা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে এর কি কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা হবে? আসলে এলোপ্যাথিতে শোকজনিত কারণে সৃষ্ট ব্যাধির কোনও পৃথক ঔষধ নেই। কারণ এলোপ্যাথির বা অন্যান্য প্যাথির ঔষধগুলো পরীক্ষা করা হয় ইতর প্রাণীর উপর, যাদের মানসিক অবস্থা বর্ণনা করার ক্ষমতা নেই। এক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য হোমিওপ্যাথির যথেষ্ট ঔষধ রয়েছে। যেমন–সিপিয়া, ইগ্নেশিয়া, নেট্রাম মিউর, এপিস, লাইকোপোডিয়াম, মেডোরিনাম ইত্যাদি।

স্নায়বিক চিকিৎসা ও মানসিক চিকিৎসা এক নয়। স্নায়ুর বস্তুজাত সত্তা আছে। মনের কোন বস্তুজাত সত্তা সম্পর্কে আজও আমরা অজ্ঞাত। মনের অস্তিত্ব ক্রিয়াজাত সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানোবিজ্ঞানীরা মনকে প্রথমে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন। এদের যে কোনও স্তরে গণ্ডগোল হলেই মন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। মনের তিনটি স্তর—চেতন, অবচেতন ও নির্জ্ঞান। মনের সমস্ত কর্মকাণ্ড এ ত্রিবিধ ক্রিয়ার ও স্তরের উপর নির্ভরশীল। মনের সব ক্রিয়ার অন্তর্মূলে এগুলোর অস্তিত্ব রয়েছে।

অনেকের ধারণা, মানুষের মন অবস্তুজাত। ফলে ওষুধ মনের উপর ক্রিয়া করতে পারে না। মনের সুস্থতা বা অসুস্থতা অলৌকিক ব্যাপার। এ কুসংস্কারের পায়ে কুঠারাঘাত করেছেন বিজ্ঞানী হ্যানিম্যান। তিনি প্রমাণ করেছেন– "বস্তুজাত শক্তিকৃত ওষুধ অনায়াসে মনের ওপর ক্রিয়া করে।" হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকার মনোলক্ষণ তার পরিচায়ক। মন ও ওষুধ একে অপরের অনুপূরক, পরিপূরক ও সম্পূরক সম্পর্কিত।

ধরুন, সুস্থ সমান B. মন সমান M. ঔষধ সমান D আর সৃষ্টি লক্ষণ সমান S। তাহলে B (MXD) S

অতএব B(MXD) = NS

[এখানে N একটা ধ্রুব সংখ্যা]

অর্থাৎ B-এর মান ১, M এর মান ১, ও D এর মান ১ হলে, অবশ্য N এর মান ১ হয়। সুতরাং N এর মান সর্বদাই ১।

দেহ পরিবর্তন হলে মন পরিবর্তন হয়, আবার মন পরিবর্তন হলে দেহও পরিবর্তন হয়। মনোরোগ বা লক্ষণ দেহ, মন ও ভেসজের সমন্বয়ে সৃষ্ট। তাই মনোলক্ষণ বিতাড়ন এই তিনের সংখ্যাগত, পরিমাণগত ও গঠনতান্ত্রিক বৈচিত্র্য অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

হ্যানিম্যান অর্গাননের ১১ নং অনুচ্ছেদে রোগের কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি জীবনবিরোধী উপাদানসমূহকে রোগের কারণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ জীবনবিরোধী সকল উপাদানই রোগ সৃষ্টি করতে পারে। মনরোগের ক্ষেত্রেও তা সত্য। প্রত্যেকটা মনরোগ জীবনবিরোধী উপাদানের প্রভাবে সৃষ্ট। এগুলো ছাড়া এমন কতিপয় উপাদান আছে যেগুলোর সাথে আমরা সবাই পরিচিত। তবে জানি না যে, ওগুলো মনোলক্ষণও সৃষ্টি করতে পারে। যেমন ঃ ১. শব্দজাত-সঙ্গীত, ভর্ৎসনা, কর্কশ, ২. গন্ধজাত-সুগন্ধী, দুর্গন্ধ; ৩. রূপজাত-আগ্‌লি চেহারা, সুন্দর চেহারা, সুন্দর গোলাপ, এলোমেলো আসবাবপত্র; ৪. ভাবজাত-ভালমন্দ, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, অপবাদ, তিরস্কার-পুরস্কার, মানসম্মান; ৫. ইচ্ছাজাত-প্রেম, প্রীতি, বন্ধুত্ব, ধনলিপ্সা, প্রতিহিংসা; (৬) অনুভূতিজাত ঃ রাগ-বিরাগ; ৭. চিন্তাজাত-অপূরণীয় চিন্তা,এলোমেলো চিন্তা ইত্যাদি। বাহ্যিক উপদ্রব যেমন দেহকে ছিন্ন-ভিন্ন করে রুগ্ন করে তদ্রূপ উপরোক্ত উপাদানগুলো মনকে লণ্ডভণ্ড করে রুগ্ন করে তোলে। হোমিওপ্যাথিতে রয়েছে সে রুগ্নতার একটা পূর্ণাঙ্গ চিত্র। অবগতির জন্য তার কিয়দংশ নিম্নে তুলে ধরলাম।

১. অন্য মনস্ক (Absent Minded)
২. ক্রোধ (Anger)
৩. মনস্তাপ (Anguish)
৪. উৎকণ্ঠা (Anxiety)
৫. ধনলিপ্সা (Avarice)
৬. দংশন প্রবৃত্তি (Biting)
৭. কোলে উঠে (Carried) বেড়াবার ইচ্ছা
৮. লোক-সঙ্গ (Company) (বিতৃষ্ণা)
৯. ঘৃণাপরায়ণ
১০. মৃত্যুর ইচ্ছা করে (Death desires)

১১. প্রলাপ (Delirium)
১২. ভ্রান্ত বিশ্বাস (Delusion)
১৩. অসন্তুষ্ট (Descontented)
১৪. উত্তেজনা (Excitement)
১৫. কল্পনায় ডুবে থাকা (Fancies absorbed in)
১৬. ভয় (Fear)
১৭. বিস্মৃতিপরায়ণ (Fprgetful)
১৮. তাড়াতাড়ি (Hurry)
১৯. উদাস (Indifference)
২০. আলস্য (AIndolence)
২১. উন্মাদ (Insanity)
২২. উত্তেজনা (Irritability)
২৩. চুম্বনকার (Kisses)
২৪. মিথ্যাচার (Lie)
২৫. হাস্যকর (Laughing)
২৬. সব বিষয়ে বিতৃষ্ণা
২৭. স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা (Memory weakness)
২৮. গোলমাল (Nois) বিরক্তি জন্মে
২৯. ভুল করে (Mistakes) হিসাব করতে।
৩০. কামোন্মাদনা (Nymphomania)
৩১. কলহপ্রিয় (Quarrelsome)
৩২. ধর্মানুরাগ (Religious)
৩৩. বিষণ্নতা (Sadness)
৩৪. অস্থিরতা (Bestlessness)
৩৫. অতানুভূতিযুক্ত (Sensitive)
৩৬. লজ্জাহীন (Shameless)
৩৭. দীর্ঘশ্বাস ফেলে (Sighing)
৩৮. চমকে উঠে (Starting)
৩৯. আঘাত করে (Striking)
৪০. চিন্তা করা (Thinking)
৪১. আত্মহত্যা প্রবৃত্তি (Suicidal-desposiction)
৪২. সন্দেহযুক্ত (Suspicious)

৪৩. অজ্ঞানতা (Unconsciousness)
৪৪. জীবনে বিতৃষ্ণা (Weary of life)
৪৫. ক্রন্দন করে (Weeping)
৪৬. স্ত্রীলোকের প্রতি বিতৃষ্ণা
৪৭. কার্য (Work)
৪৮. ইচ্ছাশক্তি (Well) প্রতিবাদ করে
৪৯. লিখন কার্যে (Writing) অনিচ্ছা

এইগুলো ছাড়া আরোও অনেক মানসিক লক্ষণ আছে। 'জে, টি, কেন্ট এম. ডি. রচিত 'রেপাটরী অব দি হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা' বইতে প্রায় সাড়ে পাঁচশয়ের মত মানসিক বিশৃঙ্খলতার চিত্র আছে। দেখুন—একজন ব্যক্তি বলে তার কিছুই ভাল লাগে না। সংসার বিষের মত লাগে, কাজকর্ম করতে ইচ্ছা হয় না। কেউ কথা বললে খারাপ লাগে। কারও কথা শুনতে চায় না। রাতে ঘুম হয় না। সামান্য ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে যায়। নির্জনে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। খাবার, পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে তার কোনরূপ নজর নেই। তার মনে সদা চিন্তার স্রোত চলে। সে বলতে পারে না কেন সে চিন্তা করে। সে কোনমতেই মন থেকে চিন্তা দূর করতে পারে না। দিন দিন সে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। পরিবারের অন্য কেউ জানে না কেন সে এমন হচ্ছে। তার দেহে কোন অসুখ নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও কিছু পাওয়া যায় না। এগুলোকে রোগ বলে না– আসলে এগুলো মানসিক রোগ। দেখতে পাবেন সে এরকম হবার পেছনে তার মানসিক আঘাত হয়েছে। হয়তো বা সে ভালবাসাবঞ্চিত, নয়তো বা সে অন্য কোনরূপ মানসিক আঘাতে জর্জরিত। এ ধরনের অবস্থায় সহজেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচন করে তাকে আরোগ্য করা যায়। অর্থাৎ হোমিওপ্যাথি ঔষধ দ্বারা মানসিক রোগ চিকিৎসা করতে হলে তার রোগের কারণ বা বাধা প্রথমে উৎঘাটন করতে হয়।

মনোরোগের প্রতিকার সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। দেহ রোগ থেকে বাঁচার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সকলে সজাগ। স্বাস্থ্যনীতিতে পরিবেশ দূষণ উল্লেখ আছে। পরিবেশ দূষণ বলতে বোঝানো হয়–পচাগলা আবর্জনা ও দুর্গন্ধ। শব্দ দূষণ, রূপ দূষণ, ভাব দূষণ সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা নেই। এখনো আমরা বুঝি না যে, অযথা দেহ-রূপ দর্শন পরিবেশ দূষণে পড়ে, তা অনেক মনোরোগের কারণ। সচেতন ব্যক্তিরা কাউকে ডাস্টবিন থেকে পরিত্যজ্য পচা খাদ্য খেতে দেখলে শিহরে ওঠেন। কারণ তাতে রোগ জীবাণু আছে। সে যে কোন সময় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। আসলে অপরিচ্ছন্নতায় রোগ ছাড়ায়। কিন্তু এটা আমরা জানি না যে শব্দজাত, ভাবজাত ও রূপজাত পচা পরিবেশ পচা ডাস্টবিন থেকেও ক্ষতিকর।

দেখুন, কোন ব্যক্তি একটা শলার জ্বলন্ত কাঠি দিয়ে অপর ব্যক্তির মুখ পুড়িয়ে দিলে তার বিচার হয়। আহত ব্যক্তির চিকিৎসা হয়। কিন্তু একজন রূপসী তার রূপানল দিয়ে কারও হৃদয় পুড়িয়ে দিলে তা কেউ দেখে না, কাউকে বলা যায় না, আর তার বিচার হয় না, চিকিৎসাও হয় না। এটা একটা মানসিক যাতনা। এটার প্রতিকার ছাড়া সমাজে অক্ষত মন রাখা সম্ভব নয়। সুন্দর মন ছাড়া সুন্দর দেহ হয় না। সুস্থ মস্তিষ্ক ছাড়া কল্যাণমূলক কাজ করা যায় না। তাই কল্যাণমূলক সমাজের জন্য চাই সুস্থ মন।

অগ্রপথিক। অক্টোবর ২০০২

স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ও ইসলামের শিক্ষা

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

নিম্নমানের স্যানিটেশন, খারাপ স্বাস্থ্য, জীবন যাত্রার নিম্নমান, অধিকতর অপুষ্টির মাত্রা, অত্যধিক রোগের প্রকোপ, ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশ, চরম দারিদ্র্য আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়। এগুলোর সাথে স্যানিটেশনের আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। সহজ কথায় দারিদ্র্য, পরিবেশ দূষণ, রোগের প্রকোপ, জীবন যাত্রার নিম্নমান, নিরাপদ পানির অভাব, যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস এবং সচেতনতার অভাবের কারণে স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিম্নমানের হয়ে থাকে। নিরাপদ পানির সংস্থান ও স্যানিটেশন মানব জীবনে অপরিহার্য। একে মানবাধিকার হিসেবেও উল্লেখ করা যায়। ২০০০ সালের শুরুতে পাঁচভাগের দু'ভাগ লোক অর্থাৎ ১.৪ বিলিয়ন (২শ' ৪০কোটি) উন্নততর স্যানিটেশন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত ছিল। এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রতি বছরে ৪০ লাখ ডায়রিয়া সংক্রান্ত জটিল রোগীর মধ্যে ৫ বছরের কম বয়স্ক ২ লাখ ৪০ হাজার শিশু মৃত্যুবরণ করছে। (সূত্র ঃ ডব্লিউ এইচ ও ইউনিসেফ)।

২০০২ সালে আফ্রিকার জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়নের উপর বিশ্ব সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনসংখ্যার মধ্যে উন্নততর স্যানিটেশন থেকে বঞ্চিতদের ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেক হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এরপর থেকে বিষয়টি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে।

আরো এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, বিশ্বের ১৯৯০ সালে ৫৫% ভাগ (২'শ ৯০ কোটি) জনসংখ্যা উন্নততর পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা লাভ করেছে। দশ বছর পর ২০০০ সালে এক্ষেত্রে এ বিষয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত জনসংখ্যার পরিমাণ হলো বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৬০ ভাগ (৩'শ ৬০ কোটি)। পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধাদি থেকে বঞ্চিতদের অধিকাংশের বসবাস হলো এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে। বঞ্চিতদের ৮০ ভাগ জনগোষ্ঠীর বাস আবার এশিয়া অঞ্চলে। স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থা আরো উদ্বেগজনক। দক্ষিণ এশিয়ায় ১৯৯০ সালে স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্তির হার ছিল ২৫% যা ২০০০ সালে ৩৭% উন্নীত হয়। স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা আরো উদ্বেগজনক।

নিরাপদ পানি

জীবনের জন্য পানি এবং স্বাস্থ্যের জন্য পানি খুব প্রয়োজন। পানির গুণগত মানের সাথে স্বাস্থ্যের এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বে ৩ মিলিয়নেরও বেশী লোক যাদের মধ্যে অধিকাংশ শিশু অপর্যাপ্ত পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও স্যানিটেশনের কারণে প্রতি বছর মারা যায়। নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা, উন্নততর স্যানিটেশন ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সচেতনতা পানিবাহিত রোগের বোঝা অনেকাংশে লাঘব করতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় ১.৩ বিলিয়ন মানুষ উন্নততর পানি সরবরাহ পেয়ে থাকে। স্যানিটেশন সুবিধা পাচ্ছে এর অর্ধেক লোক অর্থাৎ প্রায় ৬১৫ মিলিয়ন।

বন্যা, খরা, সাইক্লোন ও ভূমিকম্প পানি সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্যে এটা অনেক ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। পানিবাহিত রোগের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একারণে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার জন্য দুর্যোগ প্রশমনে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

জনসংখ্যার অসম বিস্তার নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে কিভাবে সফল করা যায়, সে জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোকে উদ্বিগ্ন থাকতে হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, এসব দেশের নগরগুলোর জনসংখ্যা আগামী ৩ বছরে দ্বিগুণ হবে। এই অবস্থা স্বাভাবিক ও সঙ্গত কারণে পানির উৎস, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক। 'Perhaps, the most serious threat to health crisis in some urbn areas, of the region' পানি সরবরাহ, নিরাপদ পানির উৎস নির্ধারণ ও স্যানিটেশনের জন্য নতুন নতুন পলিসি ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। এজন্য আরো দরকার গণসচেতনতা।

পানি আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত

মহাগ্রন্থ কুরআনুল করীমে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পানি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ 'তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর উহা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগমন করি, অনন্তর তা হতে সবুজ পাতা উদগত করি, পরে তা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি। (সূরা আনআম ঃ ৯৯)।

'তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক।" (সূরা নাহল ঃ ১০)।' "এবং তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন," (সূরা রুম ঃ ২৪) 'তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পানকারীদিগের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর,

আছে পরিশোধিত মধুর নহর, (সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৫)। 'আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা তিনি ভূমিকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন।" (সূরা নাহল ঃ ৬৫)।

'এবং আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতঃপর আমি তা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি, আমি তাকে অপসারিত করিতেও সক্ষম।' (সূরা মুমিনুন ঃ ১৮)।

কুরআনুল করীমে পানি সম্পর্কে অনেকগুলো বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। পানির দ্বারা জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা হয়– কুরআনুল করীমে এরূপই বিধৃত হয়েছে। পানি দ্বারা আমি সমস্ত বস্তুর জীবন দান করেছি এবং আমি পানি থেকে প্রতিটি জিনিস জীবিত করেছি।'

.... মহান আল্লাহ কুরআনুল করীমে এরূপ ঘোষণা দিয়েছেন, 'যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশেছিল ওতপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে, তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না ? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩০)

হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূল (সা) বলেন ঃ 'অন্যকে পানি পান করানো সাদকাতুল্য।' (বুখারী)

অপর একটি হাদীসে হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা) বলেন ঃ 'তোমরা বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও সাদকাহ (দান) (তিরমিযী)। আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানেরই সাদাকাহ করা কর্তব্য। (বুখারী ও মুসলিম)। মানব জাতির কল্যাণ করার কথা স্মরণ করিয়ে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 'তোমরা মানুষের কল্যাণে নিবেদিত শ্রেষ্ঠ মানুষ।' (আল-হাদীস) এই আয়াতের টিকায় বলা হয়েছে ঃ 'আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, আদিতে আকাশ, নক্ষত্র, সূর্য, পৃথিবী ইত্যাদির পৃথক পৃথক সত্তা ছিল না। তখন মহাবিশ্ব ছিল অসংখ্য। গ্যাসীয় কণার সমষ্টি, যাকে বলা হয় নীহারিকা। এই নীহারিকা পরবর্তীতে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এসব খণ্ড ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ, সূর্য, পৃথিবী এবং অন্য গ্রহাদির সৃষ্টি হয়।

জীববিজ্ঞানীদের মতে, সাগরের অভ্যন্তরে অর্থাৎ পানিতেই প্রোটোপ্লাজম (জীবনের আদিম মূলীভূত উপাদান) হতেই জীবের সৃষ্টি। আবার যাবতীয় জীব দেহকোষ দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেকটি কোষের অন্যতম মূল উপাদান হচ্ছে পানি। ভিন্নমতে এর অর্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী বদ্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম অর্থাৎ পূর্বে আশ হতে সৃষ্টি হতো না ও পৃথিবীতে তরু-লতা জন্মাত না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বৃষ্টি হলো এবং মাটি উৎপাদন ক্ষমতা লাভ করল।'

পানির বিশুদ্ধতা রক্ষা

ইসলামের পানির পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা রক্ষার উপর পর্যাপ্ত ও অভাবনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'তিনটি লানতযোগ্য কাজ অর্থাৎ পানির ঘাটে, রাস্তায় এবং ছায়ার স্থানে পায়খানা করা থেকে বেঁচে থাকো।' 'এমন যেন না হয় যে, তোমাদের কেউ বদ্ধ পানিতে পেশাব করে ও তাতে গোসল করে।' এমন যেন না হয় যে, স্থির পানিতে পেশাব করে আবার তাতেই গোসল করে।'

বায়ুতে পরিমিত পরিমাণ আর্দ্রতা না থাকলে তা বিষাক্ত হয়ে ধ্বংসের কারণ হতে পারে। পানির দ্বারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা সহজ ও সুবিধাজনক। পানি সহজলভ্য, প্রতিক্রিয়াহীন। পানি অপরিহার্য 'পানি এত অত্যাবশ্যক', এর কোনও বিকল্প নেই। কুরআনুল করীমে বহু জায়গায় পানির কথা বিধৃত হয়েছে। অধিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা পানির দ্বারা অর্জন করা হয়। এসব কারণে পানি আল্লাহর বড় এক নিয়ামত।

মহান আল্লাহর বিরাট দয়া

আল্লাহ্ মানুষ সৃষ্টি করে শুধু চুপচাপ থাকেননি। তাদের প্রতিপালন, বসবাস ও কল্যাণের জন্য বিস্ময়কর কার্যাদি সম্পাদন করেছেন। এটা চিন্তা করলে অভিভূত হতে হয়। আকাশ থেকে বারি বর্ষণ, শস্য ও ফসল উৎপাদন, ফলমূল ও উদ্ভিদ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে মানুষের খাদ্যের ও পানীয়ের অপূর্ব ব্যবস্থা করেছেন। ভূ-গর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠে বিস্ময়কর পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। পাহাড়ে পর্বতে বরফে পরিণত করে পানির বিরাট অংশকে সংরক্ষণ করা হয়। যেখানে পানির গুণাগুণ বিনষ্ট হওয়ার কোনও আশংকা নেই। সেখানে কোনভাবে পানি দূষিত হওয়ার সম্ভবানা নেই।

সুস্বাস্থ্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত

এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ 'আল্লাহর কাছে তোমরা সুস্বাস্থ্য প্রার্থনা কর, কারণ ঈমানের পরে সুস্বাস্থ্যের চাইতে অধিক মঙ্গলজনক কোন কিছু কাউকে দান করা হয়নি। (ইবনে মাজাহ)

সুস্বাস্থ্যের জন্যে নিরাপদ পানি অপরিহার্য, ইসলামের বিধি বিধান, শিক্ষা ও মূল্যবোধ দ্বারা স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মহানবী (সা) জনগণের যে সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল পানি সমস্যার সমাধান। মদীনায় তখন 'রূমা কূপ' ব্যতীত সুপেয় পানির ব্যবস্থা ছিল না। রাসূল (সা) তখন ঘোষণা করেন ঃ 'যে ব্যক্তি রূমা কূপ ক্রয় করে সকল মুসলমানের কল্যাণার্থে তা ওয়াক্ফ করে দেবে, সে এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে।' তখন হযরত উসমান (রা) এটা ক্রয় করে সাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) পানি ও খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ফুঁ দিতে এবং পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন। তিনি

পাত্র ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। পানাহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বনের জন্য কুরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ ... 'তোমরা পানাহার করে কিন্তু অপচয় করে না'। (সূরা আরাফ ঃ ৩১) সেটা পানি ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বনের জন্য হাদীস মারফত পরামর্শ দান করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নবী (সা) একদা হযরত সা'আদ-এর উযু করার সময় তাঁর নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। তিনি সাআদকে উদ্দেশ্য বললেন, 'হে সাদ! এ অপব্যয় কেন ? তখন তিনি বললেন ঃ পানিতেও কি অপব্যয় আছে ? রাসূল (সা) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তুমি একটি চলমান নদীতেও যদি থাক তবে সেখানেও অপচয় হতে পারে।

ইসলাম পবিত্র, মিষ্ট ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে এবং অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় পানি ব্যবহার থেকে বিরত থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পানি অপবিত্র বা নোংরা না করার জন্য ইসলাম নির্দেশ দান করেছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'খোলা ও আবদ্ধ পানি যা গোসল, ধৌতকরণ ও পান করার কাজে ব্যবহার করা হয় এরূপ পানিতে নোংরা দ্রব্যাদি ফেলবে না বা প্রস্রাব করবে না। নোংরা বা অপবিত্র পানির বিষয়ে সতর্ক করে বলা হয়েছে ঃ যে পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ তিনটিই বিকৃত হয়ে গেছে, সে পানি দ্বারা কোন কাজ করা বা করতে দেয়া উচিত নয়।' (আবূ দাউদ)

পানি পানের নিয়ম নীতি

প্রিয়নবী হযরত রাসূলে করীম (সা) পানি পানের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ম-নীতি অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বৃষ্টির পানি উত্তম ঃ এখন বিজ্ঞানীরাও বলছেন বৃষ্টির পানি বিশুদ্ধ ও উপকারী। একে সংরক্ষণ কার উপর বর্তমানে জোর দেয়া হচ্ছে। বৃষ্টির পানি উত্তম উপকারী বলে কুরআনুল করীমে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

গরম পানির ব্যবহার ঃ দৈনন্দিন কাজে অধিক উত্তপ্ত পানি দ্বারা গোসল করা, ধৌত করা বা পান করা সমীচীন নয়। রাসূল (সা)-এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

নদীতে মুখ লাগিয়ে পানি পান ঃ যে ব্যক্তি নদীতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে তার দৈহিক শক্তি কমে যায়। এতে শারীরিক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। মশকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করা হয়েছে।

দাঁড়িয়ে পানি পান নিষিদ্ধ ঃ ইসলামে দাঁড়িয়ে পানি পান নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বর্ণিত আছে ঃ যদি তোমরা জানতে দাঁড়িয়ে পানি পান করা কত ক্ষতিকর, তাহলে পান করা বস্তু বমি করে ফেলে দিতে।'

একনিশ্বাসে পানি পান না করা উত্তম ঃ পানি বা পানীয় দ্রব্যের মধ্যে ফুঁক দেয়া সমীচীন নয়। এক নিঃশ্বাসে সমুদয় পানি পান করা উচিত নয়। 'পানি বা পানীয় দ্রব্য পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা অনুচিত।'

ঠাণ্ডা ও গরম পানীয় একত্রে পান ঃ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ 'গরম এবং ঠাণ্ডা দ্রব্য একত্রে খাওয়া উচিত নয়।'

ইসলামে যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পানি পবিত্র রাখার উপর জোর দেয়া হয়েছে। কোনও অবস্থাতেই পানি নোংরা বা অপবিত্র করা যাবে না। ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধ থেকে উন্নততর স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও নিরাপদ পানি সংরক্ষণের তাগিদ পাওয়া যায়। স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও নিরাপদ পানির ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ও মূল্যবোধ শাশ্বত ও উৎসাহব্যঞ্জক।

অগ্রপথিক। মার্চ ২০০৪

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান তথ্য-কণিকা

আমিনুল ইসলাম জুয়েল

১. ডায়াবেটিস হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় ঃ

কিছু কিছু ঝুকিপূর্ণ অবস্থা রয়েছে যার জন্য বেড়ে যায় হার্ট এ্যাটাকের সম্ভাবনা। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা আগে থেকে বলে আসছেন, রক্তের কোলস্টেরলের আধিক্য, ধূমপান এবং উচ্চ রক্তচাপ হার্ট এ্যাটাকের অন্যতম কারণ বা হার্টকে তার নিজস্ব নিয়মে চলতে না দেয়ার অন্তরায়। বিশেষজ্ঞরা আরও বলেছেন, শরীরের বেশি ওজন, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের জন্য অনিয়মিত ওষুধ সেবনও বাড়িয়ে তোলে হার্ট এ্যাটাকের ঝুঁকি। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ডায়াবেটিস নিয়ে আতংকিত হয়েছেন। তারা ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগকে আখ্যা দিয়েছেন হৃদযন্ত্রের অন্যতম ঘাতক হিসাবে। ডায়াবেটিসের কারণে হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় ছয় গুণ। এবং এই হার যাদের ডায়াবেটিস নেই কিন্তু ইতিমধ্যেই অন্তত একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়া হারের প্রায় সমান। হৃদরোগের সম্ভাবনা জাগিয়ে তোলার পেছনে ডায়াবেটিস-এর ভূমিকা অনুসন্ধানের এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন পাঁচজন মার্কিন বিজ্ঞানী। গবেষণায় নেতৃত্ব দেন ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাসের ডাক্তার স্টিভেন হাফনার। স্টিভেন এবং তাঁর সতীর্থ বিজ্ঞানীদের গবেষণার রিপোর্টে টাইপ-টু ডায়াবেটিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধরনের ডায়াবেটিস সাধারণত বয়স হলে শরীরে দানা বাঁধে এবং এটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব শুধু খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। বিজ্ঞানী স্টিভেন এবং তাঁর সহকর্মীরা গবেষণার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, কোনও ব্যক্তি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সাত বছরের মধ্যে তার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ২০ শতাংশ। যেখানে একবার হৃদরোগে আক্রান্ত কিন্তু ডায়াবেটিস থেকে মুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই হার সমান অর্থাৎ প্রায় ১৯ শতাংশ। সে তুলনায় ডায়াবেটিস থেকে মুক্ত সুস্থ বক্তির একই বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার হার মাত্র ৩৫ শতাংশ। এটা গেল যাদের ডায়াবেটিস নেই, কিন্তু হার্ট এ্যাটাক হয়েছে কিংবা ডায়াবেটিস রয়েছে কিন্তু এখনও হৃদরোগ হানা দেয়নি শরীরে, এমনসব ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান কিন্তু যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, আবার

হার্ট এ্যাটাকও হয়ে গেছে একবার, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই হার রীতিমত আশংকাজনক অর্থাৎ ৪৫ শতাংশ।

ভিটামিন বি৬ হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়

যাদের খাদ্যতালিকায় বাদাম, সয়াবিনজাতীয় খাদ্য বেশি থাকে তারা হৃদরোগের ঝুঁকি থেকে বেশ দূরে থাকতে পারেন। মার্কিন গবেষক অ্যারোন ফরসেন এ তথ্য জানিয়েছেন। ভিটামিন বি'র পরিমাণ বেশি থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি এক ষষ্ঠাংশ কমে যায়। এর সঙ্গে নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ ও পরিমিত ব্যায়ামও আবশ্যক। ফেব্রুয়ারী ২০০০-এ একটি মার্কিন গবেষণা সাময়িকীতে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, যে সকল মহিলা বি৬ এবং ফলিক জাতীয় খাবার বেশি গ্রহণ করে, তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি অন্তত ৪৫ শতাংশ কমে যায়। যদিও এ গবেষণা কাজটি এখন শতভাগ সম্পূর্ণ হয়নি, তবে বিজ্ঞানীরা হৃদরোগের সঙ্গে বি৬-এর সম্পর্ক সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পেরেছেন। বিজ্ঞানীরা দেহের হোমোসিস্টিন হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে ভিটামিন বি৬-এর হৃদরোগের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। শরীরে বি৬ কমে গেলে হৃদরোগের ঝুঁকি যেমন বাড়ে, তেমন শরীরে হোমোসিস্টিন বেড়ে গেলে বি৬-এর পরিমাণ হ্রাস পায়। সুস্থ সবল শরীরের অধিকারী স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানী অ্যারোন এসব তথ্য উদঘাটন করেছেন।

(সূত্র ঃ বিদেশী সংবাদ সংস্থার রিপোর্ট)

একুশ শতকে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ॥ বিজ্ঞানীদের আশংকা

বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রবণতার ওপর এক নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিশ্বের গড় তাপমাত্রা এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা আগে যা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল চল শতাব্দীতে তার চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞানীদের একটি আন্তর্জাতিক গ্রুপ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকারি প্যানেল (আইপিসিসি) ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত তাদের জলবায়ু বিষয়ক প্রতিবেদনে যে তথ্য দিয়েছিল এবারের এই প্রতিবেদনটিতে জলবায়ুর আরো উষ্ণ হবার প্রবণতার কথা বলা হয়েছে। বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পিউ সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক এলিন ক্লসেনের মতে, "এই গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য দিয়েছে যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিতর্ককে বিজ্ঞান বিষয়ক তর্কের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাস্তবসম্মত সমাধানের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

প্রতিবেদনে বলা হয় বিশ্বের পৃষ্ঠদেশের গড় তাপমাত্রা ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিন থেকে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ০.৬ সেন্টিগ্রেড। তবে এই উষ্ণতার জন্য কেবল সৌর-কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়ার মতো প্রাকৃতিক বিষয়কে দায়ী করা যাবে না, গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণও এর জন্য দায়ী।

গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি বায়ুমন্ডলে সালফেট এরোসল বেড়ে যাওয়ায় শীতল প্রভাবও গত শতক জুড়ে তাপমাত্রা পবির্তনের কারণ। জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে উদ্ভূত সালফার ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ থেকেই সালফেট এরো সলের উৎপত্তি। গ্রীনহাউজ গ্যাস, সালফেট এরোসল এবং সৌর রশ্মির প্রভাবকে একত্রে বিবেচনা করলে তখন জলবায়ুর পরিবর্তন বিজ্ঞানীদের অনুমানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ দেখা যায়।

'আইপিসিসি' ১৯৯৬ সালে এর দ্বিতীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে বিশ্বের ভবিষ্যত গড় তাপমাত্রা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তনের যে পূর্বাভাস দিয়েছিল তাতে তারা ১৯৯২ সালে গ্যাস নিঃসরণের হার ব্যবহার করেছিল। 'আইপিসিসি'-র স্পেশাল রিপোর্ট অন এমিশন সেনারিওজ (এসআই এস)-এর লেখক দলের তৈরি করা নতুন নিঃসরণ চিত্রের প্রাথমিক সংস্করণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। পুরাতন (১৯৯২) এবং নতুন (এসআরই এস) চিত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছে, নতুন চিত্রে সালফার-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ অনেক কম দেখা যাচ্ছে। সালফার ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণ হ্রাসের ফলে 'আইপিসিসি' প্রকাশিত আগেকার চিত্র অনুযায়ী তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনের যে নমুনা তৈরি করেছেন, তার হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের গড় উষ্ণতা ১৯৯০ থেকে ২১০০ সালের মধ্যে ১.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ২.৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় পৌঁছাবে। এই একই সময়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাও ৪৬ থেকে বেড়ে ৬৮ সেন্টিমিটার হবে। আগামী কয়েক দশকের তাপমাত্রা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের উপর নির্ভর করবে না।

বেশ কয়েকটি জলবায়ুর নকশার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে দেখা গেছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উষ্ণতার হার বিশ্বের গড় হার থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্রুততর হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আঞ্চল-ভিত্তিতে বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতির পতন ও পরিমাণ খুবই অনিশ্চিত। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সকল নমুনাতেই যে অভিন্ন ফলাফল পরিলক্ষিত হচ্ছে তা হল, উত্তরাঞ্চলীয় সমভূমি এলাকা থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো পর্যন্ত উত্তর অক্ষাংশ জুড়ে তীব্র শীতের পতন। এমনকী বৃষ্টিপাত, তুষারপাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে যদি কোনো পরিবর্তন না-ও ঘটে তবু উষ্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত বাষ্পীয়ভবনের কারণে কৃষিকার্যে ব্যবহার্য পানির প্রপ্যতা, মানুষের ভোগ্যপণ্য এবং শিল্প কারখানায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। কেবল এই একটি উপাদানের ফলেই গ্রীষ্মকালে মাটির পরিস্থিতি আরো শুষ্কতর হয়ে উঠতে পারে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের পানি ব্যবহারের দক্ষতার ওপর সরাসরি প্রভাব রাখে বলে উদ্ভিদের পানি ব্যবহারে দক্ষতার ওপর প্রস্বেদনের হার কমিয়ে দিয়ে

বর্ধিত বাষ্পীভবনের প্রতিক্রিয়া হ্রাস করতে পারে। বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটার ফলে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া ও জলবায়ুতে চরম পরিবর্তন দেখা দেবে। চরম উষ্ণ দিনের সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই বৃদ্ধি পাবে এবং তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে খুব কম বিরাজ করবে। প্রতিদিনের বৃষ্টিপাত, তুষারপাত ইত্যাদির হার কি হবে তা এখনো অত্যন্ত অনিশ্চিত, যদিও লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে বৃষ্টিপাতের হার বাড়তে পারে। ঘূর্ণিঝড় এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের বেলায় বাতাসের গতিবেগ সামান্য বাড়তে পারে। এরকমও হতে পারে যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ঝড়ের সঙ্গে ব্যাপক পরিমাণে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বিশ্বব্যাপী সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়ের সংখ্যার পরিবর্তনের ওপর কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই তবু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে জানা গেছে যে, উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে এগুলোর হার বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা বেশি।

(তথ্যসূত্র, ইউসিস)
অগ্রপথিক। জানুয়ারি ২০০১

মাদকাসক্তি নিরোধে মহানবী (সা)-এর শিক্ষা

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

মাদক কি

যে বস্তু বা পানীয় পান করলে বা সেবন করলে বা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দিলে নেশা ধরে এবং যা স্নায়ুতন্ত্রকে (Nervous System) উত্তেজিত করে তাই মাদক। সাধারণত আঙুর, খেজুর, গম, যব, মধু, আপেল, নাশপাতি, ইক্ষু, পীচফল ইত্যাদি থেকে যে মাদক তৈরি হয় তা পানীয়। ওপিয়াম গাছ থেকে যে মাদক তৈরি হয় তা গাঁজা, মরফিন ও হেরোইন নামে পরিচিত। হাশিশ গাছ থেকেও মাদক তৈরি হয়। বিভিন্ন গাছ থেকে মাদক তৈরি হয়। বিভিন্ন বৃক্ষ বা বৃক্ষের ফলকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় বর্ণহীন তরল পদার্থে পরিণত করে Alcohol বানানো হয়। এ্যালকোহল ঔষধ তৈরি ও শিল্প কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু এর পাশাপাশি এ্যালকোহল ব্যাপকভাবে মদ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে দুনিয়াব্যাপী। এ এ্যালকোহল দিয়ে যে উন্নতমানের মদ তৈরি হয় তার নাম হচ্ছে ব্রাণ্ডি, বিয়ার, হুইস্কি, রাম, জিন, ভদকা, এইল ইত্যাদি।

আরবী ভাষায় মদকে বলা হয় "খাম্‌র", যার আভিধানিক অর্থ হলো আচ্ছন্ন করা। কথিত আছে "আল খাম্‌রু মা' খা'মারাল আক্বলা" অর্থাৎ "খাম্‌র' ওটাকে বলে যা পান করলে জ্ঞান ও বুদ্ধি আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। বুখারীর একটি হাদীসে জানা যায়, তৎকালীন আরবে ৫ প্রকার বস্তু দিয়ে মদ তৈরি করা হতো। এগুলো হচ্ছে আঙুর, খেজুর, গম, যব ও মধু। ইসলামে সর্বপ্রকার নেশাজাতীয় বস্তুই হারাম, নাম তার যাই হোক।

মাদকাসক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমেরিকার National Council on Alcoholism মন্তব্য করে যে, 'Alcoholism is an addiction to alcohol that entails several harmful consequences including damage to the brain, liver or other organs as well as destructive effects on the alcoholic's own life and that of alcoholic's family.'

অর্থাৎ মাদকাসক্তি হচ্ছে এ্যালকোহল-জাতীয় পানীয় সেবনের প্রতি অভ্যাস, যা মস্তিষ্ক, যকৃতসহ মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত করে দেয়। শুধু তাই নয় মাদকাসক্ত ব্যক্তি তার নিজ জীবন ও তার পরিবারের অন্যদের জীবনও বিপন্ন করে দেয়।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪০ লাখ মানুষ নিয়মিত মাদকাসক্ত এবং আরো ৬০ লাখ মানুষ অনিয়মিত মদ পান করে। প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় আমেরিকায় যে ২০ হাজার মানুষ মারা যায় তার জন্য এসব মদ্যপায়ীরাই মূলত দায়ী। আমেরিকায় বছরে ২৫ হাজার হত্যাকাণ্ড ও আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। তার পেছনেও রয়েছে মদ ও মাদকের অপব্যবহার। মৃত্যু ছাড়াও মাদকের অপব্যবহারজনিত অপরাপর ক্ষতির পরিমাণ বছরে প্রায় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মাদকের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া

২ অথবা ৩ আউন্স পরিমাণ হুইস্কি পান করলে পানকারীর চিন্তা ও বিচারশক্তি ভোঁতা হয়ে যায়। উদ্বেগ অস্থিরতা হ্রাস পেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হলেও তা তাৎক্ষণিক ও স্বল্পমেয়াদী। রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা যদি ৩০% ভাগ হয় তাহলে সুরা পানকারীর মানসিক বিভ্রাট ঘটবে এবং ক্রমশ চৈতন্য হারিয়ে ফেলবে; যদি রক্তে এ্যালকোহলের মাত্রা ৪৫% ভাগ হয় তাহলে প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে; যদি ৭০% ভাগ হয় তাহলে মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যাবে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। অত্যধিক সুরাপানের ফলে কিডনীর সন্নিহিত অঞ্চল উত্তেজিত হয়ে বেশি প্রস্রাব উৎপন্ন করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি অমাদকসেবীর তুলনায় ১০ থেকে ১২ বছর আগে মারা যায়। স্নায়ুতন্ত্র এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি লোপ পেতে পারে। অমাদকসেবীর তুলনায় মাদকাসক্তদের মুখগহ্বর, গলা ও স্বরযন্ত্র (Voice Box) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুরার সাথে যারা ধূমপান করে তাদের পাকস্থলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রদাহ সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভবতী মহিলা যদি সুরা ও ধূম একসাথে পান করে তাহলে Fetal Alcohol Syndrome দেখা দিতে পারে, যার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে গর্ভজাত শিশু মানসিক ও শারীরিক বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম নেবে।

মাদকের ইতিহাস

আজ থেকে ৬০০০ বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় সুরা তৈরি হতো এবং তখনকার মানুষ এই পানে ছিল অভ্যস্ত। অনুরূপভাবে প্রাচীন মিসর, গ্রীস ও রোমেও মদ তৈরি হতো। Mycenacan সভ্যতার যুগে মদ পবিত্র পানীয়রূপে সমাজে প্রচলিত ছিল। অ্যাসিরিয়ান রাজারাও দ্রাক্ষাক্ষেত করার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে বিশাল মদ ভাণ্ডার ছিল এবং যত্ন সহকারে বিভিন্ন প্রকার মদের তালিকা সংরক্ষণ করা হতো।

মদ উৎপাদন ও বিপণন

ফ্রান্স পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় মদ উৎপাদনকারী দেশ। পৃথবীর বার্ষিক মদের চাহিদা হচ্ছে ৪,৫০০,০০০,০০০ গ্যালন। চাহিদার এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে একা ফ্রান্স। ফ্রান্সের পর জার্মানীর অবস্থান। মদ রফতানীকারী দেশগুলোর মধ্যে আমেরিকার অবস্থান আট-এ। ৯০% ভাগ মদ উৎপন্ন হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। ইতালী, স্পেন, আলজিরিয়া, পর্তুগাল, আর্জেন্টিনা, গ্রীস, যুগোস্লাভিয়া, চিলি এবং দক্ষিণ আফ্রিকা হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম মদ উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানীকারক দেশ। ১৯৮০ সালের প্রারম্ভে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গড়ে বছরে প্রায় ১৮০ মিলিয়ন ব্যালের মদ উৎপাদন করে (১ ব্যারেল = ৩১ গ্যালন অথবা ১১৭.৩ লিটার)। এ উৎপাদন ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ।

মহানবী (সা)-এর বৈপ্লবিক শিক্ষাধারা

ইসলামের মহান পয়গম্বর সরওয়ারে দো'আলম হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বহুমাত্রিক শিক্ষার অন্যতম বড় অবদান হচ্ছে মদ, নেশা ও মাদকাসক্তির ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মানব জাতিকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন। বিশ্বনবী (সা)-এর মাদক-বিরোধী এ শিক্ষা সপ্তম শতাব্দীর এমন এক সন্ধিক্ষণে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে, যখন গোটা দুনিয়ার বিভিন্ন সমাজ নেশার জগতে হাবুডুবু খাচ্ছিল; সাদা পানি পান করা তখন দোষের বিষয় ছিল; ইরানী জনগণ শরাবের পেয়ালাকে সমীহ করত প্রাচীন পারস্য সম্রাট জামশেদের পান পাত্র মনে করে; ভারতে দেবতা ও ঠাকুরের সান্নিধ্য অর্জনের জন্য মদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত জরুরী; দীন ও দুনিয়ার অনেক রীতি-প্রথা তখন মদের ব্যবহার ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকত; আরবের অনেক কবির কাব্য ভাণ্ডার মদ ও মাদকের প্রশস্তি ও প্রশংসায় ছিল পূর্ণ। আল্লামা সাইয়েদ সোলায়মান নদভীর মতে মদ নিজে পান করা ও অপরকে পান করানো ছিল সে যুগের অভিজাতবর্গের বিলাসিতার অন্যতম মাধ্যম। স্বামী স্ত্রীকে ও ছোটরা বড়দেরকে নিজ হাতে মদ পান করাতো। ঠিক এমন এক নাজুক মুহূর্তে নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মুকাবিলায় মহানবী (সা) মদ পরিহারের ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, মাদক হচ্ছে সব অপরাধের প্রসূতি– "উম্মুল খাবা'য়িছ"। ফিতনা-ফাসাদের অগ্নিশিখাকে প্রজ্বলিত করে দেয় মাদকতা; মাদকাসক্ত মানুষ ভাল-মন্দ পার্থক্য করার শক্তি হারিয়ে ফেলে; মাদক মানুষকে অন্ধ করে দেয়; মা-বোন-কন্যার পার্থক্য বিলুপ্ত করে দেয় মদের নেশা; দৈহিক তেজ ও মানসিক ভারসাম্য বিলুপ্ত হয়ে যায় মাদকাসক্তির কারণে; মানুষের হাত থেকে ন্যায়-ইনসাফ এবং সত্য ও সততার দাড়িপাল্লা খসে পড়ে একমাত্র মদ ও মাদকতার কারণে। যে সমাজে মাদকাসক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটে সেখানে নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ মহামারী আকার ধারণ করে।

বিশ্বনবী (সা) সমাজে প্রজ্বলিত মাদকাসক্তির জাহান্নাম স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। এতে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে মদ্য পান ও মাদক

সেবনের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন। কারণ মাদকাসক্তি দুনিয়া ও আখিরাতকে পাপের সাগরে ডুবিয়ে দেয়; পরিণাম হয় অতি ভয়াবহ। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) দাওয়াতের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের মন-মেজায গড়ে তোলেন; তাদের অন্তরে মাদকের ক্ষতির অনুভূতি জাগ্রত করেন। অতঃপর মাদক পরিহারের হুকুম জারি করেন ঃ 'মদ ফেলে দাও এবং এর পান পাত্রগুলো ভেঙে ফেল'। বিশ্বনবী (সা) মদ, জুয়া, কুবা, গোরায়বা প্রভৃতিকে নিষিদ্ধ করে বলেন ঃ নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং মদ হলো হারাম। যে বস্তু অধিক পরিমাণে ব্যবহার করলে নেশা সৃষ্টি করে, এর সামান্য পরিমাণও হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি একবার মদ পান করে আল্লাহ পাক ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল করেন না। অবশ্য যদি সে তাওবা করে তবে আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন। যদি সে দ্বিতীয়বার পুনরায় মদ পান করে, আল্লাহ্ ৪০ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল করেন না। আবার যদি সে তাওবা করে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন। যদি সে আবারও মদ্য পান করে, আল্লাহ্ ৪০ দিন নাগাদ তার নামায কবূল করেন না। পুনরায় যদি সে তাওবা করে, আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন। যদি সে চতুর্থবারের মতো মদ্য পানের পুনরাবৃত্তি করে তা হলে আল্লাহ্ তার ৪০ দিনের নামায কবূল করেন না। এবার যদি সে তওবা করে, তাহলে আল্লাহ্ তার তাওবা কবূল করেন না এবং আল্লাহ তাকে নাহরে খাবাল' হতে অর্থাৎ জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজের নহর হতে পানি পান করাবেন। যে ব্যক্তি মদ পান করা হালাল মনে করবে সে কাফির হয়ে যাবে। তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ্ পাক বেহেশত হারাম করেছেন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হচ্ছে নিত্য মদ্য পানকারী। নিত্য মদপান অবস্থায় যার মৃত্যু ঘটবে সে মূর্তিপূজকের মতো আল্লাহ্ পাকের সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ মাদক সেবন ও মূর্তিপূজা এ দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শক রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "আমার মহাপরাক্রমশালী রব তাঁর মহাক্ষমতার শপথ করে বলেছেন ঃ আমার বান্দাদের মধ্যে যে বান্দা এক ঢোক মদ পান করবে, আমি নিশ্চিত তাকে অনুরূপ দোযখীদের পচা পুঁজ পান করাব। আর যে লোক আমার ভয়ে তা পান করা বর্জন করবে, আমি অবশ্যই পবিত্র কূপ হতে (শরাবে তহুর) তাকে পান করাবো।"

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মাদক সেবনের দ্বারা সাময়িক দেহের বাহ্যিক উপকার ও উন্নতি দেখা গেলেও এর পরিণতি কিন্তু ধ্বংসাত্মক। মাদক সেবনের বিরুদ্ধে ইসলামের স্পষ্ট ও জোরালো ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন ঃ "হে রাসূল! মদ ও জুয়ার ব্যাপারে জনগণ আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে। আপনি বলে দিন এ দু'টো হচ্ছে ঘৃণ্য পাপ। এতে মানুষের কিছু উপকার হলেও গোনাহের পরিমাণ কিন্তু বেশি।" পনর'শ বছর আগে রাহমাতুললিল আলামীন (সা) মদ পান ও মাদক সেবনের মারাত্মক

কুফল সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, আধুনিক বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদগণ গবেষণার মাধ্যমে এখন তার সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করে রীতিমত হতবাক হচ্ছেন। ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, মদ, গাঁজা, তাড়ি, ভাঙ, ভদকা, হুইস্কি, ব্রান্ডি, হিরোইন, ফেন্সিডিল জাতীয় মাদকদ্রব্য কোনও ঔষধ নয় বরং এটা নিজেই রোগ। বিশ্বনবী (সা) মদ পান ও মাদক সেবনকে শুধু নিরুৎসাহিত করেননি, মাদকাসক্তদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ মাদকাসক্ত ব্যক্তি শুধু নিজকে ধ্বংস করে না, ধ্বংস করে তার পরিবারকে, পুরো সমাজকে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে। সাহাবী হযরত দায়লামে হিমইয়ারী (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা শীতপ্রধান দেশে বাস করি এবং সেখানে আমরা কঠোর পরিশ্রমের কাজ করি। আমরা গম দ্বারা এক প্রকার মদ প্রস্তুত করি। এটা পানে আমাদের দেহে শক্তির সঞ্চার হয়; কঠিন কাজে আমাদের শরীরে শক্তি যোগায়; দেহ ও মনকে সতেজ ও চাঙ্গা করে তোলে। তদ্দ্বারা আমাদের অঞ্চলর শীত হতে আত্মরক্ষা করি। মহানবী (সা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওটাতে কি নেশা হয়? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, তাতে নেশা হয়। তিনি বলেন ঃ ওটা হতে বেঁচে থেকো, পান করো না। আমি বললাম, আমাদের দেশের লোকেরা ওটা বর্জন করবে না। এবার তিনি বললেন, যদি তারা ওটা পরিহার না করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করো। মদ ও মাদক দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত ১০ জনের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (সা) অভিসম্পাত দিয়েছেন ঃ (১) মদ প্রস্তুতকারক (২) মদ প্রস্তুতের উপদেষ্টা (৩) মদ পানকারী (৪) মদ বহনকারী (৫) যার নিকট মদ বহন করা হয় (৬) যে মদ পান করায় (৭) মদ বিক্রেতা (৮) মদের মূল্য গ্রহণকারী (৯) মদ ক্রয়-বিক্রয়কারী (১০) যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

মাদক সেবনের দণ্ডবিধি

দুনিয়া ও আখিরাতে মাদকাসক্তির ভয়াবহতা জনগণের সমানে তুলে ধরার পরও যারা এ ভয়ংকর নেশা ছাড়বে না তাদের জন্য মহানবী (সা) দণ্ডবিধি প্রবর্তন করেন, যাতে তারা সংশোধিত হয় এবং অন্যরা যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। বিশ্বনবী (সা) মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে খেজুর গাছের ডাল ও জুতা দ্বারা ৪০টি আঘাত করে শাস্তি দিতেন। হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা) মাদকাসক্তদের জন্য এ শাস্তি বহাল রাখেন। মদকাসক্তির মাত্রা যখন বৃদ্ধি পায় তখন হযরত উমর (রা) তাঁর শাসনামলে আশি বেত্রাঘাত করার হুকুম জারি করেন। সমস্ত ইমাম ও উম্মতের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মাদকাসক্তদের শাস্তি প্রদানের কতিপয় বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেমন জনগণকে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, অমুক ব্যক্তি মাদকাসক্ত অথবা মদ্যপ অথবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যদি কাউকে পাওয়া যায় অথবা মুখ হতে নেশার গন্ধ পাওয়া যায় অথবা সে যদি মাদকাসক্তির বিষয়টি স্বীকার

করে তখন তার উপর দণ্ড (হদ) আরোপ করা হবে। শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক মাদকাসক্তির প্রতিক্রিয়ার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, মাদক কিছু সময়ের জন্য হলেও মানুষের মস্তিষ্কের উপর এমন একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যদ্দারা মানুষের জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায় এবং ঐ সময় তার উপর পশুত্ব স্বভাব সওয়ার হয়ে বসে। মানুষের মধ্যে তো পশুত্বের স্বভাব আছেই, কিন্তু তার অমূল্য রত্ন জ্ঞান ও বিচার-বিবেচনা শক্তি ঐ স্বভাবের প্রাবল্য প্রতিরোধ করে রাখে। অধিকন্তু মদ মানুষের পশুত্ব স্বভাব ও পশুত্ব শক্তির মধ্যে উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে দেয়। এ ধরনের বহু দোষ মদের মধ্যে রয়েছে, যদ্দরুন সৃষ্টিকর্তা এটাকে অপবিত্র ও শয়তানী কাজের বস্তু নামে আখ্যায়িত করে তাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ পাক মানব জাতির জীবন ধারণের জন্য যেসব ফলমূল দিয়েছেন, তা অফুরন্ত নেয়ামত। এগুলো দিয়ে মাদক তৈরি করা আল্লাহ্র নেয়ামতের সাথে বিদ্রোহের শামিল। আল্লাহ্র নেয়ামতকে অবৈধ পন্থায় ব্যবহার করা হারাম। যেসব বস্তু আল্লাহ্ পাক পবিত্র ও হালাল করেছেন সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার থেকে বিরত থাকাও ধৃষ্টতা। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "খেজুর বৃক্ষ ও আঙুর ফল থেকে তোমরা মাদক দ্রব্য ও উত্তম খাদ্য তৈরি করে থাক। এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

আল্লাহ্ পাক মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যা প্রয়োগ করে মানুষ হালাল রিযিক অন্বেষণ করতে পারে, আবার হারামের পথেও ধাবিত হতে পারে। বোধসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনো হারামের পথে অগ্রসর হয় না। মদ ও মাদক এমন এক ভয়ংকর নেশা, যা অনেক অপরাধের জন্ম দেয়; হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা। মাদকসেবী ক্রমান্বয়ে জুয়া ও নারীতে আসক্ত হয়ে পড়ে; রুচিকে বিকৃত করে দেয়। এক কথায় খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, আত্মহত্যা সহ নানাবিধ পাপাচারের পথে নিয়ে যায় মদ ও মাদক এবং আল্লাহ্র স্মরণ, তথা নামায ও রোযা থেকে গাফেল করে রাখে। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ "হে মু'মিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের ঘৃণ্য কাজ। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব তোমরা এখনো কি নিবৃত্ত হবে না!

মাদক পরিহারকারীদের পরকালীন সুসংবাদ

যারা দুনিয়ায় মদ ও মাদকদ্রব্য সেবন থেকে নিজেদের বিরত রাখবে আল্লাহ্ পাক পরকালীন জীবনে বেহেশতে আমোদ-ফূর্তি উপভোগের জন্য তাদের এক ব্যতিক্রমধর্মী পানীয় সরবরাহ করবেন, যার তুলনা পৃথিবীতে নেই। আর যারা দুনিয়ায় মাদকাসক্ত, বেহেশতের এ নেয়ামত থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে যাবে। জান্নাতের পানীয় ও তার

বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ "তার বর্ণ হবে নির্মল, স্বচ্ছ, তা স্বাদে হবে অতি সুস্বাদু। তার মধ্যে এমন কোনও ক্রিয়া থাকবে না যদ্দরুন মস্তিষ্কে কোনও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মাথায় চক্র বা মাতলামির ক্রিয়া তাতে মোটেই থাকবে না।

মহানবী (সা)-এর শিক্ষার প্রভাব

মহানবী (সা)-এর মাদক বিরোধী এ শিক্ষার ফলে তৎকালীন সমাজে মাদক সেবন শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। সাহাবাগণ ছিলেন মাদক সেবনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদকারী। মাদক উৎপাদন, বিপণন, পরিবহন, সেবন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এমনকী হুযূর (সা)-এর তালীমের ফলে ধূমপানের প্রবণতাও অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। শুধু আরব দেশে নয়, বহির্বিশ্বেও মহানবী (সা)-এর শিক্ষা সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ইংল্যান্ড ও উত্তর আয়রল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ নিজে মদ পান পরিত্যাগ করেন এবং মদ পানের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্তমানে মাদক উৎপাদনের উপর নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। আজ থেকে ১৫'শ বছর আগে মহানবী (সা) মাদকবিরোধী যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব দুনিয়ার সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মাদকের করালগ্রাসে বাংলাদেশ

মদ ও মাদক দ্রব্যে বাংলাদেশের শহর, নগর, গ্রামাঞ্চল ছেয়ে গেছে ব্যাপক হারে। যুবক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত অনেক মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে। প্রতি বছর বাংলাদেশে মাদক বেচা-কেনা হয় ৫০০০ কোটি টাকার বেশি।

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রণীত প্রতিবেদনে জানা যায় যে, দেশে বর্তমানে মাদকসেবীর সংখ্যা ১০ থেকে ১২ লাখ। শুধু রাজধানী ঢাকায় প্রায় পাঁচ হাজার পয়েন্টে দিবারাত্রি চলছে মদ, গাঁজা, হেরোইন, ফেন্সিডিল, প্যাথেড্রিনজাতীয় মাদক ব্যবসা। সব ধরনের মাদকে ভেজাল মিশ্রিত থাকায় মাদকসেবীদের মৃত্যু ঘটছে অহরহ। বস্তি, লঞ্চ ও বাস টার্মিনাল এবং রেলওয়ে স্টেশন হচ্ছে মাদক পরিবহনের ট্রানজিট রুট। সীমান্তের ওপার থেকে আসে ফেনসিডিল, হেরোইন ও প্যাথেড্রিনজাতীয় মাদক দ্রব্য। এদেশের মাদক ব্যবসায়ীরা বোতল ও লেবেল ঠিক রেখে মাদকে ভেজাল মিশিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারে চালান দেয়। এ বছল মিথানল মিশ্রিত পরিশোধিত সুরাসার (Rectified Spirit) খেয়ে নরসিংদীতে ১২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরে বিষাক্ত মদ খেয়ে মৃত্যু ঘটেছে ১০ জনের। সারা দেশে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর ও সেপাই মিলে ৮৫০ জন লোকবল থাকা সত্ত্বেও অবৈধ মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। সিআইডি (Criminal Investigation Department) পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী পুরো দেশে দু'লাখ ট্রাক ড্রাইভার মাদক সেবনে অভ্যস্ত। বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে নিত্য

দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা। প্রতি ১০টি দুর্ঘটনার মধ্যে ৬টি হচ্ছে উচ্চ মাত্রায় মাদক সেবনের ফল। এভাবে মাদকাসক্ত ড্রাইভাররা অসংখ্যা নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে নিয়মিত। International Drug Control Programme (IDCP)-এর পরিসংখ্যানমতে বাংলাদেশ ৪ লাখ ৪০ হাজার জন শিক্ষিত মানুষ মাদক সেবন করে। এর মধ্যে ১ লাখ ৪৬ জন রয়েছে ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ১৫% ফেন্সিডিল ও হেরোইনের প্রতি, ১৩% প্যাথেড্রিন ইনজেকশনের প্রতি, ৬% হাশিশের প্রতি এবং ৩% এলকোহলের প্রতি আসক্ত। গাড়ি চালক ও স্বল্প আয়ের লোকেরা সাধারণত ফেন্সিডিল সিরাপ এবং স্থানীয়ভাবে তৈরি মদ পান করে। অপর দিকে বিত্তবান ও শিক্ষিতরা হেরোইন ও ফরেইন লিকার পান করে। একজন মাদক সেবীর মাদক বাবদ দিনে খরচ হয় গড়ে ১৩০ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নজরুল ইসলাম এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে মন্তব্য করেন যে, "It is a major threat to us that more than one-third of the educated people are taking drugs which can cripple the nation" অর্থাৎ "এটা আমাদের জন্য বিরাট হুমকি যে, শিক্ষিতদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মাদক সেবন করছে, যা জাতিকে পঙ্গু বানিয়ে দিতে পারে।"

অপরদিকে ধূমপান তো আমাদের দেশে কোন সামাজিক অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না বরং এটাকে আভিজাত্যের প্রকাশ ও ফ্যাশন মনে করা হয়। হাটে-বাজারে, গাড়িতে-বাসে, ট্রেনে-লঞ্চে, মার্কেটে-দোকানে সর্বত্র ধূমপায়ীদের রাজত্ব। ধূমপান আমাদের কি ক্ষতি করে তার সামান্য ধারণাও আমাদের নেই। ধূমপায়ীরাই মাদক সেবনে অগ্রগামী। পাকিস্তান চেস্ট সোসাইটির সহযোগিতায় জিন্নাহ্ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেকিড্যাল সেন্টারের চেস্ট মেডিসিন ডিপার্টমেন্টের (JPMC) পরিচালক প্রফেসর আবদুল মজিদ বালুচ ইতিপূর্বে করাচীতে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে ধূমপায়ীদের সতর্ক করার জন্য এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন ঃ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত পাকিস্তানে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক লোক বছরে প্রায় ৭০০ সিগারেট পান করে। অন্যভাবে বলা যায় প্রায় ১২০০ গ্রাম তামাক সেবন করে। শরীরের ২৫টি রোগের জন্য তামাক দায়ী।

সুতরাং মহানবী (সা)-এর শিক্ষাই মাদকের সর্বনাশা অভিশাপ থেকে আমাদের, আমাদের সমাজকে, আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারে।

অগ্রপথিক। ডিসেম্বর ১৯৯৯

ইসলামে আর্তমানবতার সেবা

মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

ইসলাম মানবতার আদর্শ। মানুষের কল্যাণ সাধনই ইসলামের কাম্য। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে আর্ত-মানবতার সেবা দীন ইসলামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমাজ হতে অত্যাচার অনাচার বিশৃংখলা ও ভেদাভেদ দূর করে একটি সুষ্ঠু-সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য ইসলামের আবির্ভাব। গোটা মানব জাতিকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দুনিয়ায় সত্যিকার শান্তি --- ইসলামের কাম্য। ইসলামে শাসক-শাসিতে বা ধনী-দরিদ্রে কোনও ভেদাভেদ নেই। সবাই সমান, পরস্পর পরস্পরের ভাই, আপদে-বিপদে একে অন্যের সহায়ক।

আর্ত-মানবতার সেবা বা খেদমতে খালক মহানবী (সা)-এর আদর্শের উত্তরাধিকার। এখন থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে স্বয়ং মহানবী (সা) সমাজের নিরন্ন ও দুঃখী মানুষের সেবা ও রহমতের জন্য 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, স্বাধীনভাবে কিংবা বিক্ষিপ্তভাবে হলেও যুগে যুগে মহানবী (সা)-এর অনুসারিগণ কর্তৃক এই গণ কর্মধারা অব্যাহত থেকেছে। এটি ইতিহাস স্বীকৃত সত্য যে দীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে মূলত ধর্মপ্রাণ মুসলমান, আলেমে দীন, মুবাল্লিগদের সৎ উপদেশ, শান্তির অমীয় শুদ্ধ চারিত্রিক মাধুর্য, দয়া দাক্ষিণ্য এবং সেবা, জনকল্যাণ ও সাহায্যের মাধ্যমে।

শুধু আত্মিক উন্নয়ন বা তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, সেবামূলক কাজের উপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বস্তুত মানুষের কল্যাণ সাধনই যে ইসলামের প্রধান কাম্য, তার উপর কুরআন মজীদেও বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে। অথচ আত্মকেন্দ্রিক (Self-centred) এ সমাজে সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি যতটা গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন ছিল তা দেয়া হচ্ছে না। পরিতাপের বিষয় হলেও এ কথা সত্য যে, ইসলামের সেবা কর্মকাণ্ডের মহান বৈশিষ্ট্য তার অনুসারীদের মাঝে দিন দিন যেন গৌণ থেকে গৌণতর হতে চলেছে, বরং একবারে শূন্যের কোঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে বললেও মনে হয় খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। আর এজন্যেই মানুষ আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। অথচ মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন। মানুষকে নিয়েই

তো আল্লাহ্‌র সব আয়োজন, এই দুনিয়া, আকাশ মহাবিশ্ব সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য। নবী-রাসূলরা এসেছিলেন মানুষের কল্যাণের জন্যই।

ইসলামের একজন অনুসারীর রবুবিয়াত বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে স্বীকার করার পর যমীনে আল্লাহ্‌র খলীফা হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য দ্বিবিধ। এক. নিজের প্রতি কর্তব্য, অপরের প্রতি কর্তব্য। প্রথমটি হক্কুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং দ্বিতীয়টি হক্কুল ইবাদ আল্লাহ্‌র বান্দাহর প্রাপ্য। হক্কুল্লাহ আসলে নিজের জন্যই। কারণ মহান আল্লাহ অসীম ও অসীম ক্ষমতার মালিক। তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কাজেই তিনি কারও নিকট কিছু পাওয়ার জন্য মুখাপেক্ষী নন। নিজের মুক্তির জন্যই মানুষকে হক্কুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য করতে হয়। যেমন– নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, তসবীহ, তাহলিল ইত্যাদি। অপরদিকে হক্কুল ইবাদ বা আল্লাহ্‌র বান্দার প্রাপ্য বা খিদমতে খালকের দায়িত্ব পালন করা ফরয। আর মহাপরাক্রমশালী এবং দয়ালু হিসাবে হয়ত স্বীয় প্রাপ্য ছেড়ে দিতে পারেন এ এখতিয়ার রয়েছে কিন্তু হক্কুল ইবাদ বা তাঁর বান্দাহ্‌র প্রাপ্য যদি কেউ আদায় না করে, তা আল্লাহ মাফ করবেন না– যতক্ষণ না ঐ বান্দাহ তা মাপ করে দেয় সে প্রাপ্য কম বা বেশি যাই হোক। বস্তুত আন্তরিকতার সাথে হক্কুল ইবাদ আদায় করা ইসলামী সমাজ জীবন যাপনে শর্ত। এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ এত দৃঢ় যে, গৃহদ্বারে মানবেতর প্রাণী একটি কুকুর উপবাসী রেখে নিজে উদর পূর্ণ করে আহার করা মুসলমানের জন্য নাজায়েয। কুরআন পাকে বলা হয়েছে যারা, ইয়াতীমের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন, যারা ক্ষুধার্তকে অন্নদানে বিমুখ এবং যারা প্রতিবেশীর উপকারের প্রতি উদাসীন, সে সকল ইবাদতকারী অভিশপ্ত। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

১১. অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি।
১২. আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি ?
১৩. তা হচ্ছে দাসত্বশৃংখল থেকে মুক্তি
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান
১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে
১৬. অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে

(সূরা আল-বালাদ ঃ ১১-১৬ আয়াত)

"সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পাশ্চিম দিকে মুখ করবে বরং বড় সৎকাজ হল এ যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্‌র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য।"

(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

আর্তমানবতার সেবা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে নবী মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে আর্তমানবতার সেবার বহু দিক রয়েছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সকলের মঙ্গলের জন্য, সেবার জন্য চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলাও আর্তমানবতার সেবার অন্তর্ভুক্ত। পরস্পর পরস্পরকে আপদে-বিপদে সাহায্য করা ও সমবেদনা প্রকাশ আর্তমানবতার সেবার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক।

মহানবী (সা) বলেছেন ঃ গরীব-দুঃখী ও বিধবা নারীদের খিদমতগারের মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী অথবা রাত্রিভর নামায আদায়কারী ও দিনভর রোযা পালনকারীর মর্যাদার সমপর্যায়ভুক্ত।

মহানবী (সা) আরো বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছে সেই যে সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে।

অন্য একটি হাদীসে আছে, হুযূর (সা) বলেছেন ঃ যারা মানুষকে অন্নদান করে এবং সালামের জবাব দেয় তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

অন্য আর একটি হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের অভাব দূর করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তার অভাব দূর করবেন। যে ব্যক্তি আপন মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার কঠিনতর বিপদ দূর করবেন।

মহানবী (সা) আরো বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি মু'মিন নয় যে নিশ্চিন্তে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।

তিনি আরো বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তিকে খাওয়ানো সর্বাপেক্ষা নেকীর কাজ।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যারা অন্যের প্রতি সমবেদনা ও করুণা দেখায়, আল্লাহ তাদের উপর দয়া করেন। বস্তুত প্রিয়নবী (সা) তাঁর এসব বাণীকে বাস্তবেও আমল করেছেন। তাঁর জীবনের সমগ্র দিকই সেবামূলক কাজে ভারপুর। যে বুড়ী শত্রুতা করে মহানবী (সা)-এর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখত তিনি অসুস্থতার সময় তার সেবা করেছিলেন। যে মক্কাবাসী একদিন নিজ মাতৃভূমি হতে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, মক্কা বিজয়ের পর তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। দয়া ও সেবায় যে আদর্শ ও দৃষ্টান্ত মহানবী (সা) প্রদর্শন করেছিলেন, তা পৃথিবীতে কেউই দেখাতে পারেনি।

একজন মু'মিনের উপর অন্য একজন মু'মিনের ছয়টি দাবির কথা ইসলামে রয়েছে।

১. একজন রুগ্ন হলে অন্যজন তার সেবা করবে।

২. একজনের মৃত্যু হলে অন্যজন তার জানাযায় শরীক হবে।

৩. একজন ডাকলে অন্যজন সাড়া দেবে।

৪. পরস্পর সাক্ষাৎ হলে একে অন্যের মঙ্গল কামনা করবে অর্থাৎ সালাম দেবে।

৫. একজনের হাঁচি উঠলে অন্যজন বলবে ঃ আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন।

৬. একজন অন্যজনের সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সর্বদা পরস্পরের মঙ্গল কামনা করবে।

মহানবী (সা) বলেছেন ঃ যে আমার কোনও উম্মতকে খুশি করার জন্য তার অভাব মোচন করল, সে আমাকেই যেন খুশি করল এবং যে আমাকে খুশি করল সে আমার আল্লাহ্‌কে খুশি করল। আর যে আল্লাহকে খুশি করে আল্লাহ তাকে বেহেশতে দাখিল করেন।

আর্তমানবতার সেবার ইসলামী রূপ

১. পারস্পরিক অধিকার ও সম্পর্কের মাধ্যমে সেবা

- ক. মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্কের কারণে সেবা
- খ. মানুষের সাথে মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের কারণে সেবা
- স্ত্রীর-স্বামীর সম্পর্ক
- সন্তানের সাথে পিতা-মাতার সম্পর্ক
- ভাই-বোনের সম্পর্ক
- অন্যান্য আত্মীয়তার সম্পর্ক

গ. মানুষের সাথে মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রেক্ষিত

- আত্মীয়-অনাত্মীয়ের সম্পর্ক
- ছোট-এর সাথে বড়-এর সম্পর্ক
- ভৃত্যের সাথে মনিবের সম্পর্ক
- প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর সম্পর্ক
- পাওনাদারে সাথে দেনাদারের সম্পর্ক
- অভাবীর সাথে বিত্তবানের সম্পর্ক

ঘ. ব্যক্তিগত স্বভাব ও আচরণের মাধ্যমে সেবা

১. স্নেহ ও শাসন

২. ক্ষমা বনাম প্রতিশোধ

৩. কৃপণতা বনাম অপচয়

৪. সহনশীলতা বনাম প্রতিরোধ

৫. ক্ষমতা বনাম দায়িত্ব

৬. ভালবাসা ও শত্রুতা

৭. ক্ষুধা ও ভোজনের ইসলামী নিয়ম-নীতি

২. প্রতিষেধাত্মক পদক্ষেপ ও শিক্ষার মাধ্যমে সেবা

ক. সম্পদ অর্জন, ভোগ ও বণ্টনে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা ঃ ইসলামী নীতির আওতায় সৎ পন্থায় সম্পদ অর্জন ও ভোগ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সমস্ত হারাম ও অবৈধ পন্থা পরিহার করতে হবে। শোষণমূলক পন্থায়, বঞ্চনা চালিয়ে বা অন্যকে ঠকিয়ে আর্তমানবতার নামে ধনী হওয়ার প্রক্রিয়া ইসলামে নেই।

খ. হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন নিষিদ্ধ ঃ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী হারাম অথচ সম্মানজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা অবৈধ ও বেআইনী। জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চোরাচালান, হারাম পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি, ওজন ও পরিমাপে কম -- ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, বেশ্যাবৃত্তি, অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসা, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবসা, জবরদখল, লুণ্ঠন, ছিনতাই, আত্মসাৎ, মওজুদদারী, খেয়ানত ইত্যাদি ক্ষতিকর পন্থা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলো শোষণমূলক ও রাতারাতি অর্থ কেন্দ্রীভূত করার উপায়। এসব নিয়ম বা পন্থার মূলোৎপাটন করা গেলে দেশের ব্যাপক মানুষ আর্তমানবে পরিণত হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

গ. সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ নিষিদ্ধ ঃ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন – সম্পদ যেন কেবল ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় (সূরা আল হাশর ঃ ৭)। যারা স্বর্ণ, রৌপ্য, অর্থ সঞ্চয় করে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও। (সূরা আত তাওবা ঃ ৩৪)। কুরআনের এসব নির্দেশনার আলোকে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্ধকে ঠকিয়ে বা শোষণ করে বা অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চায় করে বা কেন্দ্রীভূত করে রাখা সম্ভব নয় যা আর্তমানবতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

ঘ. সুদ ও ঘুষ নিষিদ্ধ ঃ সুদের কারণে আর্তমানবতা আরো দরিদ্র হয়। একদল লোক অনেক শ্রমে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসায় সুদের সাহায্যেই। ঘুষও অর্থ উপার্জনের হারাম পন্থা। ইসলাম এ দু'টোকে নিষিদ্ধ করে আর্ত-মানবতা সৃষ্টির পথে বাধা দাঁড় করিয়েছে।

ঙ. আয়-উপার্জন বৃদ্ধির শিক্ষা দানের মাধ্যমে সেবা ঃ ইসলাম কর্মসংস্থানকে প্রাধান্য দিয়ে আর্তমনবতার সেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কর্ম ও শ্রমের ব্যাপারে সূরা আল বালাদে আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চিয়ই আমি মানুষকে ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। (সূরা আল বালাদ ঃ ৪) অলসতা ও পরমুখাপেক্ষিতা দারিদ্র বাড়াতে পারে, যা মহানবী (স) অপছন্দ করেছেন। এ জন্যই আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ 'মানুষ ততটুকু পায় যতটুকুর জন্য সে চেষ্টা করে।' (সূরা আন নজম ঃ ৩৯)। আল্লাহ্‌র এ বাণী মেনে চললে ব্যক্তির জন্য আয় উপার্জনের পথকে উন্মুক্ত করবে এবং জাতীয় পর্যায়ে আয় বৃদ্ধি করবে যা প্রকারান্তরে দারিদ্র্য দূর করে আর্তমানবতার কল্যাণ সাধন করবে।

চ. **ভিক্ষুকের হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করার শিক্ষা ঃ** একজন আনসারী সাহাবীর ঘটনা এখানে প্রণিধানযোগ্য। ভিক্ষুকের হাতকে তিনি কর্মীর হাতে পরিণত করেছিলেন। অভ্যাসগত ভিক্ষাবৃত্তি ও অযথা হাত পাতাকে ইসলাম খুবই ঘৃণা করে। এ জন্যই তো কবি বলেছেন, 'নবীর শিক্ষা করো না ভিক্ষা মেহনত করো সবে।'

আর্তমানবতার সেবায় ইসলামের বণ্টন ব্যবস্থাসমূহ

আর্তমানবতার সেবায় ইসলামের বণ্টন ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

বণ্টন ব্যবস্থা

ফরয	ওয়াযিব	নফল
যাকাত	সাদাকাতুল ফিতর	সাদাকাতে নাফেলা
ওশর		হিবা
কাফফারাত		ওয়াকফ
ফিদিয়া		ওয়াসিয়াত
		জারাইর

উপরোক্ত বণ্টন ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে আর্তমানবতার মধ্যে সম্পদ বণ্টিত হয়ে যায়। ফলে দরিদ্র ব্যক্তি তথা আর্তমানবতা সম্পদের হয়ে দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করে 'সাহেবে নেসাব' হতে পারে।

অগ্রপথিক। অক্টোবর ১৯৯৯

এইড্‌স প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন

ডা. খিজির হায়াত খান

এইচ.আই.ভি. (হিউম্যান ইম্যিউন ডেফিশিয়েন্সি ভাইরাস) মানুষের শরীরে প্রবেশের পর মানবদেহে পরিলক্ষিত উপসর্গসমূহের সমাহারই হচ্ছে এইডস (এ্যাকোয়ার্ড ইম্যিউন ডেফিশিয়েন্সি সিনড্রোম) যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় রোগ প্রতিরোধের অভাবজনিত উপসর্গ। এইডস এমন এক ভয়াবহ রোগ যা দ্বারা একবার কেউ আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্য। এ যাবত এইডসের কোন ফলপ্রসূ চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি। এটা আল্লাহর অশেষ রহমত যে, ভয়াবহ হলেও এইডস প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগ। ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার সাথে এইডস প্রতিরোধের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর যে কাজটির উপর আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আমালুস সালেহ অর্থাৎ সৎকাজ করা। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে কোন কাজই আমালুস সালেহ হিসেবে পরিগণিত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে মহানবী (সা)-এর উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে আখ্যায়িত করে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। নৈতিকতা, নিরাপত্তা এবং শান্তির ধর্ম ইসলাম। দেহ-মনের পরিপূর্ণতা এবং বিকাশে সহায়ক সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত নীতিমালাই হচ্ছে নৈতিকতা। প্রিয়নবী (সা) নৈতিকতা সম্পর্কে বলেছেন, 'চরিত্রের বিচারে যে লোক উত্তম, মুমিনদের মধ্যে সে-ই পূর্ণ ঈমানের অধিকারী'। মানুষের জীবন-দর্শন ও জীবনবিধানকে প্রাকৃতিক নিয়মনীতি ও বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা এবং মানুষের মধ্যে কল্যাণকর উত্তম গুণাবলীর বিকাশ সাধন করাই হচ্ছে নৈতিকতার উদ্দেশ্য। মানব চরিত্রের উজ্জ্বল দিকগুলো যেমন– সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ন্যায়নীতিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণ করা এবং সর্বোপরি ঈমানকে সঠিকভাবে আঁকড়ে থাকা সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত। নৈতিকতা বিবর্জিত লোকই সমাজে অন্যায়, অশ্লীল ও অনৈতিক কর্মের জন্য দায়ী। ইসলামী

জীবন ব্যবস্থায় নৈতিকতা একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে ইসলামে আইন-কানুন প্রণীত হয়েছে। নৈতিকতা সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন, "যৌন অংগের হিফাজতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, ইহাদিগের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান" (৩৩ ঃ ৩৫)।

উপরোক্ত আয়াতে যে গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো—শুদ্ধতা যৌনসম্ভোগের ক্ষেত্রে পবিত্রতা, পবিত্র উদ্দেশ্য, চিন্তা, বাক্য এবং ধর্ম। আর সার্বক্ষণিক আল্লাহর জিকিরে অন্তরকে মশগুল রাখার মধ্য দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছা অন্তরে লালন করা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সতর্ক করেন, "আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ" (১৭ ঃ ৩২)। ব্যাভিচার– যার মাধ্যমে যৌনরোগ ছড়ায় শুধু অশ্লীলই নয়, এটা আত্মসম্মান এবং অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও কর্তব্যবোধকে বিলুপ্ত করে এবং অন্যান্য মন্দ কাজের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। ব্যভিচার পারিবারিক ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়; ব্যভিচারের ফলে জন্ম নেয়া এবং গর্ভে থাকা সন্তানের অধিকারের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়; জাতিগত চিরশত্রুতা এবং হত্যার মতো অপরাধ সংঘটিত হয়, সম্পদ এবং সুনাম ক্ষুণ্ন হয় এবং সামাজিক বন্ধন স্থায়ীভাবে দুর্বল হয়ে যায়।

তাই ব্যভিচার শুধু পরিহার করাই উচিত নয় বরং এর সংশ্রব এবং এর প্রতি যে কোনরূপ কামনাও অবশ্য অপরিহার্য। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নৈতিকতার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজন এবং তার আত্মিক চাহিদা ও বিকাশের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য স্থাপন করার মধ্য দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভে সমর্থ করা।

নৈতিক মূল্যবোধের কারণে এইডস ছড়ানোর দু'টি প্রধান মাধ্যম অবৈধ যৌনাচার এবং মাদকাসক্তি থেকে মানুষ বিরত থাকে। ইসলামে নৈতিকতাবিবর্জিত মানুষকে পশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে নৈতিকতায় উৎকর্ষতা অর্জনকারী মানুষ আল্লাহর নিকট অত্যন্ত মর্যাদানে বলে বিবেচিত হন। অবৈধ, অনৈতিক ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে যারা নিজেদের হেফাজত করে ইসলামে তারা শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে পরিগণিত। যারা অনৈতিক, অবৈধ, অশ্লীল এবং ঘৃণ্য কাজে জড়িত আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। মহানবী (সা) বলেন, "যখনই কোনও জাতি বা সম্প্রদায় অশ্লীল এবং ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় তখন তাদের মধ্যে এমন এক ভয়ঙ্কর মহামারী দেখা দেয় যা তারা অতীতে কখনও দেখেনি।" (ইবনে মাজা)।

অবৈধ যৌনাচার এবং সমকামিতার জন্য আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন, "আমি লুতকে প্রেরণ করেছি, যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে

বললো, তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে কেউ করেনি ? (৭ ঃ ৮০)। তোমরা তো কামবশত পুরুষের কাছে গমন কর নারীদের ছেড়ে বরং তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় (৭ ঃ ৮১)।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রতীয়মান হচ্ছে যে লুত (আ)-এর সম্প্রদায় বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত ছিল। লুত (আ)-এর সম্প্রদায়ের পুরুষদের অনেকেই আল্লাহ নির্দেশিত বিপরীত লিঙ্গের তথা স্ত্রীদের সাথে স্বাভাবিক যৌনাচার না করে সমলিঙ্গের তথা পুরুষদের সাথে যৌনাচার পছন্দ করতো। লুত (আ) আরও বলেন, তাদের পূর্বে পৃথিবীতে অন্য কোনও সম্প্রদায় এরূপ ঘৃণ্য কুকর্ম করেনি। বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে, লুত (আ)-এর এলাকা "সোডম" এবং "গোমোরো" নামে পরিচিত ছিল। এ স্থানটি মরু সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। লুত (আ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বিকৃত যৌনাচার পুরুষে পুরুষে সমকামিতা নামে পরিচিত। না ছিল পৃথিবীর কোথাও এটা জনপ্রিয়, না ছিল কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা প্রচলিত। পবিত্র কুরআনের ভাষায় কেবল সোডম এবং গোমোরো অধিবাসীরাই এককভাবে এই কুকর্ম করতো। পুরুষে পুরুষে সমকামিতা সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত সীমালংঘন হিসেবে আল কুরআনে চিহ্নিত হয়েছে। লুত (আ)-এর সম্প্রদায় আল্লাহর আদেশ লংঘন করে এইরূপ কুকর্ম করার কারণে আল্লাহর এমন গজবে পতিত হয়েছিল যে পুরো জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত সেই মুক্ত সাগরে কোনও জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত সীমালংঘনকারীদের শাস্তি কত কঠোর হয় এটা তারই প্রমাণ।

সম্প্রতি দেখা যায় পুরুষে পুরুষে সমকামিতার পক্ষে ফলাও প্রচারসহ কোন কোন দেশে এটাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে আধুনিক মানব সভ্যতার প্রতি মারাত্মক হুমকি হিসেবে সমকামীদের মধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধি এইডসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। নিশ্চয়ই যারা তাদের অসৎ জৈবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অনৈতিক, অবৈধ এবং বিকৃত যৌনাচার পছন্দ করে তাদের জন্য এইডস আল্লাহর গজবস্বরূপ।

অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার এইডস বিস্তারে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। শুধু একটিবার অবৈধ যৌনক্রিয়া মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দিতে পারে। নৈতিকতাবিবর্জিত মানুষ তার নিজের ভালমন্দ বিবেচনা না করে অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়। পরিণামে সে নিজে যেমন তার জীবনের উপর হুমকি বয়ে আনে তেমনি এর দ্বারা তার পরিবার তথা সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপর দিকে নৈতিক স্খলনের কারণে সে ব্যভিচার, সমকামিতা, মাদকাসক্তি ইত্যাদিতেও প্রবৃত্ত হতে পারে। এ সকল কর্মও এইডস বিস্তারের জন্য সমানভাবে দায়ী। সুতরাং একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, ইসলামী অনুশাসনমতে নিয়ন্ত্রিত যৌনাচার এইচ.আই.ভি বিস্তার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিয়ে একটি মৌলিক সামাজিক প্রথা। ইসলামে বিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ইসলাম কখনো অবৈধ ও বিকৃত যৌনাচার সমর্থন করে না। যৌন সম্ভোগের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক জৈবিক-চাহিদা মেটানোর মধ্য দিয়ে মানসিক শান্তি ও চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনে বিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিয়ের দ্বারা অনেক উপকার লাভ করা যায়। মহানবী (সা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা বিয়ে কর; কারণ বিয়ে তোমাদের পবিত্রতা রক্ষায় এবং দৃষ্টিকে সংযত রাখতে সাহায্য করে। অপরদিকে যাদের সামর্থ্য নেই তারা রোযা রাখ; কারণ রোযা যৌন ক্ষুধা সংবরণে সহায়ক"। নবী করীম (সা) আরও বলেন, "যে ব্যক্তি পূত-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে সে যেন একজন মুক্ত (আজাদ) নারীকে বিয়ে করে"। মহানবী (সা) উল্লেখ করেন, "যে ব্যক্তি বিয়ে করল সে দ্বীন -এর অর্ধেক পরিপূর্ণ করলো"।

ইসলাম কখনো মানুষের যৌন চাহিদাকে অবদমিত করার পরামর্শ দেয় না। তাই ইসলাম বিয়ে করার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। বিয়ে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। অন্যদিকে বিয়ে না করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর; এটা মানুষকে ব্যভিচার, বিকৃত যৌনাচার এবং যৌন সংশ্লিষ্ট অপরাপর অপরাধের পথে ধাবিত করে। ইসলাম প্রকৃতির সাথে মানুষের জৈবিক চাহিদার একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে মানুষকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করে।

একজন মুসলমানের জন্য সার্বক্ষণিক অবশ্যপালনীয় কাজের অন্যতম হচ্ছে ঃ ঈমানকে মজবুতভাবে আঁকড়ে থাকা; নাভির উপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা এবং স্বীয় স্ত্রীকে পর্দার ভিতরে রাখা। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ইসলামী অনুশাসন মতে মহিলাদের পর্দা না করার প্রবণতা। যার ফলে যৌন অপরাধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নবী করীম (সা) স্বীয় স্ত্রী ও সাহাবীগণকে যৌন অপরাধ প্রতিরোধে পর্দার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) অন্ধ লোকদের সামনে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রেও স্বীয় স্ত্রীগণকে পর্দা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে আমাদের ব্যভিচার এবং যৌন অপরাধ করা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যে কাজ যত ঘৃণ্য সে কাজের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শাস্তিও তত কঠিন। ইসলামে ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে আছে "যেখানে কোনও অপরিচিত পুরুষ এবং মহিলা একত্রিত

হয় সেখানে শয়তান তৃতীয় ব্যক্তির (প্ররোচনাকারী) ভূমিকা পালন করে। ইসলাম নর-নারীকে লজ্জাহীনতা পরিহারের নির্দেশ দেয় যেন তারা ব্যভিচার এবং যৌন অপরাধ হতে দূরে থাকতে সমর্থ হয়। রাসূল (সা) আরও বলেন, "মানুষ এবং পশুর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে লজ্জা।" একজন লজ্জাহীন মানুষ তার নৈতিক মূল্যবোধকে অবদমনপূর্বক খেয়াল খুশিমত যে কোনও কাজ করতে পারে।

নবী করীম (সা) বলেন, "দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের তীর, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টিকে সংযত ও অবনত রাখে তাকে আল্লাহ ঈমান দিয়ে এর প্রতিদান দেয়া এবং সে পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ লাভ করে। হাদীসে আছে, যে চোখ আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ জিনিস দেখা থেকে বিরত থাকে সে চোখকে জাহান্নামের আগুন কখনো স্পর্শ করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মূল্যবোধের অবক্ষয় যৌন বিকৃতির প্রবণতা সৃষ্টি করে।

ইসলাম আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে শিক্ষা দেয়। আল্লাহর নির্দেশ এবং রাসূলের সুন্নতের উপর দৃঢ়ভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম হয় এবং ইহলোকে এবং পরলোকে সফলতা লাভ করা যায়।

মানুষ পাপের ফলে মানুষের উপর মহামারী, খরা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ অপরাপর বিপর্যয় নেমে আসে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ("জাহারাল ফাসাদি..... আইদননাস") "জলে স্থলে আবির্ভূত বালা মুসিবত মানুষের নিজ হাতে অর্জিত কর্মেরই ফল। তাদের কর্মফলের কিছু অংশের স্বাদ আল্লাহ পাক দুনিয়াতে তাদেরকে আস্বাদন করতে দেন যেন তারা পাপ কাজ হতে নিজেদের ফিরিয়ে নেয়" (৩০ ঃ ৪১)। আল্লাহর সৃষ্টি উত্তম ও পবিত্র। যাবতীয় অনিয়ম দুর্নীতি ও অপবিত্রতা এসেছে শয়তানের প্ররোচনা তথা পাপ কাজের মাধ্যমে। পাপের পরিণতিতে পাপই অবশ্যম্ভাবী। তারই কিছু আংশিক শাস্তির মাধ্যমে দেখানো হয়ে থাকে যা মানুষের স্বীয় হস্তে অর্জিত কর্মেরই ফল। এরূপ আংশিক শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহ পাক মানুষকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে অনুশোচনার দিকে আহ্বান করেন। আল্লাহ তা'আলার বিচার এবং শাস্তির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পাপ থেকে ফিরিয়ে এনে ঐ রকম পূত-পবিত্র করা যে রকমভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, মানুষের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে তার দুর্ভোগ তার দ্বারা সাধিত কর্মেরই ফল। সে সবের দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে তাকেই বহন করতে হবে এবং এগুলোর দোষ অন্য কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

পবিত্র কালামে পাকে আল্লাহ সতর্ক করেন, "পরকালের কঠিন আযাবের পূর্বে দুনিয়াতে আমি তাদের কিছু শাস্তি দিয়ে থাকি যেন তারা অনুতপ্ত হয় এবং পাপ কাজ

থেকে বিরত থাকে (৩২ ঃ ২১)।" চূড়ান্ত ও কঠিনতম শাস্তি পরকালে আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তার আগে ইহকালে অল্পস্বল্প শাস্তি আসে। কখনও এরূপ শাস্তি কোন বিপর্যয়-দুর্ভোগরূপে আসে; আবার কখনো তা বিবেকের দংশনে কান্নার অশ্রুরূপে আসে। একথা সত্যি যে, এ ধরনের ছোটখাট শাস্তিও আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ; কারণ তা মানুষকে অনুতপ্ত এবং সংশোধিত হওয়ার সুযোগ দেয়।

অবৈধ যৌনাচার এবং ব্যভিচারকে মহামারীর কারণ হিসেবে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, "যখন কোনও জাতি বা সম্প্রদায় আত্মসাৎ-প্রবণ হয় তখন ভয়ভীতিতে তারা আক্রান্ত হয়; যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তখন মহামারী দেখা দেয়।"

ইসলামে পবিত্রতাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলামী অনুশাসনের আলোকে জীবন-যাপন করার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সত্যিকারের শান্তি অর্জন করা যায়। যৌনতার ব্যাপারে কেবল ইসলামের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবতার উপর আপতিত এইডস-এর মত ভয়াবহ দুর্যোগ যে মোকাবেলা করা সম্ভব তা আজ ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। মহান রাব্বুল আলামীন প্রদর্শিত পথে চলার মধ্য দিয়ে মানব জীবনের সকল অশান্তি নিরসনের সামর্থ্য যেন বিশ্ববাসী অর্জন করতে পারে সেটিই হোক আমাদের আজকের প্রত্যাশা।

অগ্রপথিক। মে ২০০৫

ইফা-২০০৮-২০০৯ প্র/৯৬৭৮ (উ)-৩,২৫০